কল্পলতিকা

কল্পলতিকা

শ্রীসুবোধচন্দ্র ঘোষ

ডি. এম. লাইব্রেরী
৪২, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা ৬

প্রকাশক—
শ্রীগোপালদাস মজুমদার
৪২, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা ৬

১৯৪৯
দাম তিন টাকা

মুদ্রাকর—শ্রীসুকুমার চৌধুরী
বাণী-শ্রী প্রেস
৮৩বি, বিবেকানন্দ রোড, কলিকাতা

কল্পলতিকা

শক্তিপুর ষ্টেশনটি খুবই ছোট, দিনে রাতে মাত্র দুখানি প্যাসেঞ্জার ট্রেণ যাতায়াত করে। মেলট্রেণ একখানিও থামে না, ষ্টেশন কাঁপিয়ে ঝড়ের বেগে উধাও হয়ে যায়। ষ্টেশনমাষ্টার একাধারে সব,—টিকিট বিক্রী থেকে আরম্ভ করে ঘণ্টা পর্য্যন্ত বাজাতে হয়। মাষ্টারমহাশয়ের কোয়াটার্স টিও ষ্টেশনের মর্য্যাদা অনুযায়ী ক্ষুদ্র, দেড়খানি ঘরে তাঁকে গৃহস্থালী চালিয়ে নিতে হয়। ষ্টেশনের অন্যান্য লোকজনের মধ্যে পঞ্চুলাল পোর্টার ও সীতারাম মিঠাইওয়ালা উল্লেখযোগ্য। পঞ্চুলাল চাকুরীজীবনের গোড়া থেকে শক্তিপুরে বহাল আছে, বয়সের অনুপাতে তার দেহ একটু বেঁকে গেছে। মিঠাইওয়ালা সীতারাম শক্তিপুর ষ্টেশনের গায়ে দোকান করেছে হালে। ছাপরা জেলা থেকে ভাগ্যলক্ষ্মীর অনুসন্ধানে সে হয়েছে ঘরছাড়া। সীতারামের আগমনে নিঃসহ পঞ্চুলাল একটা পরম সম্পদ লাভ করেছে। মাষ্টারমশায়ও এই জনহীন প্রান্তরে সঙ্গীবৃদ্ধি হওয়াতে খানিকটা ভরসা পেয়েছেন।

ষ্টেশনের যাত্রী সব এদের পরিচিত। গ্রামের দোকানদার হাবুল, রঘুয়া মুচি, কান্ত ধোপা, আর বড়বাড়ীর রায়মশায়,—এরাই বেশী যাতায়াত করে ট্রেণে। রায়মশায়ের বাড়ীর মেয়েদেরও মাঝে মাঝে দেখা যায় ষ্টেশনের প্ল্যাটফরমে। রায়গিন্নীর বাপের বাড়ী শহরে,—বৎসরে দুবার সেখানে যান! সঙ্গে থাকেন বৃদ্ধ রায়মশায় আর বড় ছেলের মেয়ে রেণু। রায়গিন্নী চালচলনে সাবেকীয়ানা এখনও বজায় রেখেছেন,

রেণু শহরের ধারা সম্পূর্ণ আয়ত্ত করেছে। রায়গিন্নীদের যাত্রার দিন ষ্টেশনমাষ্টারের স্ত্রী ও ছেলেমেয়েরাও এসে ভিড় করে প্ল্যাটফরমে। তাঁদের হাবভাব একেবারে গ্রাম্য, আধুনিক স্টাইল সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন। মাষ্টারমশায়ের বড় মেয়ে রেণুর সমবয়সী, সে কৌতূহলভরা চোখে তাকিয়ে থাকে রেণুর দিকে। আধুনিক বেশে সজ্জিতা রায়বাড়ীর মেয়ের সঙ্গে আলাপ করতে তার সাহস হয় না। মাষ্টারগিন্নী কিন্তু বেশ জমিয়ে তোলেন রায়গিন্নীর সঙ্গে। বিদায়কালে রেণুর চিবুক ধরে বলেন,—এবার এসো কিন্তু বরকে সঙ্গে নিয়ে! রায়গিন্নী হেসে বলেন, বিয়ে ও করবে না বলেছে, তা তোমার শিবুর বিয়ের কি করলে? দীর্ঘশ্বাস ফেলে মাষ্টারগিন্নী উত্তর দেন,—চেষ্টার তো কসুর নেই দিদি, তবে জান তো, টাকা না হলে,—

তাঁর কথা শেষ না হতেই গাড়ী ছেড়ে দেয়। শিবু অর্থাৎ শিবাণী —একদৃষ্টে তাকিয়ে তাকে গাড়ীর দিকে, যেখানে রেণু তার সুদীর্ঘ বেণী সুসংবদ্ধ করছে।

ষ্টেশনের ইতিহাসে একদিন বিসদৃশ একটা ব্যাপার ঘটে গেল। সেদিন সকালের প্যাসেঞ্জার ট্রেণ চলে গেল। এ ট্রেণে যাত্রী বড় একটা নামে না, মাষ্টারমশায় ষ্টেশনঘরে তালাবন্ধ করে বাড়ীর দিকে রওনা হওয়ার উদ্যোগ করছেন, এমন সময় পঞ্চুলালের উত্তেজিত কণ্ঠস্বরে থমকে গেলেন। পঞ্চুলালের এরকম কণ্ঠস্বর অশ্রুতপূর্ব্ব, মাষ্টারমশায় ফিরে তাকালেন। ব্যাপার দেখে তাঁরও উত্তেজনা উপস্থিত হল। একটা বড় পোটম্যাণ্টো ও হোল্ডল বহন করে পঞ্চু উত্তেজিতভাবে এগিয়ে আসছে তাঁরই দিকে, আর তার পিছনে একজন ভদ্রলোক। পোর্টম্যাণ্টো ও হোল্ডল মাষ্টারমশায় পূর্ব্বে দেখেছেন, কিন্তু এরূপ সুপুরুষ ও সুবেশ যুবক শক্তিপুর ষ্টেশনের প্ল্যাটফরমে তিনি এই প্রথম দেখলেন।

মাষ্টারমশায়ের ঘরের সম্মুখে বোঝা নামিয়ে পঞ্চু বলল, কলকাতা

থেকে বাবু এয়েছেন। যাবেন রায়মহাশয়ের বাড়ী। কিন্তু ওনারা তো এই সেদিন মাত্তর গেলেন কলকাতা। এখন কি করবা ঠিক কর।

একনিশ্বাসে কথাগুলি বলে নগদ একটি আধুলি ট্যাঁকে গুঁজে পঞ্চু প্রস্থান করল।

নবাগতের দিকে তাকিয়ে আর একবার দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করে মাষ্টারমশায় তালা খুলে বললেন,—আসুন।

ভদ্রলোক ঘরে প্রবেশ করে মাষ্টার মশায়ের টুলে বসলেন। তারপর গায়ের চাদরটা টেবিলের উপর রেখে বললেন,—তাইত! বড় মুস্কিলে পড়া গেল।

—বড়বাড়ীর রায়েরা এই পরশু দিন গেলেন কলকাতায়। মুকুন্দ রায়, গিন্নী আর তাঁদের নাতনী। ফিরবেন দিন পনের পরে। তা আপনি আসবেন কোথা থেকে?

খবর শুনে আগন্তুক একটু নিরাশ হলেন। ক্ষুণ্নস্বরে বললেন,—কলকাতা থেকে আমিও আসচি। ওঁদের সঙ্গে দেখা করা বিশেষ প্রয়োজন ছিল। এসব এই বিদেশ বিভূঁয়ে—

বাধা দিয়ে মাষ্টারমশায় বললেন,—সে আপনাকে ভাবতে হবে না। পরেশ গুপ্ত শক্তিপুরে ষ্টেশনমাষ্টার থাকতে আপনাকে কোন কষ্ট পেতে হবে না। আমার ওখানে চলুন, খাওয়া দাওয়া করে তারপর যা হয় করা যাবে। আপনার বাড়ী বোধ হয় কলকাতায়?

আগন্তুক একটা তৃপ্তির বিশ্বাস ত্যাগ করে বললেন,—বাঁচালেন আপনি পরেশবাবু! দেশে এখনও অতিথি-সৎকার প্রথা লুপ্ত হয়নি দেখচি। আমার পরিচয়টাও আপনাকে দিয়ে দিই। বাড়ী আমার ঠিক কলকাতায় নয়, তবে আপাততঃ আছি সেখানে। দেশ আমাদের একসময় এই শক্তিপুরেই ছিল, তবে ঘরছাড়া আজ প্রায় দুই বৎসর আমার নাম দিবাকর সেন, পিতার—

পরেশবাবু দিবাকরকে কথা শেষ করবার অবসর দিলেন না। হাত ধরে বললেন,—আর বলতে হবে না। রায়মশায়ের কাছে আমি তোমার কথা অনেক শুনেছি। কিছু মনে কোরো না, বয়সে অনেক ছোট বলেই তুমি বলে ফেললাম। তুমিই তো বিলেত থেকে ডাক্তারি পাশ করে এসেছ?

দিবাকর এতক্ষণে পরেশবাবুকে ভাল করে দেখল। পরেশবাবুর বয়স কত, বলা কঠিন। শুষ্ক কুঞ্চিত মুখে জীবন-সংগ্রামের ছাপ, মস্তকের কেশ প্রায় শুভ্র হয়ে এসেছে। সে টুল থেকে হঠাৎ উঠে বলল,—আপনি বসুন পরেশবাবু, রায়মশায়ের বন্ধু আপনি! ওঁদের সঙ্গে আমাদের বহুকালের আলাপ। ওঁদের ছিল বড়বাড়ী, আর আমাদের বাড়ীকে লোকে বলত ছোটবাড়ী। আমার বয়স তখন দশ, সেই থেকে আমরা গ্রামছাড়া। রায়মশায়ের নাতনী রেণুর বয়স তখন বোধ হয় দুই কি তিন। তারপর বাবার মৃত্যু হল,—মা অবশ্য আগেই গিয়েছিলেন আমিও যা কিছু টাকাকড়ি ছিল, যোগাড় করে পাড়ি দিলাম বিদেশে। বিলেতে গেলে একটা ডিগ্রী নিয়ে ফিরতে হয়, আমি ফিরে এলাম ডাক্তারি ডিগ্রী নিয়ে। রায়মশায় সবই জানেন, একমাত্র ওঁর সঙ্গেই আমার পত্রালাপ চলে এসেছে। বিলেত থেকে ফিরেছি এই দশদিন হল। কলকাতায় হোটেলে উঠে সর্ব্বপ্রথমে স্থির করলাম, মাতৃভূমি শক্তিপুরকে দর্শন করে আসি।

পরেশবাবু এতক্ষণ কথা বলবার অবকাশ না পেয়ে অস্থির হয়ে উঠেছিলেন। এইবার সাগ্রহে বললেন,—রায়মশায়রা ফিরে না আসা পর্য্যন্ত তুমি আমার এখানেই থেকে যাও বাবা। আমি তো এখানে আছি একরকম বনবাসে, সঙ্গীর মধ্যে পঞ্চু আর সীতারাম মিঠাইওয়ালা। গ্রাম এখান থেকে তিন মাইল দূরে। আমার এখানে কোন অসুবিধা হবে না তোমার। এসেছো যখন, গ্রামের অবস্থা নিজের চোখে দেখে যাও।

দিবাকার পরেশবাবুর কথার উত্তর দিল না, শুধু একটা পরম স্বস্তির নিশ্বাস ত্যাগ করল।

•রায়গিন্নীর বাপের বাড়ীতে একদিন নিম্নলিখিত কথাবার্ত্তা হচ্ছিল। মুকুন্দরায়—দিবাকর যে হোটেলের ঠিকানা দিয়েছিল, সেখানে খোঁজ করে এলাম।

রায়গিন্নী—দেখা হল?

—না, হোটেলে নেই। বিলেত থেকে ফিরে উঠেছে ওখানে, কিন্তু আজ তিন দিন তার কোন খোঁজ নেই। হোটেলের ম্যানেজারও কিছু বলতে পারল না।

—ভারী আশ্চর্য্য ব্যাপার তো! কোথায়ও গেলে আমাদের জানিয়ে না যাবার ছেলে তো সে নয়!

—তাই তো গিন্নী, দিবাকর বড় ফ্যাসাদে ফেলল দেখছি। যোগেশের ছেলে, তার মৃত্যুর পরে আমরাই তো ওকে একরকম গড়ে পিটে মানুষ করলাম। বিলেতে যে গেল, সেও তো আমারই পরামর্শে।

—যাক্, ভালয় ভালয় ফিরে এসেছে এই ঢের। বিলেত গেলে আজকাল তো আবার ফ্যাসান আছে একটা মেম ঘাড়ে করে আনা। আমাদের দিবাকর কিন্তু সে ধাঁচের ছেলে নয়। এইবার রেণুর সঙ্গে একবার দেখা করিয়ে দাও, তারপর—

রায়গিন্নী কথা শেষ না করে অর্থপূর্ণ হাসি হাসলেন!

মুকুন্দ রায় স্ত্রীর কথায় যেন একটু অন্যমনস্ক হয়ে গেলেন। বোধ হয় পুরাতন স্মৃতি তাঁর মনকে পীড়িত করছিল।

রায়গিন্নী বললেন—চুপ করে আছ যে! কথাটা বুঝি মনে লাগল না! দিবাকরের মত ছেলে আজকাল কোথায় পাওয়া যাবে বল? আমাদের পালটি ঘর, তবে বলতে পার বাড়ীঘর তার কিছুই নেই। তা

তোমার তো টাকার অভাব নেই, রেণুর বাপও রেখে গেছে মন্দ নয়। সে আজ থাকলে আমাদের কিছুই ভাবতে হত না।

গিন্নীর চোখে জল দেখা দিল।

মুকুন্দ হঠাৎ ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। বললেন,—না, না, রেণুর বিয়ের ব্যাপারে তোমায় সঙ্গে আমি একমত। তবে রমেনের ভারী ইচ্ছে ছিল রেণুর বিয়ে দেয় অশোকের সঙ্গে। মৃত্যুর দিনও এই অনুরোধই সে আমাকে করে গেছে।

—সেকথা আমাকে ও বলে গেছে সে। কিন্তু অশোক তো লেখাপড়া কিছুই শিখল না। ম্যাট্রিক পাশ করে শক্তিপুরেই থেকে গেল। শুনতে পাই আজকাল কি একটা সঙ্ঘ না প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছে, যত ছোটলোকের ছেলেমেয়েদের নিয়ে। তাই নিয়ে দিনরাত ব্যস্ত থাকে।

—রমেনের কিন্তু অশোকের উপর ভারী শ্রদ্ধা ছিল। বলত, দেশের ছেলেরা দেশে থাকলেই সব চেয়ে ভাল কাজ করতে পারে। বিলেত ঘুরে এলে তারা স্বদেশের প্রতি খানিকটা মমতাহীন হয়ে যায়।

—রেণু কিন্তু অশোককে দুচোখে দেখতে পারে না। আমাদের কাছে শুনে দিবাকরের দিকে ওর খানিকটা টান হয়েছে। আমাকে অনেকদিন জিগ্যেস করেছে বিলেত থেকে সে কবে ফিরবে। এখানে হঠাৎ চলে আসার কারণও ও বোধ হয় আন্দাজে ধরে নিয়েছে।

মুকুন্দ রায় হঠাৎ চুপ করে গেলেন। শীতকালের সকালবেলায় একঝলক কাঁচা রোদ জানালা দিয়ে ঘরে প্রবেশ করেছে। মুকুন্দ রায় সেই দিকে পা বাড়িয়ে আরামে চোখ বুঁজলেন। বাইরে তখন নাগরিক জীবনের সাড়া পড়ে গেছে। হকারদের অবিশ্রান্ত চীৎকার আর রিকশর টুংটাং, ছ্যাকড়া গাড়ীর পীড়াদায়ক শব্দে আর মোটরের হুঙ্কার।

রায়গিন্নী মৌনতা ভঙ্গ করে বললেন,—যাক্, মেয়ের বিয়ের ব্যবস্থা

একটা করে ফেল, যার সঙ্গেই হোক। বয়স হয়েছে, আর ভাল দেখায় না। ষ্টেশনমাষ্টার পরেশের বৌ পর্য্যন্ত সেদিন বলছিল—

গিন্নীর কথা আর শেষ হল না। ক্রুদ্ধস্বরে মুকুন্দ বললেন,—পরেশের নিজের মেয়ে কত বড় শুনি! আমাদের রেণুর চেয়েও বোধ করি বড় হবে। মাষ্টার তার বিয়ের ব্যবস্থা করুক আগে।

বিদ্রূপহাস্যে গিন্নী বললেন,—ও মেয়ের বিয়ে হওয়া মুস্কিল, যেমন রূপ, তেমনি গুণ। কুড়ি বছর মাষ্টার আছে শক্তিপুরে, ওই হল ওর বড় মেয়ে। যখন এল ওরা শক্তিপুরে, মেয়ের বয়স তখন চার। একটা দিনের জন্যেও ওরা কোথাও যায় নি। মেয়েকে একেবারে পাঁড়াগেঁয়ে বানিয়ে ছেড়েছে।

গিন্নী আর ও কি বলতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু কার পায়ের শব্দে থেমে গেলেন। তাকিয়ে দেখলেন তাঁদের সামনে দিয়ে রেণু বেরিয়ে যাচ্ছে।

মুকুন্দ বললেন,—কোথায় চললি রে এই সকালবেলা এত সেজেগুজে?

রেণু বলল,—জাগরণী ক্লাব, ক্লাবের আজ প্রতিষ্ঠাদিবস, গান করতে হবে! সুশান্তদা বড্ড ধরেছে।

রায় গিন্নী বললেন,—জাগরণী ক্লাব? সে আবার কোথায়? সুশান্তদাই বা কে?

দুহাত মাথায় রেখে রেণু বলল,—আসতে পারব না বাপু। ক্লাব হল হাতীবাগানে, সুশান্তদা ক্লাবের সেক্রেটারী।

মুকুন্দ হেসে বললেন,—বাপ্‌রে, কোথায় টালিগঞ্জ, আর কোথায় হাতীবাগান! তা তোর সঙ্গে ওদের জানাশোনা হল কি করে?

—সুশান্তদার সঙ্গে আলাপ হল একদিন পার্কে। ভারী চমৎকার লোক। দেশের জন্য দুবছর জেল খেটেচেন। এখন এই ক্লাবের মারফত দেশসেবা করচেন। কত ছেলেমেয়ে যে ক্লাবে আসে তার ঠিক

দেই। কলকাতার মেয়েরা তো সুশান্তদাকে সবাই চেনে। আমি চললাম, আর দেরী করতে পারব না।

আঁচল দুলিয়ে রেণু বেরিয়ে গেল।

রায়গিন্নী বললেন,—এতটা ভাল নয় কিন্তু, রেণু যেন একটু বাড়াবাড়ি করচে।

স্ত্রীর কথাটা উড়িয়ে দেবার ভান করে মুকুন্দ বললেন,—দিবাকরের সঙ্গে বিয়ে হলে এ-সবই তো ওকে করতে হবে। বিলেতফেরতের স্ত্রী তো আর তোমাদের মত ঘরে বসে থাকতে পারবে না! তখন এই সবই হয়ে দাঁড়াবে ওর গুণ।

—কিন্তু সব জিনিষেরই একটা সীমা আছে তো! আজ কিন্তু রেণুর কাপড় পরার ঢংটা আমার ভাল লাগল না। শরীরের আদ্ধেক ভাগ যদি খোলাই থাকলা তবে কাপড় পরে লাভ কি! কি জানি বাপু, আজকালকার মেয়েদের কি যে সব স্টাইল হয়েচে!

—এই দেখ, পাড়া গাঁয়ে থেকে তুমিও সংস্কারমুক্ত হতে পার নি। কলকাতার মেয়েদের দেখচ তো, সবারই রেণুর মত কাপড় পরার স্টাইল। একি পরেশমাষ্টারের মেয়ে পেয়েচ যে, বোশেখ মাসের গরমেও সাতপুরু কাপড় গায়ে জড়িয়ে রাখবে? তবে বলতে পার, ঐ সুশান্তদা টুশান্তদার সঙ্গে অত মেলামেশা না করাই ভাল! তবে একটা কথা ভুলে যেও না যে, বিলেতফেরত সমাজে পুরুষরা নিজের স্ত্রীকে উপেক্ষা করে পরস্ত্রীর উপর বেশী নজর দেয়, আর মেয়েরা নিজের স্বামীকে অবহেলা করে পরপুরুষকে দিয়ে চলাচলি করতে পছন্দ করে। দিবাকরের সঙ্গে বিয়ে হয়ে ওর, আদবকায়দা একটু শিখে রাখা দরকার।

গিন্নীর কিন্তু কর্ত্তার কথা বিশেষ মনঃপূত হল না। তিনি বললেন,—দিবাকর বিলেত ফেরত হতে পারে, কিন্তু তুমি তো নও। তোমার

নাতনীও কিছু একটা শহুরে নয়। যাই বল, আজকে ওর ওভাবে চলে যাওয়াটা আমার ভাল লাগলো না। আমাদের একটা অনুমতি নেওয়া পর্য্যন্ত দরকার মনে করল না। ওবেলা হোটেলে একটু খোঁজ কর। দিবাকর না এসে থাকে ত চল শান্তিপুরে ফিরে।

গিন্নীর কণ্ঠস্বরে মুকুন্দ রায় ভীত হলেন। স্ত্রীকে আর বেশী ঘাঁটাতে সাহস করলেন না।

জাগরণী ক্লাবের প্রতিষ্ঠাদিবসে বহু উৎসাহী সজ্জন যেন ক্লাবের সুসজ্জিত সভামণ্ডপে ভেঙ্গে পড়েছে। উকীল, ব্যারিষ্টার, মাষ্টার থেকে আরম্ভ করে ব্যবসাদার ও শেয়ার মার্কেটের দালাল পর্য্যন্ত এসে ভীড় করেছে। সেক্রেটারী সুশান্তর ইচ্ছা ছিল অনুষ্ঠানের আয়োজন সন্ধ্যাবেলায় সম্পন্ন করা, কিন্তু কয়েকজন মহিলাসভ্যের অভিভাবকের আগ্রহাতিশয্যে সভার উদ্যোগ সকালবেলাই করতে হয়েছে।

জাগরণী ক্লাব শহরের বেশ নামকরা ও সুপ্রতিষ্ঠিত ক্লাব। সভ্যসংখ্যা এক হাজারের উপর। খবরের কাগজে প্রতি বৎসর নববর্ষের প্রারম্ভে জাগরণী ক্লাবের বিজ্ঞাপন চোখে পড়ে,—'নতুন সভ্য আর সংগ্রহ হইবে না।' কিন্তু কি এক রহস্যজনক উপায়ে সভ্যসংখ্যা প্রতি বৎসরই বর্দ্ধিত হয়।

ক্লাবের বাড়ীটি শহরের এক ধনী ব্যক্তি দান করেছেন। তিনি আজীবন সভ্যপর্য্যায়ভুক্ত। অবশ্য বনেদী বড়লোক তিনি হতে এখনও পারেন নি, যুদ্ধের ও দুর্ম্মূল্যের বাজারে দু'পয়সা গুছিয়ে নিয়েছেন। লোকও তিনি চালাক। সকলেই জানে আগামী নির্ব্বাচনে কাউন্সিলে প্রবেশ করবার জন্য সুন্দরলালবাবু ক্লাবগুলিকে হাতে রেখেছেন। তাই সুন্দরলাল জাগরণী ক্লাবকেই বাড়ী দান করে ক্ষান্ত হন নি, অনেকগুলি সদ্যোজাত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে টাকা দান করেছেন ও কয়েকজন

রাজনৈতিক চাঁইকে মাসোহারার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। শত্রুপক্ষ কানাঘুসা করে,—জগরণী ক্লাবের সেক্রেটারী সুশান্ত নাকি তাঁরই বেতনভোগী অনুচর।

শত্রুপক্ষ যাই বলুক, সুশান্তর কর্ম্মদক্ষতা প্রশংসনীয়। দেশসেবা করে সে খ্যাতি অর্জ্জন করেছে যথেষ্ট, এবং মোটা কাপড়ের অন্তরালে তার মানসিক বৃত্তিসমূহ স্থূলত্বপ্রাপ্ত হয়নি। জেলে থাকা কালীন সুশান্তর গান অন্যান্য রাজনৈতিক বন্দীদের ক্লান্তি আপনোদন করত। সেবার শহরের এক প্রদর্শনীতে সুশান্ত বোসের আঁকা ছবি যথেষ্ট সুখ্যাতি অর্জ্জন করছিল। ম্যাট্রিক পাশ করে সে বন্দীশালায় প্রবেশ করে। এম এ—বি এল হয়ে বেরিয়ে এল। জেল থেকে বেরিয়ে দেখল দেশের লোকের মতিগতি ফিরে গেছে। তার বাল্যজীবনে ছেলেরা হয় পড়াশুনা করত আর না হয় স্বদেশী করত। দশ বৎসর কারাজীবনের পর সুশান্ত দেখল ছেলেরা হয় সিনেমা দেখে আর না হয় ক্লাব করে। অনেক চিন্তার পর সুশান্ত শেষোক্ত পন্থা গ্রহণ করল। কলকাতায় ক্লাবের ছড়াছড়ি, অলিতে-গলিতে ক্লাব,—ছেলেদের, মেয়েদের, ছেলেমেয়েদের, স্ত্রীদের, পুরুষদের, স্ত্রীপুরুষের। এই বিরাট প্রতিযোগিতার মধ্যে সুশান্ত বোসের প্রতিষ্ঠিত জাগরণী ক্লাব অল্পসময়ের মধ্যে শীর্ষস্থান অধিকার করল। সুশান্ত স্বয়ং পরিচিত হল অসংখ্য জনগণের দাদারূপে—ছেলের ও ছেলের বাপ উভয়েরই দাদা। তার বয়সের প্রশ্নটা যেন চাপা পড়ে গেল।

সুশান্তর সবচেয়ে বড় ক্ষমতা, অপরিচিত নরনারীকে যথাসম্ভব শীঘ্র পরিচিত করে নেওয়া। সুশ্রী ছেলেমেয়ের দেখা পেলে সে তার এক বিশিষ্ট কৌশল প্রয়োগ করে অতিশীঘ্রই তাদের বিশ্বাসভাজন হয় ও ক্লাবের খাতায় নাম লিখিয়ে নেয়। তাই মুকুন্দ রায়ের নাতনী রেণুর মতিগতি জয় করতে তাকে বিশেষ বেগ পেতে হয়নি।

ক্লাবের প্রতিষ্ঠাদিবসে সুশান্তর ব্যগ্রতা ও কর্ম্মতৎপরতা দেখে মনে হয়, এ যেন তারই জীবন প্রতিষ্ঠা। চুলে কলপ দিয়ে, অতি মোলায়েমভাবে দাড়ী কামিয়ে, মিহি ধুতি পাঞ্জাবী ও কাবলী স্যাণ্ডাল পায়ে দিয়ে সুশান্ত পঁয়তাল্লিশ বৎসরকে নামিয়ে আনে পঁয়ত্রিশে। চশমার পুরু কাঁচের আড়ালে চোখদুটোয় ফুটিয়ে তোলে একটা স্বপ্নের ঘোর, মুখে দেখা দেয় স্মিত হাসি।

সেদিনকার উৎসবে সবচেয়ে আকর্ষণীয় হল রেণুর উদ্বোধন সঙ্গীত উৎসব সমাপ্তির পর সুন্দরলালবাবু চুপিচুপি জিজ্ঞাসা করলেন সুশান্তকে, মেয়েটি কোথাকার আমদানী হে? গলাখানি খাসা।

মুচকি হেসে সুশান্ত বলল,—আমার কোন কাজটি খারাপ বলুন তো? রেণুকে আপনার মনে ধরেছে দেখছি। সব ঠিক হয়ে যাবে। পাড়াগাঁ থেকে এসেছে। পর্কে আমার সঙ্গে আলাপ। কাল হল তো আমাদের ক্লাবের প্রাইভেট ফাংশন, আপনার সঙ্গে কালই ভাব করিয়ে দেব। সুন্দরলাল বলল,—তোমাদের ঘরোয়া ব্যাপারে ও আসবে কেন!

সুশান্ত হাসিতে ভেঙ্গে পড়ল, বলল,—একটা বিচক্ষণ লোক হয়ে আপনি অবুঝের মত কথাটা বললেন।

সুন্দরলালের প্রস্থানের পর সুশান্ত রেণুকে বলল,—চল তোমাকে আমার মোটরে পৌঁছে দিয়ে আসি, টালিগঞ্জে আমারও একটু দরকার আছে।

মোটর চলতে আরম্ভ করলে সুশান্ত বলল,—যাক্ আমায় মনে তুমি রেখেছ। সুন্দরবাবু তো তোমার গান শুনে মুগ্ধ হয়েছেন।

রেণু বিস্ময়ের সুরে বলল,—সুন্দরবাবুকে তো চিনতে পারলাম না সুশান্তদা!

—কি করে চিনবে বল! বেশীর ভাগ সময়ই তো কাটে তোমাদের গ্রামে। সুন্দরবাবু হলেন আমাদের ক্লাবের মস্তবড় একজন পেট্রন।

অগাধ টাকা করেছেন ব্যবসায়ে, কিন্তু ওঁর শিল্পে ও সাহিত্যের প্রতি টানও আছে যথেষ্ট।

রেণু বলল,—এবার বুঝতে পারছি। উৎসব শেষ হলে আপনার সঙ্গে যিনি আলাপ করছিলেন ?

—ঠিক ধরেছ। বয়স কম ভদ্রলোকের, সিল্কের চাদর গলায় জড়ান, চেহারাটা মন্দ নয়।

ওঁর গাড়ীখানিও ভারী সুন্দর, চকোলেট রং এর গাড়ী।

ষ্ট্র্যাণ্ড রোড্ ধরে গাড়ী হু হু করে ছুটে চলেছে। সুশান্ত ও রেণু পাশাপাশি বসেছিল। সুশান্ত হঠাৎ প্রশ্ন করল,—আচ্ছা রেণু, তুমি যে এভাবে একা একা ঘুরে বেড়াও, তোমার অভিভাবকদের আপত্তি হয় না ?

রেণু বলল,—এবার কিন্তু সুশান্তদা, আপনার কথা পাড়াগাঁয়ের লোকের মত হল। আপত্তি করবে কেন ? আমি তো সাবালক হয়েছি। আমি গ্রামে থাকলেও আপনাদের শহরের সব খবরই রাখি। এই সেদিন কাগজে দেখলাম, মেয়েয়ের এক শোভাযাত্রা বেরিয়েছে ডিভোর্স বিল সমর্থন করে, আমি শক্তিপুর থেকে ওদের সঙ্গে মনে মনে যোগ দিলাম। হ্যাঁ, আর আপত্তি করবার মত এখানকার বাড়ীতে কেউ নেই। মামা মামীরা সব চেঞ্জে, থাকার মধ্যে বুড়ো দাদু আর বুড়ী দিদিমা।

নিশ্চিন্তভাবে সুশান্ত বলল,—কাল তাহলে আসছ তো ? কাল বৈকালে ক্লাবের একটা ঘরোয়া ব্যাপার আছে ;—এই একটু গান বাজনা আর আর্টিষ্টদের মিষ্টিমুখ করান।

উৎসাহের সুরে রেণু বলল,—নিশ্চয়ই আসব, আমাকে আর বেশী বলতে হবে না সুশান্তদা

নিজের অজ্ঞাতসারে সুশান্ত রেণুর গায়ের কাছে অনেকটা সরে এসেছে। সেদিন কি একটা ছুটি থাকায় ষ্ট্র্যাণ্ড রোড্ প্রায় জনশূণ্য।

সুশান্ত হঠাৎ পাগলের মত চীৎকার করে ড্রাইভারকে গাড়ী থামাতে বলল! বিস্মিত ড্রাইভার আচম্বিতে গাড়ীর ব্রেক কষে দিল। রেণুও অবাক।

সুশান্ত থরথর করে কাঁপছে। সে ভাঙ্গাভাঙ্গা সুরে রেণুকে বলল,—টালিগঞ্জে যেতে আমার একটু দেরী হবে রেণু। ঐ ট্রাম আসছে, টালিগঞ্জের ট্রাম, তুমি বাড়ী চলে যাও।

বিস্মিত রেণুকে কথা বলবার অবসর না দিয়ে সুশান্ত গাড়ীতে বসে ঝড়ের বেগে উধাও হয়ে গেল।

শক্তিপুর ষ্টেশন থেকে হাতীগাঁ প্রায় সাত মাইল। একদিন বিকালের প্যাসেঞ্জরে ট্রেণ থেকে একটিমাত্র যাত্রী নেমে ষ্টেশনমাষ্টারের হাতে টিকিট দিয়ে হাতীগাঁর পথে পা বাড়াল। পরেশবাবু একবার বিদ্রূপহাস্যে তার দিকে তাকালেন। যাত্রীর পরণে আধময়লা খদ্দরের ধুতি ও ফতুয়া, পায়ে সাদা ক্যাম্বিলের জুতো। ক্ষুণ্ণস্বরে পঞ্চুলাল বলল,—অশোকবাবু টেরেণ থেকে নামলে লাভ কিছু নেই মাষ্টারমোশায়। আধমণি এক বোঝা নিজেই ঘাড়ে করে চলল হাতীগাঁ।

পরেশবাবু বললেন,—হ্যাঁ, তোদের অশোকবাবু ঠিক করেছে গাঁয়ের সব লোককে লেখাপড়া শিখিয়ে পণ্ডিত করে ছাড়বে। শুনলাম তুই আর সীতারামও নাকি অশোকবাবুর ইস্কুলে পড়তে যাস্ রাতের বেলা।

—কি করি মাষ্টারমোশায়, ও বাবু নাছোড়বন্দা। আমাদের একদিন একরকম টেনে নিয়ে গেলেন। সীতারাম আরও আগে যাতায়াত করছে। আমি তো এই হপ্তাখানেক যাচ্ছি, এর মধ্যে হরপ একটু একটু চিনে ফেলেছি।

—তবে আর কি! আমি বিদেয় নিলেই তোকে কোম্পানী শক্তিপুরের ইষ্টিশন মাষ্টার করে দেবে!

যার সম্বন্ধে এই সকল আলোচনা চলছিল শক্তিপুর ষ্টেশনের প্ল্যাটফরমে, সে কিন্তু ততক্ষণ অনেকখানি পথ এগিয়ে গেছে। সন্ধ্যা হতে তখনও প্রায় একঘণ্টা দেরী, কিন্তু শীতকালের বৈকালে সন্ধ্যার আগমনী অতর্কিতে বেজে ওঠে সূর্য্যের কিরণ হয়েছে মন্দীভূত, আকাশে বাতাসে একটা ঘন কুয়াসার প্লাবন ধীরে ধীরে জেগে উঠছে। নিস্তব্ধ পল্লীপথে পথিক অশোক একা, একটা ঘরছাড়া গরু শুধু মন্থরগতিতে পথ চলছে

হাতীগাঁ পৌঁছেতে এখনও পাঁচ মাইল বাকী। অশোক একটা টিলার উপর উঠে ঘাড় থেকে বোঝা নামিয়ে চারিদিকে তাকাল। পথের এই দিকটা বোঝা নিয়ে চলাফেরা করা মুস্কিল। উঁচু-নীচু পথে, বড় বড় কাঁকর বিছানো। অশোকের ক্যাম্বিসের জুতো ভেদ করে কাঁকর পায়ে লাগছে। সে জুতো খুলে বোঝার উপর বসে পড়ল। এই শীতকালেও তার খদ্দরের ফতুয়া ঘামে ভিজে উঠেছে।

টিলার উপর থেকে অনেক দূর পর্য্যন্ত দৃষ্টি প্রসারিত হয়। চারিদিকে শুধু শাল গাছ আর পলাশ বন। কুঁড়ি রাঙা হয়ে উঠেছে, মাঘমাসের গোড়াতেই ফুটতে সুরু করবে। শালের পাতা ঝরে পড়েছে মাটির উপর, বসন্তের সমাগমে নূতন পাতার মাহাত্ম্যে বৃদ্ধ শালতরু পুনরায় মহীয়ান হয়ে উঠবে। মাঠে ফসল হয় না, কিন্তু লাল মাটির নীচে স্তরে স্তরে সঞ্চিত আছে খনিজ রত্ন। দূরে দেখা যাচ্ছে কলিয়ারীর ধোঁয়া, দিগনগরের লেবার কলোনী। দিগনগর কলিয়ারীতে নতুন একসার বাড়ী তৈরী হয়েছে, কুলিদের বাসের জন্য। এদিকে একমাত্র দিগনগর কলিয়ারীর কুলিদের সুখসুবিধার দিকে খানিকটা নজর দেয়। শক্তিপুর ষ্টেশনের আউটার সিগ্‌ন্যালও অশোক দেখতে পাচ্ছে। সিগ্‌ন্যালের নীচে পরেশবাবুর ছেলেমেয়েরা দাঁড়িয়ে আছে, সঙ্গে একজন বয়স্ক লোক।

বোধ হয় পরেশবাবুর আত্মীয়। মাস্টারমশায়ের মেয়ে শিবানীর সঙ্গে লোকটা হেসে হেসে গল্প করছে

গায়ে হঠাৎ ঠাণ্ডা হাওয়া লাগায় অশোক চমকে উঠল। বেলা শেষ হয়ে এল, সূর্য্যদেব রঙসাগরে আত্মবিলোপ করবার আয়োজন করছেন। অশোকের মনে হল জবাকুসুমসন্নিভ, কিন্তু সূর্য্য যেন জবাফুলের চেয়েও লাল। এ লালের যেন আর কোন উপমা নেই। স্তরে স্তরে লাল রঙ আকাশের গায়ে নিঃশেষে জড়িয়ে আছে। পশ্চিম আকাশে একখণ্ড ধূসর মেঘ নিশ্চল পটে-আঁকা ছবির মত প্রতীয়মান হচ্ছে। টিলার উপর থেকে বোঝাটা অশোক আবার ঘাড়ে তুলে নিল।

শীতের গোধূলি অধিকক্ষণ স্থায়ী হয় না। আকাশে তারকার আঁখি দেখা দিল। অন্ধকারের অর্গল পৃথিবীর বুকে একটা ব্যবধান সৃষ্টি করল। সুস্পষ্ট একটা ক্লান্তি অশোককে যেন আচ্ছন্ন করে ফেলেছে। জীবন এই প্রথম একটা অবসাদ সে অনুভব করল। চরকা ও তুলোর বোঝা সেদিন যেন অবহনীয় মনে হল। একটু ভীত ও বিস্মিত হল অশোক। এমনটি কোনদিন হয় নি। একমাস আগেও সে চারটে চরকা ও একরাশ তূলো অক্লেশে বহন করে নিয়ে গেছে শক্তিপুর ষ্টেশন থেকে হাভীগাঁ পর্য্যন্ত। হাতের পেশীসমূহে টিপে দেখল সে। বেশ শক্তই আছে। পায়ের জোরও কমেছে বলে মনে হল না। তবে এ দুর্ব্বলতা কেন? শরীরের নয়া তবে কি মনের?

মনের দুর্ব্বলতার কথা চিন্তা করতেই অশোক লজ্জিত হল। এ দুর্ব্বলতা কি রেণুর জন্য। রেণুকে সে কলকাতায় হঠাৎ দেখে ফেলেছে। জাগরনী ক্লাবের সম্মুখে মোটরে আরোহণ করেছে সুশান্তর সঙ্গে। সুশান্তকে সে চেনে। দুজনে একসঙ্গে কারাবাস করেছে প্রায় সাত বছর। সুশান্তর সঙ্গে রেণুর কি করে পরিচয় হল? বড়বাড়ীর লোকজনের

মুখে সে শুনেছে এক বিলেতফেরত ডাক্তারের সঙ্গে রেণুর বিয়ে হবে। অবশ্য রেণুর বাপের ইচ্ছে ছিল অন্য রকম। সে ইচ্ছা পূর্ণ হওয়ার আশা তাঁর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে নষ্ট হয়ে গেছে।

রেণুকে অশোক দেখে আসছে ছেলেবেলা থেকে। ফ্রকপরা ছোট্টখাট্টো মেয়েটি অল্পবয়সেই শহরে প্রতি অতিমাত্রায় অনুরাগী হয়ে উঠল। পৌত্রীর আবদার ঠেলতে না পেরে মুকুন্দ রায়কে প্রায়ই সপরিবারে কলকাতা ছুটতে হত। অবশ্য রেণু যে ঠিক পল্লীজীবনকে ঘৃণা করে তা নয়। শহরের প্রতি তার আকর্ষণ সম্পূর্ণ স্বাভাবিক মনে হয়।

অশোকের মনে হল, এ ভালই হয়েছে। বিলেতফেতর ডাক্তারের সঙ্গে বিয়ে বলে রেণু সুখী হবে। তার সঙ্গে বিয়ে হলে রেণুকে বাস করতে হত হাতীগাঁর পর্ণকুটিরে, তার শহুরে ভাবধারার সমাধি হত। পল্লীর কর্ম্মজীবনে অশোক অবশ্য হাতীগাঁয় কয়েকটি কর্ম্মকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেছে। সেখানে মেয়েদেরও আত্মপরিচয়ের যথেষ্ট সুযোগ আছে। হাতীগাঁর কয়েকটি মেয়ে ইতিমধ্যে কর্ম্মী হিসাবে পুরুষের সমান সুখ্যাতি লাভ করেছে। অশোক তাদের মধ্যেও বধূ-নির্ব্বাচন করতে পারত, কিন্তু রেণুর কথা মনে হতেই তার অন্যত্র বিবাহের সঙ্কল্প চাপা পড়ে যেত। রেণুর মত গর্ব্ব ও অভিমান পল্লীগ্রামের একটি মেয়ের মধ্যেও তার চোখে পড়ে নি।

কিন্তু রেণুর জীবনে সুশান্ত এসে জুটল কোথা থেকে? কলকাতায় কর্ম্মীমহলে সুশান্তর সম্বন্ধে ভাল রিপোর্ট সে পায় নি। রেণুর বিপদের আশঙ্কায় অশোক বিচলিত হয়ে উঠল।

টিলা থেকে নামবার আগে সে আবার চারিদিকে তাকাল। সন্ধ্যার তরল অন্ধকারে বিশ্বচরাচর নিমগ্ন। একটা শান্ত সমাহিত ভাব বিশ্বময় পরিব্যাপ্ত হয়েছে। দিগনগর কলিয়ারীর লেবার কলোনী পড়েছে

অন্ধকারে ঢাকা। শুধু কলিয়ায়ী ইঞ্জিনগুলি থেকে মাঝে মাঝে আগুণের একটা রক্তবর্ণ আভা আকাশময় ছড়িয়ে পড়ছে।

অশোক বোঝা নিয়ে টিলা থেকে নামল। ধূলি-ধূসরিত পল্লীসড়ক, এক মাইল অন্তর অন্তর চোখে পড়ে শুধু তাড়ির আড্ডা। নিঃশব্দে প্রেতের মত কুলির দল ত তাড়িখানা থেকে বেড়িয়ে অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। অশোককে দু-একজন চিনতে পারল।

—এঃ, অ্যাত রাতে কুথা থেকে গো মাষ্টারমুশা! যাও, পা চালিয়ে যাও, একটা ক্ষ্যাপা শেয়াল পরশু থেকে পথে ঘুরে বেড়াচ্চে।

একজন কুলি বলল,—স্থাও গো, তুমার বোঝাডা মুকে স্থাও, মুও যাব ওই হাতগাঁর দিকে।

অশোক নিশ্চিন্ত হল, বোঝা বহন করতে আজ তার সত্যিই কষ্ট হচ্ছিল।

দিবাকর পরপর চারদিন কাটিয়ে দিল পরেশবাবুর ষ্টেশন কোয়ার্টারে। কলকাতার হোটেলের বিলাতী খানার চেয়ে পরেশবাবুর স্ত্রীর রান্না তার অনেক বেশী উপাদেয় মনে হত। তার উপর শহরের সামাজিক জীবন ও ভিন্ন ধরনের। সবই যেন একটা ধরাবাঁধা নিয়মের মধ্যে। এর চেয়ে বিলাতের সামাজিক জীবন তার অনেকটা স্বাভাবিক মনে হত। বিলাত থেকে প্রত্যাবর্ত্তনের পর সে কলকাতায় অনেক বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে বাড়িতে দেখা করেছে, কিন্তু তার মধ্যে যেন কোন প্রাণ ছিল না। হোটেলে তার সঙ্গে দেখা করতে নেহাত প্রয়োজন ছাড়া কেউ আসে নি।

শক্তিপুর ষ্টেশনের প্রাঙ্গণে এক নূতন জীবনের সন্ধান পেল দিবাকর। পরকে আপন করে নিতে পারে, এই তথ্য সে এখানে আবিষ্কার করল। সম্পূর্ণ অপরিচিত পরেশবাবুর সংসার এই অল্প সময়ের মধ্যেই তার আপন সংসার হয়ে উঠল। শক্তিপুরে তার আলাপ শুধু বড় বাড়ীর রায়েদের

সঙ্গে, কিন্তু এই নূতন আলাপ তার কাছে কোনঅংশে হীন মনে হল না। প্রথম দিকটা দিবাকরেরই একটু সঙ্কোচ ছিল, আর সঙ্কোচ ছিল পরেশবাবুর মেয়ে শিবানীর। কিন্তু পরিবারের অন্য সকলের নিঃসঙ্কোচ ব্যবহারে দিবাকর ও শিবানীর সঙ্কোচ কেঁটে গেল।

পরেশবাবুর ছেলেমেয়েরা এই অপ্রত্যাশিত অতিথির আগমনে হল সবচেয়ে খুশী। দিবাকর হল তাদের খেলার সঙ্গী, ভ্রমণের সঙ্গী, পাঠের সঙ্গী। অনেক নূতন ধরণের খেলা তারা শিখে নিল দিবাকরের কাছে। ছেলেমেয়েরা দিবাকরদার সঙ্গে বেড়াতে যায় সকাল বিকাল, পরেশবাবুর বড় ছেলে টুকু পড়া বুঝে নেয় দিবাকরদার কাছে।

সেদিন সন্ধ্যাবেলা দিবাকর টুকুকে পড়া বলে দিচ্ছে। শক্তিপুর ইস্কুলের প্রথম শ্রেণীর ছাত্র টুকু,—দিবাকর হঠাৎ তাকে প্রশ্ন করল, মহাভারতে ভীষ্মের কাহিনী তুমি নিশ্চয় পড়েছ ?

টুকু বিস্ময়ের সুরে বলল,—ভীষ্ম! সে আবার কে ?

দিবাকরের বিস্ময় মাত্রা ছাড়িয়ে গেল। সে বলল,—মহাভারত তুমি পড়নি!

হাসতে হাসতে টুকু বলল,—মহাভারত এযুগে অচল দিবাকরদা। আপনি মার্কসের কথা জিগ্যেস করুণ, এক্ষুনি বলে দিচ্ছি। এক নতুন মাষ্টার এসেছে আমাদের ইস্কুলে, কত গল্প বলে আমাদের। শুনলে আপনি অবাক হয়ে যাবেন। মার্কস, লেনিন, ষ্ট্যালিন, ট্রটস্কী আর পৃথিবীর স্বর্গরাজ্য রাশিয়ার গল্প। এ মাষ্টারটার অনেক পড়াশুনা আছে দিবাকরদা।

দিবাকর হা করে শুনছিল, বলল,—মাষ্টার মশায়ের সম্বন্ধে তুমি ওভাবে কথা বলছ কেন টুকু ? মাষ্টার না বলে মাষ্টারমশায় বলতে হয়।

টুকু বলল,—বারে, আমার কি দোষ! বাবা বলেন মাষ্টার, গাঁয়ের সকলে বলে মাষ্টার, ওদের কাছেই তো আমি শিখেছি।

সেদিন দুপুরবেলা দিবানিদ্রার মায়া ত্যাগ করে দিবাকর শক্তিপুর

ইস্কুলে গিয়ে হাজির। তখন বোধ হয় টিফিনের সময়। মিলিত কিশোর কণ্ঠের চীৎকারে ইস্কুলের প্রাঙ্গণ মুখরিত। হেড্‌মাষ্টার মশায়ের সঙ্গে দিবাকরের পূর্ব্বেই পরিচয় হয়েছিল, তিনি তাকে খাতির করে বসালেন। তারপর একে একে অন্য শিক্ষকদের সঙ্গে দিবাকরের পরিচয় স্থরু করে দিলেন। মাষ্টার মশায়দের মধ্যে একটা জিনিষ তাকে বিশেষ আকৃষ্ট করল। সে লক্ষ্য করল, তাঁদের পোষাক পরিচ্ছদে বিশেষ বাহার না থাকলেও চুলে বাহার আছে। কোন শিক্ষকের সোজা সিঁথি ও দুধারে চুল মেয়েদের মত ফাঁপান। কোন শিক্ষকের ঘাড় লক্কড়গোছের লোকের মত ছাঁটা।

দিবাকর শিক্ষকদের কাছে টুকুর সম্বন্ধে তার অভিজ্ঞতা সবে বর্ণনা করবার উপক্রম করছে, এমন সময় ঘরের মধ্যে প্রবেশ করলেন এক অল্পবয়স্ক ভদ্রলোক। হেড্‌মাষ্টার মশায় দিবাকরকে বললেন—এর সঙ্গে এবার আলাপ করিয়ে দি। ইনি হলেন আমাদের নূতন শিক্ষক সন্তোষ আর ইনি হলেন গিয়ে শ্রীদিবাকর সেন বিলেত থেকে ডাক্তারী পাশ করে এসেছেন।

দিবাকর বলল,—ওঃ, ইনি তাহলে এখানকার মাষ্টার মশায়! আমি তো ওঁকে ছাত্র মনে করেছিলাম। আপনাদের ইস্কুলে গেটের কাছে দেখি একদল ছাত্রের সঙ্গে উনি বেশ গায়েগায়ে মিশে গেছেন। তা তাঁর পুরো নামটি কি?

হেডমাষ্টার মশায় গম্ভীরভাবে বললেন—পুরোনাম উনি স্বীকার করেন না, শুধু মাইনের খাতায় নামটি সম্পূর্ণ করে লেখেন। বাড়ী ওঁর কলকাতায়, শুধু গ্রামের মোহ ওঁকে শক্তিপুরে টেনে এনেছে। টিচার হিসাবে অল্প দিনেই বিশেষ নাম করেছেন। ছেলেদের শুধু লেখাপড়া শেখান না! দেশবিদেশের কত গল্প করেন, এযুগের বাইবেল মার্কসের বই থেকে ছেলেদের কতরকম উপদেশ দেন।

দিবাকরও গম্ভীরভাবে বললেন, এঁর কথাই টুকু আজ সকালে বলছিল। কিন্তু সন্তোষবাবু আপনার ছাত্র মহাভারতের উপাখ্যান জানে না, তাকে মার্কস পড়িয়ে লাভ আছে কিছু? স্বদেশে কাঞ্চনের অভাব নেই, বিদেশী রঙীন কাঁচের মোহ কেন?'

পাঞ্জাবীর আস্তিন গুটিয়ে সন্তোষ বলল,—আপনার কথা নেহাত বুর্জ্জোয়া সমাজের কথাবার্ত্তার মত দিবাকরবাবু! এযুগে মহাভারত পাঠের সার্থকতা কি?

বিদ্রূপের সুরে দিবাকর বলল,—ঠিকই বলেছেন। ভীষ্ম, কর্ণ একলব্যর চরিত্র ছেলেমেয়েদের পড়া থাকলে আপনাদের চলে কি করে!

সন্তোষ পাঞ্জাবীর আস্তিন আরও উপর দিকে তুলছে দেখে হেড্-মাষ্টার মশায় শঙ্কিত হয়ে উঠলেন। মধ্যস্থের সুরে বললেন,—কোন্‌টা ভাল কোন্‌টা মন্দ বলা বড় শক্ত। তবে আজকালকার অবহাওয়া তো একটু অন্যরকম হয়েছে মিঃ সেন। ছেলেরা আর শুধু দেশের সাহিত্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতে রাজী নয়, তারা চায় বিদেশের একটু আধটু খবর।

উত্তেজিত ভাবে দিবাকর বলল,—দেশের আবহাওয়া যে অন্যরকম হয়েছে সে জন্য আপনারাই তো দায়ী মাষ্টারমশায়। বিলেতে দেখেছি ইস্কুলের ছেলেরা সর্ব্বাগ্রে স্বদেশকে ভাল করে চিনতে শেখে, তারপর বিদেশের দিকে তাকায়। আর এখানে দেখছি বাচ্চা বাচ্চা ছেলেদের দুষ্পাচ্য মার্কসীয় বুলি গলাধঃকরণ করতে হচ্ছে। দেশের কাঞ্চন ফেলে বিদেশের রঙীন কাঁচে তাদের এক সর্ব্বনাশা মোহ জন্মিয়ে দেওয়া হচ্ছে।

হেড্মাষ্টার মশায় বললেন,—দোষ আমাদের একার নয় মিঃ সেন। একবার সমাজের দিকে তাকিয়ে দেখুন; সমাজ যে পথে চলেছে, সে পথে চলতে গেলে আপনার সত্যনিষ্ঠা কর্ত্তব্যনিষ্ঠার মূল্য কেউ দেবে না। যে শিক্ষক ছেলেদের মধ্যে একটা ডিসিপ্লিন অথবা একটা সিস্টেম আনবার চেষ্টা করেন, তাঁর অবস্থা অতি শোচনীয় হয়। ছাত্রদের নিকট

তিনি হন অপ্রিয়, আর সমাজের চোখে নিন্দনীয়। এযুগ হল বৈশ্যযুগ, লেখাপড়ার কাল ভাল হয়ে গেছে।

সেদিন বাড়ী ফিরে দিবাকর মাষ্টার মশায়ের কথাগুলিই চিন্তা করছিল। বৈকালের প্যাসেঞ্জার আসবার সময় হয়েছে, পরেশবাবু ষ্টেশনে প্রস্থান করেছেন। এমন সময় জলখাবারের থালা নিয়ে ঘরে প্রবেশ করল শিবানী।

একটা টুলের উপর থালা রেখে শিবানী বলল,—বড্ড গম্ভীর যে দিবাকরদা!

দীর্ঘশ্বাস ফেলে দিবাকর বলল,—ডাক্তার না হয়ে মাষ্টার হলে বোধ হয় আমি ভাল করতাম শিবানী।

শিবানী ফিক্ করে হেসে ফেলল, বলল,—এ উৎকট খেয়াল কি আজ শক্তিপুর ইস্কুলে দেখে হয়েছে দিবাদা? টুকু বলছিল, আপনার সঙ্গে নাকি হেড্‌মাষ্টার আর সন্তোষবাবুর ভীষণ ঝগড়া হয়ে গেছে।

দিবাকর বলল,—ঠাট্টা নয় শিবানী; ওঁদের সঙ্গে আজ আলোচনার পর আমার কেবলই মনে হচ্ছে, আমার মাষ্টার হওয়াই উচিত।

—সখ হয় তো হাতীগাঁ চলে যান, এখান থেকে সাত মাইল দূরে। এই গাঁয়ের অশোকবাবু সেখানে এক ইস্কুল খুলেছেন,—ঐ যে সেদিন আপনাকে দেখালাম যে ভদ্রলোককে, খদ্দরের ফতুয়া গায়ে, চরকা আর তূলোর মোট নিয়ে বিকেলের গাড়ীতে এলেন। মা গো মা, বিলেত থেকে ডাক্তারী পাশ করে এসে পাড়াগাঁয়ে মাষ্টারী করার সখ!

শিবানী মহারাগে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। খাবারের থালায় হাত দিয়ে দিবাকর শিবানীর শেষের উক্তি স্মরণ করে হেসে ফেলল। স্বল্প-শিক্ষিতা গ্রাম্য বালিকা, ওর কাছে বিলেতফেরত ডাক্তারের শহর ছেড়ে গ্রামে আসাই একটা মস্ত অপরাধ। রেণু নিশ্চয়ই এ রকম মন নিয়ে গড়ে ওঠে নি। মুকুন্দ জ্যাঠামশায় তো অনেকবার লিখেছেন চিঠিতে

—জন্মস্থান গ্রাম হলেও রেণুর মন গঠিত হয়েছে শহরের আবহাওয়ায়। দিবাকরের হঠাৎ মনে হল,—রেণুর সঙ্গে বিয়ে ঠিক না থাকলে সে হয়ত শিবানীকে বিয়ে করতে পারত। রেণুর কথা তার মনে পরে অস্পষ্ট একটা স্বপ্নের মত, আর শিবানীর জীবনের সঙ্গে সে অনেকটা পরিচিত হয়েছে। কী চমৎকার স্বাস্থ্য শিবানীর,—একটা শ্যামল সতেজ চারা গাছ যেন বিকশিত হয়ে উঠেছে জীবনের উন্মুক্ত প্রান্তরে। আচ্ছা, একাধিক বিবাহ কি সম্ভব নয়!

দিবাকর হঠাৎ অন্যমনস্ক হয়ে কি যেন ভাবতে লাগল।

শক্তিপুরে বহু পুরাতন একটি শিব মন্দির আছে। ষ্টেশন থেকে প্রায় তিন মাইল দূরে। মিঠাইওয়ালা সীতারাম একদিন ষ্টেশনমাষ্টারের বাড়ী খবর দিল, শিব-মন্দিরে এক সাধুর আবির্ভাব হয়েছে এবং সাধুবাবা নাকি অলৌকিক গুণসম্পন্ন। পরেশবাবুর স্ত্রী এই সংবাদে অত্যন্ত কৌতূহলী হয়ে উঠলেন। পরদিন পরেশবাবুকে বাড়ী পাহারায় রেখে তিনি দিবাকর ও ছেলেমেয়েদের নিয়ে শিবমন্দিরের দিকে যাত্রা করলেন।

সেদিনকার ঘটনার পর দিবাকর ও শিবানী দুজনেই পরস্পরের কাছে বিশেষ লজ্জিত হয়ে আছে। শিবানী বিচার করে দেখেছে,—দিবাকরের উপর তার রাগ করবার কোন অধিকার নেই। অধিকার থাকত, যদি —। সে চিন্তা যতই মধুর হোক্, শিবানীর নিকট তার কোন মূল্য নেই। বরং এই চিন্তায় সে গোপনে অত্যন্ত লজ্জা অনুভব করেছে। সে মনকে বারংবার বুঝিয়েছে,—বিলেতফেরত ডাক্তারের সঙ্গে গরীব ষ্টেশনমাষ্টারের মেয়ে বিয়ে হবার কোন সম্ভাবনা নেই।

শিবমন্দিরে আগমন কিন্তু ব্যর্থ হল। পরেশবাবুর স্ত্রী খবর পেলেন,—সাধুবাবা কোন কাজে হাতীগাঁ চলে গেছেন, ফিরতে দুএকদিন দেরী

হবে। বাবাজীর চেলাচামুণ্ডারা অবশ্য রয়েছে, তাদের মধ্যে দুএকজনেরও গুণপনা কিছুকিছু আছে। পরেশবাবুর স্ত্রীর প্রয়োজন হলে তাদের জানাতে পারেন। সংবাদ শুনে পরেশবাবুর স্ত্রী একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে মন্দিরের চত্বরে বসে পড়লেন। ছেলেমেয়েরাও জড়সড় হয়ে বসে ভীত চোখে মায়ের দিকে তাকিয়ে থাকল। পরেশবাবুর স্ত্রী চিন্তা করতে লাগলেন,—আর আসা সম্ভব হবে কিনা। আর অনেক কষ্টে পরেশ-বাবুকে রাজী করিয়ে তিনি বাড়ী থেকে বেরুতে পেরেছেন, কিন্তু আটটি সন্তানের মায়ের পক্ষে আর একদিন এইভাবে বেড়াতে আসা সম্ভব কি! অগত্যা তিনি প্রধান চেলাকে বললেন,—দেখ বাবা, আমার এই শিবুর হাতটা একটু দেখে দাও। ঠিক করে বলে দাও, ওর বিয়ে হবে কিনা। তারপর দিবাকরের দিকে তাকিয়ে একটু ম্লান হেসে বললেন,—শিবুব সম্বন্ধ এসে টেঁকে না বাবা! কেউ চায় টাকা, কেউ চায় রূপ। মায়ের আমার কোনটাই নাই।

সান্ত্বনার সুরে দিবাকর বলল,—বিয়ে হবে বৈকি মাসীমা, আর আপনার শিবুর টাকা না থাকলেও রূপগুণের অভাব নেই। রূপ বলতে আমরা বুঝি গায়ের কটা চামড়া, কিন্তু প্রকৃত সৌন্দর্য্য স্বাস্থ্য। শিবানীর মত এত চমৎকার স্বাস্থ্য আর কোন মেয়ের আছে বলে আমি তো জানি না। আর গুণের পরিচয় আমি স্বয়ং পাচ্ছি নিত্যসেবায়। সেদিন নতুন পরিচয়ও পেলাম,—ঝগড়া করতেও শিবু বেশ সক্ষম।

পরেশবাবুর স্ত্রী হেসে ফেললেন। বললেন,—তাই নাকি, করেছে নাকি তোমার সঙ্গে ঝগড়া!

উত্তর দেওয়ার আগে দিবাকর আড়চোখে শিবানীর দিকে তাকাল। রুদ্ধক্রোধে তার সারামুখ যেন ফুলে উঠেছে, চোখের কোণে জল টলটল করছে। দিবাকর হঠাৎ নিস্তব্ধ হয়ে গেল।

প্রধান চেলার সম্মুখে হাত বাড়িয়ে দিল শিবানী। প্রায় দশমিনিট

উল্টেপাল্টে দেখে চেলাবাবাজী বললেন,—তুমি এখুন যাও খোকী, তুমার মাকে আমি সব বলবে। হাত সরিয়ে দিবাকরের দিকে একবার উগ্রচোখে তাকিয়ে শিবানী মন্দির থেকে ছুটে বেরিয়ে গেল। পরেশ-বাবুর স্ত্রী দিবাকরকে বললেন,—তুমিও একবার যাও বাবা, কোথায় গেল দেখ। শিবুর রাগকে আমি বড় ভয় করি।

এই রকম একটা সুযোগই বোধ হয় দিবাকর খুঁজছিল, কারণ শিবানীর সঙ্গে সন্ধি করা তারও প্রয়োজন।

শিবানীকে সে আবিষ্কার করল,—মন্দিরের পিছনে একটা ঝাঁকাল বটগাছের নীচে। গাছের গোড়ায় বসে দুহাতে চোখ ঢেকে ফুলে ফুলে কাঁদছে শিবানী। তার খোঁপা খুলে চুলগুলি এলিয়ে দিয়েছে পিঠের উপর, কাপড়টা কাঁধের উপর থেকে সরে গেছে, হাতের কাঁচের চুঁড়ি ভেঙ্গে ছড়িয়ে দিয়েছে গাছের গোড়ায়। ঘন পাতার আড়ালে সূর্য্যালোক চাপা পড়ায় সে স্থানটা দিনের বেলায়ও খানিকটা অন্ধকারাচ্ছন্নথাকে। আশেপাশে অনেকটা জায়গা জুড়ে খালি বন, চারিধারে জনপ্রাণীর চিহ্ন মাত্র নাই।

শিবানীর অবস্থা দেখে দিবাকর ভীত হল। একবার ভাবল,—মাসীমাকে ডেকে আনি। কিন্তু পরক্ষণেই সাহস সঞ্চয় করে সে শিবানীর সম্মুখে এগিয়ে গেল। তার পায়ের শব্দে সচকিত হয়ে শিবানী তাড়াতাড়ি গায়ে কাপড়টা জড়িয়ে চোখ তুলে তাকাল। তারপর দিবাকরের উপর রুখে উঠল,—কেন এলেন এখানে আপনি? লজ্জা করে না আপনার আমাকে দেখতে!

দিবাকর বলল,—আমাকে মাপ করো শিবানী, তুমি মন্দির থেকে ওভাবে চলে এলে দেখে, আমি সত্যিই ভারী ভয় পেয়েছিলাম।

—কেন আপনি মাকে বলতে গেলেন আমি ঝগড়াটে? ওঃ, ভারী খারাপ কথা বলেছি! বিলেত থেকে ডাক্তারী পাশ করে এসে পাড়াগাঁয়ে মাষ্টার হবেন!

শিবানীর বলার ভঙ্গী দেখে দিবাকর হেসে ফেলল। দিবাকরের হাসিতে ফল কিন্তু আরও খারাপ হল, শিবানী ঝরঝর করে কেঁদে ফেলল। কাঁদতে কাঁদতে বলল,—আপনি যান, এখুনি চলে যান এখান থেকে, আমাকে অপমান করতে আপনি এসেচেন এখানে।

শিবানীর দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে ছিল দিবাকর তার মুখ লাল হয়ে উঠেছে, ঠোঁট কাঁপছে থরথর করে, বুক আবেগে দুলে দুলে উঠছে। একটা সবুজ লতা ঝড়ের বেগে যেন হিন্দোলিত হচ্ছে। চারিদিকে ঝিঁঝির ডাক আর পাখীর অস্পষ্ট কাকলী। অতীত ও ভবিষ্যৎ বিলুপ্ত হয়ে গেল দিবাকরের মন থেকে। বর্ত্তমানে থাকল শুধু সে আর কিশোরী শিবানী।

দিবাকর যখন ভালমন্দ চিন্তা করবার ক্ষমতা ফিরে পেল, শিবানী তখনও তার দৃঢ় আলিঙ্গনে আবদ্ধ।

জাগরণী ক্লাবের প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে সুশান্তর কলকাতার অভিজাত মহলে প্রায় সর্ব্বত্রই অবাধ যাতায়াত ছিল। কাজেই একদিন যখন সে রেণুর মামারবাড়ী টালিগঞ্জে উপস্থিত হল, তখন বিশেষ বিস্ময় কেউ প্রকাশ করল না। রেণুর বড়মামা শিবেনবাবুর সে পূর্ব্ব পরিচিত। শিবেনবাবু বিরাট বড়লোক,—কলকাতায় চারখানা বাড়ী, দার্জ্জিলিংএ একখানা, শিলংএ দুখানা। তাছাড়া উড়িষ্যায় জমিদারীও আছে। জাগরণী ক্লাবের ঠিক মেম্বার তিনি নন, তবে ক্লাবের প্রতি তাঁর সহানুভূতির অভাব নেই। চাঁদার খাতা এনে সুশান্ত কখনও ফিরে যায় নি।

দারোয়ানের কাছে খবর নিয়ে সুশান্ত সোজা শিবেনবাবুর বৈঠকখানায় প্রবেশ করল। শীতকালের সন্ধ্যা, কিন্তু শিবেনবাবু মাথার উপর ফ্যান খুলে দিয়ে একটা আদ্দির পাঞ্জাবী গায়ে দিয়ে বসেছিলেন। সামনের

টেবিলে কয়েকখানি সচিত্র বিলাতী মাসিক পত্রিকা, টেবিলের নীচে শিবেনবাবুর প্রিয় সারমেয় বিলি কুণ্ডলাকারে সুপ্ত।

সুশান্তকে দেখে শিবেনবাবুর মুখের ভাব প্রসন্ন হয়ে উঠল। বললেন, বহুকাল দেখা দাও নি কেন হে! আমার আর কোথায়ও বেরোন হয় না। বেজায় মোটা হয়ে পড়েছি।

ফ্যানের হাওয়ায় সুশান্তর তখন কাঁপুনি ধরেছে। সে বলল,—পাখাটা আগে বন্ধ করে দি শিবেনদা, তারপর আপনার কথার উত্তর দিচ্ছি।

সুশান্তর কম্পমান অবস্থাদর্শনে শিবেনবাবু দমকা হাসি হেসে উঠলেন। বললেন,—শীত কোথায় হে! এবার শীত আর পড়বে না, জানুয়ারীর মাঝামাঝি হয়ে গেল! যাক্, ফ্যানটা বন্ধ করেই না হয় দাও। এবার নতুন খবর কি বল।

সুশান্ত বলল—আগে বলুন আপনার খবর কি! পুরী থেকে ফিরলেন কবে?

একটু বিস্ময়ের ভান করে শিবেন বলল,—আমার পুরী যাওয়ার খবর কোথায় সংগ্রহ করলে হে,—কাগজের পারসন্তাল কলাম থেকে নাকি?

—আজ্ঞে না, রেণুর কাছ থেকে।

—রেণু! আমার ভাগ্নী! দিদির মেয়ে! তার সঙ্গে তোমার আলাপ হল কোথায়?

আলাপ হয়ে গেল একদিন পথেঘাটে। আমাদের ব্যাপার জানেন তো? ভবঘুরে জীবন। তারপর রেণু সেদিন ক্লাবের প্রতিষ্ঠাদিবসে গান গেয়ে খুব নাম করেছে। আমাদের সুন্দরলালবাবু তো রেণুর গান শুনে একেবারে আত্মহারা হয়েছেন।

—সে আবার কে হে! তুমি আজ সব ব্যাপারেই আমাকে তাক্ লাগিয়ে দিলে দেখছি।

—ঐ যে সিংহীবাজারে চালের ব্যবসায়ে বিস্তর টাকা করেছে। আগে চেহারা ছিল চামচিকের মত, আজকাল আমাদের সঙ্গে মিশেটিশে একটা মানুষের মত চেহারা হয়েছে। তবে লোকটা আমাদের ক্লাবে টাকা দেয় বিস্তর, আর ক্লাবের কোন অনুষ্ঠানই বাদ দেয় না।

—বহুকাল যাওয়া হয়ে ওঠেনি জাগরণী ক্লাবে। আর ঘুমিয়েই কাটিয়ে দিলাম জীবন, জাগরণের সাড়া আর পেলাম কই! এক এক সময় ভাবি, তোমাদের জীবন বেশ কাটিয়ে দিলে। জেলে নিজে গান গাইতে, আজকাল গায়িকা সংগ্রহে মন দিয়েছ। রেণুর সঙ্গে তাহলে—

শিবেনবাবু কথা শেষ করবার অবসর পেলেন না। সস্ত্রীক ও সকন্যা মুকুন্দ রায় ঘরে প্রবেশ করলেন। ঘরে দ্বিতীয় ব্যক্তির উপস্থিতি লক্ষ্য না করে বললেন,—চল হে শিবেন্দ্র, হোটেলটা আজ একবার শেষ দেখা দেখে আসি।

শিবেনবাবু বললেন—তার আগে আপনায় সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই রায় মশায়। ইনি হলেন, সুশান্ত—তোমার উপাধিটা কি হে!—হ্যাঁ হ্যাঁ মনে পড়েছে কোন, বিখ্যাত জাগরণী ক্লাবের প্রতিষ্ঠাতা। আর ইনি—

বাধা দিয়ে মুকুন্দ রায় বললেন—আর বলতে হবে না। এঁর নাম আমি শুনেছি আগেই, আমাদের রেণুর ইনি বিশেষ পরিচিত।

রেণু বলল,—আজ আর হোটেলে নাই গেলে দাদু। সুশান্তদা এসেছেন যখন, ঘরে বসে অতিথিসৎকার করা যাক। আপনাদের ক্লাবে সম্প্রতি কোন ফাংশন না থাকলে আমি একবার শক্তিপুর ঘুরে আসতে পারি সুশান্তদা।

রায়গিন্নী হঠাৎ চটাস্বরে রেণুকে উদ্দেশ করে বললেন,—না, আজই যেতে হবে সকলকে হোটেলে, দিবাকর হয়ত এসে গেছে। আজ একমাস হল কলকাতায় আছি, ছেলেটার দেখা নেই। বিরাগী টিরাগী হয়ে গেল কিনা কে জানে!

দিদিমার ধমকে রেণুর মুখ শক্ত হয়ে গেলে, বোধ হয় এরকম কড়া শোনা তার জীবনে এই প্রথম। শিবেনবাবু পাশে একটা চেয়ারে বসে সে বলল, আজ আমি কিছুতেই যেতে পারব না, তোমরা যাও।

শিবেনবাবু মধ্যস্থ হলেন, বললেন,—আচ্ছা, আপনারা যান, আমি আর রেণু পরে যাচ্ছি।

মোটরে উঠে রায়গিন্নী বললেন,—যাই বল, রেণুর রকম সকম আমার ভাল লাগছে না। সকাল থেকে তোড়জোড় করছে হোটেলে যাবে বলে, আর এখন ওই সুশান্ত ছোঁড়াকে দেখে সব ভুলে গেল।

তিরস্কারের সুরে মুকুন্দ রায় বললেন,—তোমার সব তাতেই সন্দেহ, মনটা একটু আধুনিক কর গিন্নী!

গিন্নী বললেন,—তোমার আধুনিকতার পায়ে গড়করি! আমার একটা কথার উত্তর তুমি দাও, ওই ছোঁড়া হঠাৎ আমাদের বাড়ীতে এসে হাজির হল কেন?

শিবেনের ওরা বন্ধু কিনা। আর তুমি ছোঁড়া বলছ কাকে! সুশান্তর বয়স চল্লিশ বেয়াল্লিশের কম হবে না। যাক্, একটা বিষয়ে কিন্তু আমার একটা ধোঁকা তুমি আজ কাটিয়ে দিলে। আমার ধারণা ছিল, পুরুষরাই মেয়েদের বয়স ধরতে পারে না, কিন্তু এখন দেখছি মেয়েরাও ক্ষেত্র বিশেষে পুরুষের বয়স ভুল করে বসে।

মুকুন্দ রায় গাড়ীর মধ্যেই হো হো করে হাসতে লাগলেন।

গিন্নী বললেন ?—যাক্ বাজে কথা বাদ দাও এখন। কিন্তু দিবাকরের এতদিন কোন খোঁজ-খবর নেই,—আমার কিন্তু ব্যাপারটা ভাল মনে হচ্ছে না। শক্তিপুরে যায়নি তো?

—শক্তিপুর গিয়ে উঠবে কোথায়? আমরা থাকলাম এখানে, আর তোমার দিবাকরকে একমাস ধরে বসে বসে খাওয়াবে এমন লোক শক্তিপুরে আর কে আছে?

—তা না হয় না থাকল, কিন্তু দিবাকর তো গাঁয়ের কোন লোকের সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতিয়ে নিতে পারে। সে যে রকম মিশুক ছেলে শুনেছি।

—ওসব বাজে কথা রেখে দাও। বিলেত একবার ঘুরে এলে আর ওসবের চিহ্নমাত্র থাকে না।

এইরকম কথাবার্ত্তার মাঝখানে তাঁদের গাড়ী এসে থামল একটা সায়েবী হোটেলের সামনে। মুকুন্দ রায় বললেন, তুমি বস, আমি আগে দারোয়ানকে জিজ্ঞেস করে আসি।

মুকুন্দ রায় ফিরলেন উজ্জ্বলমুখে। বললেন, এসে গেছে, আজ সকালে। দেখ তো রেণুটা কি! সঙ্গে এলে দিবাকর কত খুসী হতো।

মোটর থেকে নামতে নামতে রায়গিন্নী বললেন,—তোমার তখন উচিত ছিল, ওই সুশান্ত ছোঁড়াকে কাণ ধরে বের করে দিয়ে রেণুকে হিড়হিড় করে টেনে আনা। এখন বিয়েটা তাড়াতাড়ি হয়ে গেলে বাঁচি!

দিবাকরের ঘর তেতলায়। অফিস থেকে তাকে আগেই খবর দেওয়া হয়েছিল। দিবাকরকে দেখে মুকুন্দ রায় মনে মনে একটু অপ্রতিভ হলেন, কেননা তাঁর ধারণা ছিল সায়েবী স্যুটপরা একজন যুবককে তিনি সন্মুখে দেখবেন। কিন্তু দেখলেন ধূতী পাঞ্জাবী পরা অপূর্ব্ব বাঙ্গালী ধরণের একজন যুবক তাঁদের দিকে হাসিমুখে এগিয়ে আসছে। রায়গিন্নীও এতটা আশা করেন নি। তাঁহারও আশা ছিল কোটপ্যাণ্ট পরা একজন সাহেবই তাঁর নাতজামাই হবে।

প্রথম অভিনন্দনে পর দিবাকর বলল.—রেণু কই! তাকে আনলেন না?

মুকুন্দ রায় বললেন,—শরীরটা তার আজ ভাল নেই। আসবে বলে তো সকাল থেকে তাড়া দিচ্ছিল, কিন্তু যাবার সময় বলল, মাথা তুলতে পারছে না। যাক্, তুমি তো এখন বড় ডাক্তার হয়েছ, মাথা ধরলে আর ভয় কি!

রায়গিন্নী বললেন,—তোমার সঙ্গে কিন্তু আমাদের মস্ত একটা ঝগড়া আছে দিবু। এখানে তুমি এলে বিলেত থেকে, শক্তিপুরে আমরা খবরও পেলাম, তারপর এসে দেখি তুমি নেই। এই একমাস ধরে কলকাতায় বসে, শুধু টালিগঞ্জ থেকে তোমার এই হোটেলে যাতায়াত করছি। অনেক দিন রেণু একা এসে পর্যন্ত খোঁজ করে গেছে।

দিবাকর বলল,—আমি তো শক্তিপুরেই ছিলাম দিদিমা!

অন্ধকার থেকে হঠাৎ আলোকের মধ্যে এলে মানুষ যেমন দিশেহারা হয়ে যায়, দিবাকরের কথায় কর্তাগিন্নীর অবস্থা সেই রকম হল। তাঁরা ঠিক করেছিলেন,— দিবাকর হয়তো পাহাড়ে গেছে হাওয়া খেতে, বিলেত থেকে ফিরে কলকাতায় গরম তার সহ্য হচ্ছে না। কিন্তু সে যে শক্তিপুরের মত জায়গায় এক মাস বসে থাকবে, এ ধারণা তাঁরা করতে পারেননি।

কাষ্ঠ হাসি হেসে মুকুন্দরায় বললেন,—তা বেশ, বেশ! জন্মভূমি, তার প্রতি মায়া তো একটা থাকবেই। তা ওখানে ছিলে কোথায়? আমাদের বাড়ী তো তালাবন্ধ।

দিবাকর বলল,—শক্তিপুরে অতিথি রাখবার মত লোক এখনও আছে দাদামশায়! আপনাদের ষ্টেশনমাষ্টার, পরেশবাবু, তাঁর ওখানেই আমি ছিলাম।

রায়গিন্নী গালে হাত দিয়ে বল্লেন,—এ্যাঁ, পরেশমাষ্টার, তোমার মত বিলেতফেরত লোককে তার অতিথি রাখবার সখ হয়েছে। ডাঁটাচচ্চড়ি আর কলায়ের ডাল তোমার তাহলে খুব ভাল লেগেছে দিবু?

কথার মোড় ফিরিয়ে দিবাকর বলল,—আপনাদের গ্রামটি আমার কিন্তু খুব ভাল লেগেছে দিদিমা। ছোট্টখাট্ট গ্রামটি, দূরে পাহাড় দেখা যায়। চারদিকে কলিয়ারী। ষ্টেশনটিও ভারী সুন্দর, ছোট হলেও ওরি মধ্যে একটা সৌন্দর্য্য আছে।

রায়গিন্নী বললেন,—পরেশের বাড়ী তো ঘোড়ার আস্তাবল। তোমাকে শুতে দিল কোথায় ? ষ্টেশনের ঘরে বোধ হয়।

—উঁহুঁ, পরেশবাবু সেদিকে ভারী হুঁসিয়ার লোক! থাকতাম তাঁর কোয়াটার্সেরই একটি ঘরে।

—ঘর তো মোটে দুটি এদের। তুমি থাকতে একটিতে, আর একটিতে আট-আটটি ছেলেমেয়ে নিয়ে কত্তাগিন্নী। হ্যাঁ, স্বীকার করছি ক্ষ্যামতা আছে ওদের।

মুকুন্দ রায় বললেন,—থাক্ ওসব বাজে কথা। তারপর শক্তিপুরে আর কি দেখলে বল। হাতীগাঁ গিছলে নাকি ?

দিবাকর সোৎসাহে শক্তিপুরের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করতে সুরু করে দিল। ইস্কুলের কথা, সন্তোষের কথা, হেড্‌মাষ্টারের বক্তৃতা, ইত্যাদি। শুধু চেপে গেল শিবমন্দিরের কাহিনী। পরেশবাবুর ছেলেমেয়েদের গল্প করল, নির্ব্বাক থাকল শিবানীর বেলায়। পরিশেষে বলল,—হাতীগাঁ যাইনি, কিন্তু অশোকবাবুর কথা অনেক শুনেছি, বেশ কাজ তিনি সেখানে করছেন। হাই ইস্কুলের মাষ্টার সন্তোষ কিন্তু ভারী রেগে আছে— অশোকের উপর। তাঁর মতে অশোকবাবুরাই দেশের উন্নতির পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছেন।

রায় মশায় বললেন,—গ্রামে কিন্তু সন্তোষের ভারী সুখ্যাতি। ছেলেরা তো বলে এরকম মাষ্টার আর হয় না।

—ছেলেরা তো বলবেই। তাদের পড়াশুনা করতে হয় না সন্তোষের ক্লাসে; বসে বসে মার্কসের বুলি ছাড়ে আর বিকেল হলেই প্রোশেসন করে গাঁয়ের পথে ঘোরে।

রায়গিন্নী বললেন,—বাজে তোমরাই বকচ। আমরা তো শক্তিপুর ফিরে যাচ্ছি দিবু, শুধু রেণু থাকবে এখানে। আমাদের ইচ্ছা এই মাঘ মাসেই তোমাদের বিয়েটা হয়ে যায়।

মুকুন্দ গৃহিণীর কথার প্রতিধ্বনি করলেন। আমারও তাই মত দিবু রমেনের ভারী ইচ্ছে ছিল তোমার হাতে রেণুকে দেওয়ার। তোমরা একটু মেলামেশা কর, দেখবে রেণু গ্রামের মেয়ে হলেও তাকে আমরা বিলেতফেরতের স্ত্রীর মত করেই শিক্ষা দিয়েছি। আমরা যাব পরশু দিন, কাল সকালেই তোমার টালিগঞ্জের বাড়ীতে আসা চাই কিন্তু।

হাতীগাঁয়ে অশোকের পরিচালিত নানাবিধ প্রতিষ্ঠানের মধ্যে একটা নৈশবিদ্যালয় ছিল। খেজুর পাতায় ছাওয়া ছোট একখানি ঘর, চারিদিকে খেজুরপাতারই বেড়া দিয়ে ঘেরা। স্কুলের ছাত্র সংখ্যা দশটি। সকলেই প্রাপ্তবয়স্ক কলিয়ারীতে কাজ করে। শিক্ষকের সংখ্যা একজন, অশোক স্বয়ং।

স্কুলগৃহটি একেবারে খোলা প্রান্তরের মধ্যে, জায়গাটা অনেকদিন থেকে পড়ে আছে। লাল কাঁকুরে মাটি, ফসল হওয়ার সম্ভবনাও নেই। একদিন অশোক হঠাৎ এক চিঠি পেল জমির মালিকের কাছ থেকে, এবং চিঠিতে অশোকের বিরুদ্ধে অনধিকার প্রবেশ ও বলপূর্ব্বক জমি দখলের অভিযোগ ছিল। জমির মালিক হল দিগ্‌নগর কলিয়ারীর প্রভুরা, এবং তাঁদের পক্ষ থেকে স্বাক্ষর করেছে সন্তোষ।

অশোক একটু বিস্মিত হল। সন্তোষ,—শক্তিপুর হাই স্কুলের মাষ্টার সন্তোষের সঙ্গে কলিয়ারীর প্রভুদের কি সম্পর্ক? সন্তোষ কি ওদের কর্ম্মচারী? মার্কসপন্থী সন্তোষের সঙ্গে ধনিকগোষ্ঠীর এই হঠাৎ সম্বন্ধ আবিষ্কারে অশোক রীতিমত চঞ্চল হয়ে উঠল। তাছাড়া তার নৈশ-বিদ্যালয় যে জমিতে অবস্থিত, সেই জমি তো বহুকালের পতিত। ফসল সেখানে কোনদিন হয় না, চারিদিকে শুধু ছোট ছোট কাঁটাগাছের ঝোপ। অশোক অবশ্য জানে যে, শক্তিপুরে সন্তোষের আগমনের পর থেকে তার কাজে সে নানারূপ বাধা পেয়ে আসছে। বহু আয়াসে সে

কলিয়ারীর শ্রমিকদের মাদকদ্রব্য বর্জ্জনের পথে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল, কিন্তু সন্তোষ তার সে চেষ্টা একরকম ব্যর্থ করে দিয়েছে। শ্রমিকদের সে শিক্ষা ও স্বাস্থ্য বিষয়ে কিছু কিছু জ্ঞান বিতরণ আরম্ভ করেছিল, কিন্তু তারা এখন আর সব পরিত্যাগ করে মত্ত হয়েছে ইউনিয়ন নিয়ে। ইউনিয়নের প্রেসিডেণ্ট হয়েছে সন্তোষ, শীঘ্রই একটা বড় রকমের ধর্ম্মঘট হবে। অশোক চেষ্টা করছিল শ্রমিকদের নৈতিক ও মানসিক কল্যাণ সাধন করতে, কিন্তু সন্তোষ তাদের অন্যদিকে মোড় ফিরিয়ে দিল।

অশোকের নৈশবিদ্যালয়ে ছাত্র সংখ্যা হ্রাস হয়ে আট জনে ঠেকেছে। এরা সকলেই তার বিশ্বস্ত পুরাতন অনুচর। আটজনই দিগ্‌নগর কলিয়ারীর শ্রমিক। এদের মধ্যে রুকন পাঁড়ে একটু মাতব্বর গোছের লোক। একদিন সন্ধ্যেবেলা ইস্কুলে এসে সে অশোককে বলল,—স্ট্রাইক নোটিশ হয়ে গেল মাষ্টারবাবু। কাল থেকে মোরা আসতে নারব। ইউনিয়নের হুকুম।

অশোক শান্তভাবে বলল,—ওসব কথা পরে হবে। কালকের পড়া যেটুকু বাকী ছিল, আজ শেষ করা যাক্।

আর একটি ছাত্র রণবীর বলল,—কাল বুদ্ধদেবের কথা বলতে বলতে থেমে গেছলেন মাষ্টারবাবু।

অশোক বলল, হ্যাঁ, শোন। তারপর বুদ্ধদেব তো সংসার ছেড়ে চলে গেলেন। যুবতী স্ত্রী, স্নেহের দুলাল নবজাত পুত্র, রাজ প্রাসাদের ধনরত্ন কিছুই তাঁকে ঠেকিয়ে রাখতে পারল না। (ছাত্রদের মধ্যে ঈষৎ চাঞ্চল্য দেখা দিল) সর্ব্বস্ব ত্যাগ করে তিনি পরিধান করলেন সন্ন্যাসীর বেশ, তারপর ভীষণ এক অরণ্যে প্রবেশ করে ধ্যানে বসলেন। সে কী তপস্যা! মহাসত্যকে আবিষ্কার না করে তিনি ধ্যানভঙ্গ করবেন না। তারপর একদিন সত্যসত্যই তিনি খুঁজে পেলেন জীবনের পরমসত্য,—ভোগের মধ্যে মানুষের মুক্তি নেই, কারণ মানুষ যত পাবে তার চাওয়ার

পরিমাণ তত বেড়ে যাবে। (ছাত্ররা আবার চঞ্চল হয়ে উঠল।) বহু বৎসর পূর্ব্বে বুদ্ধ এই কথা প্রচার করে গেছেন, আর এযুগের মহামানব গান্ধীজীও এই কথারই পুনরাবৃত্তি করছেন।

অশোক চুপ করল। ছাত্রেরা হঠাৎ মিলিত কণ্ঠে প্রশ্ন করল,—মাষ্টারবাবু, আমরা কি ওনাদের মত হতে পারি? ওনারা দেবতা!

উত্তেজিত কণ্ঠে অশোক বলল,—দেবতা নয় রুকন, তোমাদেরই মত মানুষ। চেষ্টা করলে মানুষই দেবতা হয়।

রুকন বলল,—আমাদের বড় অভাব মাষ্টারবাবু! টাকা যা পাই, খেতে পরতেই কুলোয় না। অবিশ্যি আপনকার কথা মত তাড়িফাড়ি আর খাইনে, তবু কাবলীওলাদের কাছে ফি মাসে টাকা কর্জ্জ করতে হয়।

অশোক বলল,—কেন তোমাদের রোজগার তো মন্দ নয়। তুমি তোমার স্ত্রী আর ছেলে, তিনজনে মাসে দুশো টাকা কামাও।

—ওদের কথা আর বলবেন না মাষ্টারবাবু। ধার হয় ওদের জন্যেই। ফি মাসে বৌ-এর টাকা লাগে শাঁকরার দোকানে, আর ছেলেটা বড়বাবু হয়ে গিয়েছে। এই সিদিন ঘড়ি আর সাইকেল কিনল। আরে, তুই কাজ করিস কয়লার খাদে, ঘড়ি আর সাইকেলে তোর দরকার কি! কথা শুনল না, তার ওপর নেশাটেশাও করতে শিখেচে। আপনকার কাছে একবার যেতে বললাম, তা হেসেই উড়িয়ে দিল। তবে আমাদের সন্তোষবাবুর বড় বাধ্য। পড়াশুনাও একটু শিখেচে ও বাবুর কাছে। কত জায়গার নাম জানে, কত সায়েবের কথা বলে।

রুকনের বক্তৃতা শুনে অশোক হেসে ফেলল। বলল,—তোমাদের লেখাপড়া তাহলে কিছুই হচ্ছে না, কি বল হে তোমরা! একটি সায়েবের নামও আমি তোমাদের শিখিয়ে দিতে পারলাম না। আর জায়গার মধ্যে শুধু চিনিয়ে দিলাম এই শক্তিপুর, হাতীগাঁ আর দিগ্‌নগর

রুকন লজ্জিতভাবে বলল,—আপনার ঋণ আমরা শুধতে পারব না মাষ্টারবাবু। এই দেখুন, মেয়েটা চিঠি লেখে শ্বশুরবাড়ী থেকে, আপনার দৌলতে আমি সব পড়ে যেতে পারি। কয়লাখাদের মালিকরা টাকা দেয়, হিসেব দেখে সই করি। বিরাজবাবু সেদিন ঠাট্টা করে বললেন,—তোকে আমরা এবার কেরাণীবাবুর কাজ দেব, লেখাপড়া শিখে লায়েক হইচিস তোরা! যাক্ বাবু, আমরা ওসব সন্তোষ বাবুটাবু বুঝিনে, তোমার এ ইস্কুল যদি ওরা তুলে দেয়, আমরা একবার দেখে নেব। নিজের ছেলেকেও মানব না। তুমি একটু সাবধানে চলাফেরা কোরো, সন্তোষ-বাবুর ভারী রাগ তোমার ওপর।

অশোক কি একটা বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু রণবীর তাকে বাধা দিয়ে বলল,—আমি আরও বলতে পারি মাষ্টারবাবু সন্তোষবাবুর সঙ্গে বড় মালিক বিরাজবাবুর ভারী ভাব। বিরাজবাবু প্রথমদিকটা তোমার উপর খুসীই ছিল, তোমার কত সুখ্যেতি করত আমাদের কাছে, কিন্তু সন্তোষ বাবু এসে ওর মন ভাঙ্গিয়ে দিয়েছে। সান্তাষবাবু নইলে বিরাজবাবুর এখন একদণ্ড চলে না। শুনতে পাই একশটি করে টাকা এই বাবুকে দেওয়া হয় কলিয়ারী থেকে। রুকনদার সঙ্গে আমিও একমত মাষ্টার-বাবু, ইস্কুল যদি ওরা ভেঙ্গে দেয় আমি কিন্তু সহ্য করব না।

ব্যস্তভাবে অশোক বলল,—ওরা না ভেঙ্গে দিলেও, আমি ভেঙ্গে দেব। অন্যায় আমারই, জমির মালিকদের একটা অনুমতি আমার নেওয়া উচিত ছিল। অবশ্য ইস্কুল একবারে উঠে যাবে না, তবে অন্য জায়গায় সরাতে হবে।

অশোকের দৃঢ় কণ্ঠস্বর শুনে রুকনরা আর কিছু বলতে সাহস করল না, তারা ধীরে ধীরে প্রস্থান করল লেবার কলোনীর দিকে।

বিদ্যালয়গৃহের মেঝের উপর অনেকক্ষণ নিস্তব্ধ হয়ে বসে থাকল অশোক। চারিদিকে ঘন অন্ধকার ছাড়া আর কিছু সে অনুভব করতে

পারছিল না। হঠাৎ এক ঝলক ঠাণ্ডা হাওয়া গায়ে লাগতে তার চমক ভাঙ্গল। খোলা দরজা দিয়ে অন্ধকার যেন জমাট হয়ে ঘরে ঢুকছে, চারিদিকে শ্মশানের প্রশান্তি বিরাজ করছে। অশোক দরজার বাইরে এসে দাঁড়াল।

রাত্রির অন্ধকারে মাঠ ভরে রয়েছে। গাছপালার অঙ্গে অঙ্গে অন্ধকার যেন পাক খেয়ে জড়িয়ে আছে। দিগ্‌নগর লেবার কলোনীর সাদা বাড়ী-গুলি দেখাচ্ছে গোরস্থানের স্মৃতি-সৌধের মত। দূরে লাইনের ধারে এক জায়গায় আগুণ জ্বলছে। অন্ধকারে চক্‌চক্ করছে রেলের লাইন। বোধ হয় সাঁওতাল কুলীর দল শীতের জন্য আগুন জ্বেলে বসে আছে। তাদের মাদলের শব্দে মঝে মাঝে রজনীর নীরবতা ভঙ্গ করছে।

অশোক আকাশের দিকে তাকাল। আকাশময় নক্ষত্রের পাহারা, দিকচক্রবালে আকাশ ও পৃথিবীর অন্ধকার মিশে একাকার হয়ে গেছে। আত্মগোপন করার উপযুক্ত স্থান, অশোক সেদিক লক্ষ্য করে চলতে আরম্ভ করল।

জ্ঞান হারার মত অশোক পথ চলেছে। অন্ধকারে দিক ঠিক নেই, শুধু তার মনে হচ্ছিল মাঠ ছেড়ে গ্রামের পথে সে নেমেছে, দুধারে সুপ্ত গ্রাম্যকুটীর, জীবনের সমস্ত লক্ষণ যেন পৃথিবী থেকে মুছে গেছে। অশোক কিছু চিন্তা করতে পারছে না। সন্তোষ ও বিরাজবাবু, রুকন আর রণবীর,—রাত্রির অন্ধকারে সব যেন একাকার হয়ে গেছে।

অকস্মাৎ একটা উজ্জ্বল আলোক চোখে পড়তে অশোক থমকে দাঁড়াল। তাকিয়ে দেখল সে শক্তিপুরে বড় রায়বাড়ীর সম্মুখে দাঁড়িয়ে, আর দোতলার একখানি ঘর থেকে অনেকখানি উজ্জ্বল আলো এসে পথটা আলোকিত করেছে। অশোক স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়াল। তার মনের অতি সংগোপন ইচ্ছা যেন এই বাড়ীর অন্দরে শান্তির আশ্রয় অন্বেষণ করে বেড়াচ্ছে।

লজ্জিত হয়ে অশোক আলোকিত ঘরটার দিকে তাকাল। দেওয়ালে কার ছায়া স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। ছায়ামূর্ত্তিকেও অশোকের চিনবার ভুল হল না। রেণু ফিরে এসেছে, শয্যায় আশ্রয় নেওয়ার পূর্ব্বে বোধ হয় একবার আয়নার সামনে দাঁড়িয়েছে। একটা গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে অশোক সেদিকে তাকিয়ে থাকল।

জানালায় এসে দাঁড়িয়েছে রেণু। অনেকদিন পরে অশোক তাকে দেখল। কী সুন্দর দেখতে হয়েছে রেণুকে। শহরের আবহাওয়াতেই যেন এ মেয়েকে ভাল মানায়। গ্রামের রুক্ষতায় রেণু ম্লান হয়ে যাবে। কিন্তু রেণু কবে শক্তিপুরে এল! এই তো দুদিন আগে মুকুন্দরায়ের সঙ্গে তার দেখা হয়েছে, রায়মশায় বলেছেন রেণু এখন কলকাতায় থাকবে। হঠাৎ মতপরিবর্ত্তনের কারণ কি।

তৃষিতের মত অশোক দেখছে রেণুকে। কী একটা অপূর্ব্ব মাদকতা রেণুর মুখে, তার বেণী হাওয়ায় দুলছে। রায় বাড়ীতে ঢং ঢং করে ঘড়ি বাজার সঙ্গে অশোক চমকে উঠল। নটা বাজল, রাত তাহলে বেশী হয়নি। কিন্তু সে একী করছে! অন্যের ভাবী পত্নীর প্রতি তার এই মোহ কেন? এই চুরি করে দেখা, ও অন্ধকারে চুপি চুপি দাঁড়িয়ে থাকা অশোকের সভ্য মনকে যেন ধিক্কার দিতে লাগল। জানালায় রেণুকে আর দেখা যাচ্ছে না, অশোক হাতীগাঁর পথে ফিরে চলল।

শক্তিপুর থেকে হাতীগাঁ যওয়ার সোজা রাস্তা হল রেলের লাইন। অশোক গ্রামের পথ ছেড়ে রেলের পথ ধরল। তখন অনেকটা শান্ত হয়ে পথ চলছে সে। সন্তোষ, বিরাজবাবুদের সম্বন্ধে ধীরভাবে চিন্তা করবার ক্ষমতা যেন ফিরে আসছে। কে একজন সাহেবী পোষাকপরা ভদ্রলোক তার পাশ দিয়ে চলে গেল হন্‌হন্‌ করে। অশোক চিনতে পারল,—বড় রায়বাড়ীর ভাবী জামাই। এতক্ষণে রেণুর শক্তিপুর আসার রহস্য তার

পরিষ্কার হয়ে গেল। কর্তাগিন্নী আগে এসেছেন, পরে এসেছে ওরা দুজনে।

রেললাইন ধরে অশোক এগিয়ে চলল। ষ্টেশন ঘর দেখা যাচ্ছে। সীতারাম ও পঞ্চুলাল একটা কোরাস গান ধরেছে, শীতের হাওয়ায় তাদের গানের সুর কেঁপে কেঁপে ভেসে বেড়াচ্ছে। ষ্টেশনমাষ্টারের ঘরে এখনও আলো জ্বলছে, বোধহয় পরেশবাবু এখনও কাজ করছেন। পরেশবাবুর সঙ্গে সৌহার্দ্দ্য থাকলেও অশোক আর তাঁর সঙ্গে আলাপ করবার জন্য অপেক্ষা করল না। সে এগিয়ে চলল! হাতীগাঁ এখনও অনেক দূর!

এর পরেই ষ্টেশনমাষ্টারের কোয়াটার্স, তার থেকে একটু দূরে সিগন্যাল। লাল একটা চোখ যেন অন্ধকারের মধ্যে দপ্‌দপ্‌ করছে। কিন্তু কী প্রচণ্ড শীত! চাদরটা বেশ করে গায়ে জড়াবার জন্য অশোক লাইনের ধারে একটু দাঁড়াল। আবার চলবার জন্য সে পা বাড়িয়েছে, এমন সময় কী একটা শব্দে সে চমকে উঠল! কাছাকাছি কোথায় যেন একটা চাপা কান্নার শব্দ!

ব্যাপারটা বড় অদ্ভুত মনে হল অশোকের। এই অসময়ে লাইনের ধারে পড়ে কাঁদবে কে! কোন লোক ট্রেণে আহত হয়ে পড়ে নেই তো? সে আবার কাণ খাড়া করে দাঁড়াল। গলার স্বর কিন্তু পুরুষের নয়, মেয়েলি গলায় কে যেন ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। কান্নার স্বর লক্ষ্য করে অশোক অগ্রসর হল।

সিগন্যাল থেকে হাত দশেক দূরে একটা ঘনপত্র গাছের নীচ থেকে কান্নার স্বর ভেসে আসছে। প্রায় কাছাকাছি এসে অশোক চিনতে পারল। পরেশবাবুর মেয়ে শিবানী, গাছের গোড়ায় বসে ফুলে ফুলে কাঁদছে। অশোকের পায়ের শব্দে শিবানী চমকে দাঁড়াল, তারপর মুহূর্ত্তমাত্র অপেক্ষা না করে বাড়ীর দিকে ছুটে পালাল। বিস্মিত

অশোক আবার পথ চলতে সুরু করল। হাতীগাঁর পথ এখনও চার মাইল।

বড় রায়বাড়ীর কর্তাগিন্নী কলকাতা থেকে ফিরে আসার পরদিনই পরেশবাবুর কোয়ার্টার্সে এসে হাজির হলেন। এহেন অতিথির শুভাগমনে পরেশবাবু ও তাঁর স্ত্রী বিশেষ ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠলেন। ছেলেমেয়েরাও সন্ত্রস্ত হয়ে উঠল। পরেশবাবুর স্ত্রী অবশ্য দু'একদিন বড় রায়বাড়ী ঘুরে এসেছেন, কিন্তু সে বাড়ীর লোকেদের ষ্টেশনের কোয়ার্টার্সে পদার্পন এই প্রথম।

মুকুন্দ রায়কে পরেশবাবু বসালেন ষ্টেশন থেকে সরকারী চেয়ারখানা আনিয়ে, আর শিবানী তার নিজের হাতে তৈরী পদ্মআঁকা আসন এনে বসতে দিল গিন্নীকে।

রায়গিন্নী তো পরেশবাবুর স্ত্রীকে একেবারে জড়িয়ে ধরলেন, বললেন—আমার মান রক্ষে করেছ ভাই, তোমাদের প্রশংসা দিবুর মুখে ধরে না।

পরেশবাবুর স্ত্রী সত্যিই অবাক হয়ে গেলেন, বললেন,—আমি তো কিছুই বুঝতে পারছিনে দিদি, দিবু কে?

—ওমা! এতদিন ছিল তোমাদের এখেনে, প্রায় মাসখানেক। দিবু হল গে দিবাকর, বিলেতফেরত ডাক্তার। তোমার সুখ্যেতি তার আর ফুরোয় না।

মুকুন্দ রায় বললেন,—সত্যি হে পরেশ, তোমরা না থাকলে দিবুকে ভারী মুস্কিলে পড়তে হত।

পরেশবাবু বললেন,—আমরা আর কি করতে পেরেছি রায়মশায়। হঠাৎ এসে পড়লেন তিনি, জানাশোনা কেউ নেই, আমার স্ত্রী বললেন,—থাকুক এখানেই। ভারী সুন্দর স্বভাব দিবাকরবাবুর। অতবড় বিলেতফেরত ডাক্তার, দেমাক একটুও নেই।

কথাটা মুকুন্দ রায়ের বিশেষ মনঃপুত হল না। তিনি বললেন,—তোমাদের কাছে আর কি দেমাক দেখাবে বল। দিবুর দেমাক দেখতে চাও তো কলকাতায় চল। সায়েবপাড়ার হোটেলে থাকে, দেখা করতে গেলে কত কাঠখড় পোড়াতে হয় তা তোমার ধারণাই নেই।

মুকুন্দ রায়ের কথায় পরেশবাবু অপ্রতিভের মত হাসতে লাগলেন।

রায়গিন্নী উঠে দাঁড়িয়ে বললেন,—যাক্, রেণুর বিয়ে হলগে এই ফাল্গুনের পাঁচুই,—মাঘ মাসের আজ হল বিশে। বিয়ে কলকাতাতেই হবে, তোমাদের ভাই যেতে হবে কিন্তু। রেলভাড়া তো আর লাগে না তোমাদের, আর আমাদের বাড়ীতে একদিন থেকে চলে আসবে। থাক্ থাক্, আর পেন্নাম করতে হবে না। এইটি বুঝি বড়মেয়ে শিবু! এই এক মাসে শিবুর চেহারা তো বদলে গেছে ভাই মেয়ের তোমার চেহারার শ্রী বেড়েছে। তা এইবার বিয়েটা দাও, বয়স তো আমার রেণুর চেয়ে বেশীই হবে।

পরেশবাবুর স্ত্রী বললেন,—একটা ঠিক করে দিন না দিদি; সম্বন্ধ তো আসে দুএকটা, কিন্তু টাকার অভাবে সব পণ্ড হয়ে যায়। তা রেণুর বিয়ে কোথায় ঠিক হল দিদি।

রায়গিন্নী গালে হাত দিয়ে বললেন,—শোন কথা, রাজ্যিশুধু লোক জানে রেণুর বিয়ে কোথায় হচ্ছে, আর তোমরা জান না! দিবাকর গো দিবাকর! ওর সঙ্গে রেণুর বিয়ে ঠিক হয়ে আছে আজ দশ বছর আর তোমরা জান না!

ঈষৎ রাগতভাবে রায়গিন্নী কর্ত্তাকে নিয়ে প্রস্থান করলেন।

পরেশবাবু বললেন,—বড়লোকের খেয়াল, কখন রাগে আর কখন খোসমেজাজে থাকে, কিছুর ঠিক নেই।

তাঁর স্ত্রী বললেন,—রেণুর বিয়ে তাহলে দিবাকরের সঙ্গেই হল!

—কেন, তুমি কি আশা করেছিলে তোমার মেয়ের সঙ্গে তার বিয়ে

হবে! ওসব আশা ছেড়ে দাও গিন্নী। তোমার বাড়ীতে বড় রায়বাড়ীর জামাই একমাস ছিল দয়া করে এই যথেষ্ট। বিয়ে হয়ে গেলে দিবাকর কি আর তোমাদের চিনতে পারবে মনে কর? রায়বাড়ীর অহঙ্কার এদিকের পাঁচখানা গাঁয়ের লোক জানে।

—আহা, সে যে আমাকে মাসীমা বলে ডাকে। শিবু টুকুকে কত ভালবাসে! সেদিন শিবমন্দিরে শিবু রাগ করে কোথায় চলে গেল, দিবাকর কত কষ্ট করে ওকে খুঁজে নিয়ে এল। দিবাকরের সঙ্গে কত ঝগড়া করেছে তোমার মেয়ে। একএক সময় আমার মনে হত, ওদের বিয়ে হলে দুজনেই সুখী হবে।

পরেশবাবু হো হো করে হেসে উঠলেন, বললেন,—একেই বলে ছেঁড়া কাঁথায় শুয়ে লাখটাকার স্বপন! যাক্, শিবুকে ডাক, একটা পানটান দিক, বিকেলের প্যাসেঞ্জার আসবার সময় হল। শিবুর বিয়ের জন্যে ভেবোনা তুমি। এই সামনের মাসে দিনকতক ছুটি নিয়ে বেরুব একবার!

—কিন্তু শিবমন্দিরে সাধু কি বলেছে জান? শিবুর হাতে নাকি বিয়ের রেখা নেই।

—গাঁজা খেলে বুদ্ধি ঐ রকমই হয়। মেয়েমানুষের বিয়ে রেখা না থাকলেও হয়! কই, শিবু একটা পানটান দিবি না?

মেজমেয়ে মিনু পান নিয়ে এসে বলল, দিদির বড্ড মাথা ধরেছে বাবা, শুয়ে আছে।

—টুকু কোথায় রে!

—দাদা বেরিয়ে গেছে বাবা, কোথায় মিটিং আছে।

—মিটিং মিটিং করেই হতভাগা ছেলেটা উচ্ছন্নে গেল। পড়াশুনার বালাই নেই, খালি মিটিং আর মিটিং। শক্তিপুরে এসব কস্মিনকালে ছিল না কিন্তু ঐ সন্তোষ মাষ্টার এসে ছেলেগুলোর মাথা খেলে। পাশ এবার ও করতে পারবে না গিন্নী, এ আমি ঠিক বলে দিচ্ছি। সেদিন

আমাকে এসে বলে কিনা, সন্তোষবাবু বলেছেন কি একটা সমিতি তিনি করেছেন, একটাকা চাঁদা দিতে হবে সেখানে। পঞ্চু বলছিল, গাঁয়ে জোর গুজব সন্তোষ মাষ্টার নাকি হেড্মাষ্টারকে সরিয়ে নিজে হেড্মাষ্টার হওয়ার তালে আছে।

পরেশবাবুর স্ত্রী বললেন,—থাক্ টুকুকে তুমি বেশী বকাঝকা কোরো না। ও বলছিল, পাশ ও ঠিক করে যাবে। পরীক্ষার সময় সন্তোষ মাষ্টারই নাকি ওদের নিয়ে শহরে যাবে। মাষ্টার বলেছে,—পাশের জন্য আমি থাকতে তোদের ভাবতে হবে না। তুমি যাই বল, মাষ্টার ওদের নাচিয়ে বেড়ায় বটে, কিন্তু উপকারও করে।

বাইরে পঞ্চুর ডাক্ শোনা গেল,—ম্যাষ্টার মোশায়, গাড়ীর সময় হয়ে গেল!

পরেশবাবু আরও কি একটা বলতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু পঞ্চুর ডাকে থেমে গেলেন ও রেলের কোটটি গায়ে দিয়ে প্রস্থান করলেন। বাপের সঙ্গে মিনুও ছুটে ষ্টেশনে গেল, ট্রেণ দেখতে তার ভারী ভাল লাগে।

পরেশবাবুর স্ত্রী শোবার ঘরে ঢুকে দেখলেন, শিবানী বালিশে মুখ গুঁজে পড়ে আছে। বললেন,—শুয়ে কেন রে? মিনু বলছিল, মাথা ধরেছে নাকি তোর?

শিবানী উত্তর দিল না, বালিশে মুখ গুঁজে তেমনি পড়ে রইল। পরেশবাবুর স্ত্রী পিঠে হাত দিয়ে বললেন,—না, গা তো ভাল। উঠে চোখমুখ ধুয়ে একটু বাইরে বোস, শীতের দিনে অবেলায় শুয়ে থাকলে আরও বেশী মাথা ধরবে

মার কথায় শিবানী উঠে বসল। তার সারা মুখ লাল্‌চে, কেশপাশ অবিন্যস্ত, চোখের জল গালে শুকিয়ে আছে। সর্ব্বহারা ভিখারিণীর চেহারা! মেয়ের দিকে তাকিয়ে পরেশবাবুর স্ত্রী শিউরে উঠলেন কি এক অজ্ঞাত আশঙ্কায়। চারিদিকে তাকিয়ে শিবানীর

কাণে কাণে কি একটা কথা জিজ্ঞাসা করলেন। শিবানী নতমুখে উত্তর দিতে গিয়ে ঝরঝর করে কেঁদে ফেলল।

একটা রহস্য যেন এতদিন পরিষ্কার হয়ে গেল। কিছুদিন ধরে শিবানীর আহারে অরুচি ও খাওয়ার পরই বমনেচ্ছা পরেশবাবুর স্ত্রীকে মেয়ের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে যথেষ্ট উদ্বিগ্ন করে তুলেছিল। আজ যেন সকল অঙ্কের যবনিকাপাত হল। শিবানী অন্তঃসত্ত্বা!

দুজনেই নিস্তব্ধ। বাইরে শোনা যাচ্ছে ছেলেমেয়েদের ক্রীড়ামুখর কলরব। হঠাৎ তাদের স্বর ছাপিয়ে মিনুর কণ্ঠস্বর বেজে উঠল,—মা, দিদি, দিবাকরদা আজকের গাড়ীতে এলেন। একা আসেন নি কিন্তু, সঙ্গে আছে বড় রায়বাড়ীর মেয়ে রেণুদি।

শিবানী আবার বালিশে মুখ গুঁজে শুয়ে পড়ল।

দিবাকরের শক্তিপুরে প্রত্যাবর্ত্তন আকস্মিক হলেও, সংবাদে পরেশবাবুরা অনেকটা নিশ্চিন্ত হলেন। শিবানীকে জেরা করে পরেশবাবুর স্ত্রী দিবাকর সম্বন্ধে অনেকটা নিশ্চিন্ত হয়েছেন, এবং মুকুন্দ রায়ের স্ত্রীর কথা মনেরাখা তিনি কর্ত্তব্য বলে মনে করেন নি। তাঁদের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, এই অবস্থায় দিবাকর শিবানীকে পরিত্যাগ করে রেণুকে বিয়ে করতে পারে না।

কিন্তু ব্যাপারটা আগাগোড়া এতই লজ্জাকর যে, পরেশবাবু ও তাঁর স্ত্রী প্রথমটা হতবুদ্ধি হয়ে গেলেন। পরেশবাবুর স্ত্রী কাত্যায়নী সাবেক ধরণের লোক। এবং বিবাহের পূর্ব্বে মেয়েদের অন্তঃসত্ত্বা হওয়া তাঁর কল্পনার বহির্ভূত। তাঁর নিজের বিবাহ হয় আঠার বৎসর বয়সে,—এক বৎসর পরে বড় মেয়ে শিবানীর জন্ম হয়। কুমারী অবস্থায় অবশ্য গ্রামের ছেলেদের সঙ্গে আজকালকার মত অবাধ মেলামেশার সুযোগ ঘটেনি, তাদের সময় বাপমায়ের কড়া শাসন ছিল ছেলেমেয়েদের উপর। মেয়েরা মেলামেশা করত শুধু মেয়েদের সঙ্গে, ছেলেদের সঙ্গী ছিল

আমাকে এসে বলে কিনা, সন্তোষবাবু বলেছেন কি একটা সমিতি তিনি করেছেন, একটাকা চাঁদা দিতে হবে সেখানে। পঞ্চু বলছিল, গাঁয়ে জোর গুজব সন্তোষ মাষ্টার নাকি হেড্‌মাষ্টারকে সরিয়ে নিজে হেড্‌মাষ্টার হওয়ার তালে আছে।

পরেশবাবুর স্ত্রী বললেন,—যাক্ টুবুকে তুমি বেশী বকাঝকা কোরো না। ও বলছিল, পাশ ও ঠিক করে যাবে। পরীক্ষার সময় সন্তোষ মাষ্টারই নাকি ওদের নিয়ে শহরে যাবে। মাষ্টার বলেছে,—পাশের জন্য আমি থাকতে তোদের ভাবতে হবে না। তুমি যাই বল, মাষ্টার ওদের নাচিয়ে বেড়ায় বটে, কিন্তু উপকারও করে।

বাইরে পঞ্চুর ডাক্ শোনা গেল,—ম্যাষ্টার মোশায়, গাড়ীর সময় হয়ে গেল!

পরেশবাবু আরও কি একটা বলতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু পঞ্চুর ডাকে থেমে গেলেন ও রেলের কোটটি গায়ে দিয়ে প্রস্থান করলেন। বাপের সঙ্গে মিনুও ছুটে ষ্টেশনে গেল, ট্রেণ দেখতে তার ভারী ভাল লাগে।

পরেশবাবুর স্ত্রী শোবার ঘরে ঢুকে দেখলেন, শিবানী বালিশে মুখ গুঁজে পড়ে আছে। বললেন,—শুয়ে কেন রে? মিনু বলছিল, মাথা ধরেছে নাকি তোর?

শিবানী উত্তর দিল না, বালিশে মুখ গুঁজে তেমনি পড়ে রইল। পরেশবাবুর স্ত্রী পিঠে হাত দিয়ে বললেন,—না, গা তো ভাল। উঠে চোখমুখ ধুয়ে একটু বাইরে বোস, শীতের দিনে অবেলায় শুয়ে থাকলে আরও বেশী মাথা ধরবে

মার কথায় শিবানী উঠে বসল। তার সারা মুখ লাল্‌চে, কেশপাশ অবিন্যস্ত, চোখের জল গালে শুকিয়ে আছে। সর্ব্বহারা ভিখারিণীর চেহারা! মেয়ের দিকে তাকিয়ে পরেশবাবুর স্ত্রী শিউরে উঠলেন কি এক অজ্ঞাত আশঙ্কায়। চারিদিকে তাকিয়ে শিবানীর

কাণে কাণে কি একটা কথা জিজ্ঞাসা করলেন। শিবানী নতমুখে উত্তর দিতে গিয়ে ঝরঝর করে কেঁদে ফেলল।

একটা রহস্য যেন এতদিন পরিষ্কার হয়ে গেল। কিছুদিন ধরে শিবানীর আহারে অরুচি ও খাওয়ার পরই বমনেচ্ছা পরেশবাবুর স্ত্রীকে মেয়ের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে যথেষ্ট উদ্বিগ্ন করে তুলেছিল। আজ যেন সকল অঙ্কের যবনিকাপাত হল। শিবানী অন্তঃসত্ত্বা!

দুজনেই নিস্তব্ধ। বাইরে শোনা যাচ্ছে ছেলেমেয়েদের ক্রীড়ামুখর কলরব। হঠাৎ তাদের স্বর ছাপিয়ে মিনুর কণ্ঠস্বর বেজে উঠল,—মা, দিদি, দিবাকরদা আজকের গাড়ীতে এলেন। একা আসেন নি কিন্তু, সঙ্গে আছে বড় রায়বাড়ীর মেয়ে রেণুদি।

শিবানী আবার বালিশে মুখ গুঁজে শুয়ে পড়ল।

দিবাকরের শক্তিপুরে প্রত্যাবর্ত্তন আকস্মিক হলেও, সংবাদে পরেশবাবুরা অনেকটা নিশ্চিন্ত হলেন। শিবানীকে জেরা করে পরেশবাবুর স্ত্রী দিবাকর সম্বন্ধে অনেকটা নিশ্চিন্ত হয়েছেন, এবং মুকুন্দ রায়ের স্ত্রীর কথা মনেরাখা তিনি কর্ত্তব্য বলে মনে করেন নি। তাঁদের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, এই অবস্থায় দিবাকর শিবানীকে পরিত্যাগ করে রেণুকে বিয়ে করতে পারে না।

কিন্তু ব্যাপারটা আগাগোড়া এতই লজ্জাকর যে, পরেশবাবু ও তাঁর স্ত্রী প্রথমটা হতবুদ্ধি হয়ে গেলেন। পরেশবাবুর স্ত্রী কাত্যায়নী সাবেক ধরণের লোক। এবং বিবাহের পূর্ব্বে মেয়েদের অন্তঃসত্ত্বা হওয়া তাঁর কল্পনার বহির্ভূত। তাঁর নিজের বিবাহ হয় আঠার বৎসর বয়সে,—এক বৎসর পরে বড় মেয়ে শিবানীর জন্ম হয়। কুমারী অবস্থায় অবশ্য গ্রামের ছেলেদের সঙ্গে আজকালকার মত অবাধ মেলামেশার সুযোগ ঘটেনি, তাদের সময় বাপমায়ের কড়া শাসন ছিল ছেলেমেয়েদের উপর। মেয়েরা মেলামেশা করত শুধু মেয়েদের সঙ্গে, ছেলেদের সঙ্গী ছিল

ছেলেরা। কাত্যায়নীর মনে আছে, একবার তাঁদের এক আত্মীয়ের ছেলে তাঁর সঙ্গে কি একটা রসিকতা করার চেষ্টা করছিল, এবং তার ফলে তাকে তাঁদের বাড়ী থেকে তৎক্ষণাৎ বিদায় নিতে হল। তাই শিবানীর এই অবস্থায় তাঁর মনে হল, এর জন্য শিবানীর বাপমাই দায়ী। অতিথিরূপে দিবাকর তাঁদের বাড়ীতে এসেছিল, কিন্তু অতখানি প্রশ্রয় তাকে দেওয়া উচিত হয় নি। নিজে প্রাচীনপন্থী হয়েও দিবাকরের সঙ্গে তিনি বয়ঃপ্রাপ্ত কন্যাকে মেলামেশার সুযোগ দিলেন কেন?

পরেশবাবু বললেন,—সন্ন্যাসীর হাতদেখা কিন্তু এযাত্রা নিষ্ফল হবে। দিবাকরের সম্বন্ধে আমার নিজের যা ধারণা, তাতে মনে হয় এই মাঘ মাসেই সে শিবানীকে বিয়ে করবে।

কাত্যায়নী একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে বললেন,—কিন্তু যাই বল, এ বিয়ে হলেও সুখের হবে না। স্বামীস্ত্রীর বিয়ের আগে ঘনিষ্ঠ পরিচয় হলে পরে সম্বন্ধের বাঁধন বড় তাড়াতাড়ি আলগা হয়ে যায়।

—ওসব সেকেলে ভাব ছেড়ে দাও। দিবাকরের হাতে মেয়েকে ছেড়ে দেওয়ার পূর্ব্বে এসব চিন্তা করা উচিত ছিল। এখন কর্ত্তব্য ঠিক কর। এই মাসেই যাতে বিয়েটা হয় তার একটা ব্যবস্থা করা দরকার।

—দোষ তুমি শুধু আমারই দেখ। কেন, তোমারও একটা কর্ত্তব্য ছিল না? ছেলেমেয়ে খারাপ হলে বাপ মা সমান দোষী। তোমার চোখের সামনে দিবাকর শিবুকে নিয়ে কতদিন বেড়াতে গেছে, তুমি কোন রকম আপত্তি করনি।

নরমস্বরে পরেশবাবু বললেন,—তর্কবিতর্কে কোন ফল হবে না। দিবাকরকে একবার ডাকা দরকার। টুকু কোথায়?

—সে তো খেয়েদেয়েই বেরিয়ে গেছে। বলে, সন্তোষ মাষ্টার নাকি ওদের পরীক্ষার পড়া তৈরী করিয়ে দিচ্ছে।

পরেশবাবু প্রায় চীৎকারের সুরে বললেন,—এই মাষ্টারটা গাঁয়ের

ছেলেগুলোর মাথা গেল। কোন সময় বাড়ীতে থাকে না, একটা কাজ পাওয়া যায় না। রাতদিন খালি মিটিং প্রোশেশন আর লম্বাচওড়া বুলি। বুড়ো বাপ তোর খেটে মরচে, আর তুই ষোল বছরের ধাড়ী, বসে বসে ভাত গিলচিস্!

পরেশবাবুর কণ্ঠস্বর আরও শক্তি সঞ্চয় করছিল, কাত্যায়নী বাধা দিয়ে বললেন,—থাম তুমি। মেয়ের ব্যাপারটা আগে সামলাও, তারপর ছেলের সম্বন্ধে মাথা ঘামিও।

—নাঃ, তোমরা আমাকে পাগল করে ছাড়বে দেখছি। ডাক শিবুকে, দেখি সে কি বলে।

—তোমার সামনে সে বেরুবে না। আমাকে বলেছে,—বাবার সামনে অমি আর মুখ দেখাতে পারব না মা।

পরেশবাবু দাঁতমুখ খিঁচিয়ে বললেন,—এত লজ্জা তার ছিল কোথায়! যে কাণ্ড করেছে, তার ধাক্কা সামলাতে মাবাপের প্রাণান্ত! ডাকাও তবে একবার দিবাকরকে। মিনুই যাক্।

কাত্যায়নী সম্মতিসূচক কি একটা বলতে যাচ্ছিলেন, মিনুর উৎফুল্ল চীৎকারে চুপ হয়ে গেলেন।

বাইরের উঠোন থেকে মিনু চীৎকার করছে,—দিবাকরদা আসছে মা, একেবারে সায়েব সেজে।

পরেশবাবু ও কাত্যায়নী তাড়াতাড়ী বাইরে গিয়ে দিবাকরকে অভ্যর্থনার জন্য প্রস্তুত হলেন, অন্তঃপুরে একলা ঘরে বসে শিবানী আবেশে বিহ্বল হয়ে উঠল.

সুদীর্ঘ বিরহের পর দয়িতের প্রত্যাবর্ত্তনে নববধূর মত শিবানী প্রস্তুত হল দিবাকরকে সম্ভাবণ করবার জন্য। ক্ষিপ্রহস্তে বেণী রচনা করে ও কাজলের টিপ পরে সে দরজায় কাণ পেতে দাঁড়িয়ে রইল। একবার পিছন ফিরে দেখল দেওয়ালে সংলগ্ন আয়নায় তার ছায়া পড়েছে। মসৃণ

কপালে কাজলের টিপ মানিয়েছে চমৎকার, টিপের উপর দিবাকরের অনুরাগচুম্বন এখনও যেন সরস হয়ে রয়েছে। মাঘ মাসের শীতেও শিবানী ঘর্ম্মাক্ত হয়ে উঠল।

বাইরের ঘরে পরিচিত পায়ের শব্দে ও কথাবার্ত্তার সুর কাণে বাজছে। সকলের কথা একের পর এক জিজ্ঞাসা করছে দিবাকর। টুকু, মিনু,—সকলের শেষে শিবানীর কথা। শিবু কোথায়? আমার সামনে আসতে লজ্জা করছে নাকি? মেয়ের আপনার ভারী লজ্জা মাসীমা! সেই রকম মিষ্টি আছে দিবাকরের কণ্ঠস্বর, কথা বলবার সময় চশমাটা নিশ্চয়ই সেইরকম উঠানামা করছে। সায়েবী পোষাকে নিশ্চয়ই তাকে ভারী সুন্দর মানিয়েছে। শিবানীর কতবার ইচ্ছা হল, দরজা খুলে বাইরে গিয়ে দিবাকরের সম্মুখে একবার দাঁড়ায়, কিন্তু কতবার সে নিজেকে সংযত করল কে জানে। এই সীমাহীন লজ্জা যে কেমন করে তাকে অধিকার করে বসল, শিবানী তা কিছুতেই বুঝতে পারল না।

পরেশবাবুর কথা শোনা গেল। আমি চললাম, প্যাসেঞ্জারের সময় হল, দিবুর সঙ্গে তোমরা কথাবার্ত্তা বল।

শিবানী তাড়াতাড়ি জানালায় এসে দাঁড়াল। তার অনুমান সত্যি হয়েছে। পরেশবাবুর সঙ্গে গল্প করতে করতে দিবাকর ষ্টেশনের দিকে চলেছে। সায়েবী পোষাকে ভারী সুন্দর মানিয়েছে তাকে। রংটা ময়লা না হলে শিবানী তাকে সায়েব বলেই ভ্রম করত। সে অপলকনেত্রে দিবাকরের গতিপথে তাকিয়ে থাকল।

বেলা শেষ হয়ে এল। চারিদিকে বৈকালী ছায়া আর ভ্রমরের গুঞ্জন। পলাশের গাছে ফুল ফুটে অন্তরীক্ষে সৃষ্টি করেছে এক অপূর্ব্ব স্বপ্নজাল। শিবানীর বুকের মধ্যে ধুক ধুক করতে লাগল, মনের তারে তারে বেজে চলল দুর্বোধ্য এক কামনার রাগিণী।

দিবাকর ফিরে আসছে। পরেশবাবু ষ্টেশনের দিকে চলে গেলেন।

শিবানী আজ আর উৎসুক দৃষ্টিরসন্মুখে জানালায় দাঁড়াতে সাহস করল না। দিবাকর উজ্জ্বল চোখে তাকাল শূন্য জানালার দিকে, বোধ হয় পরেশবাবু তাকে সব কথা বলেছেন। শিবাণী দিশাহারা আনন্দে অস্থির হয়ে উঠল।

বাইরে তার মার গলা শোনা যাচ্ছে। দিবাকরকে চুপি চুপি কি বলছেন তিনি। শিবানী বুঝতে পারল, বলতে তাঁর বেশ সঙ্কোচ হচ্ছে। লজ্জায় শিবানী লাল হয়ে উঠল। বক্তব্যের উপসংহারে একটু চড়াগলায় বললেন কাত্যায়নী,—এইবার তোমার কর্ত্তব্য ঠিক কর বাবা

শিবানীর হৃদপিণ্ড যেন দপ্‌দপ্‌ করতে লাগল,—কি উত্তর দেয় দিবাকর! খানিকক্ষণ মৌন থাকার পর দিবাকর বলল,—রেণুর সঙ্গে আমার বিয়ে বিলেতে যাবার আগে থেকে ঠিক হয়ে আছে মাসীমা, সেখানে—

বাধা দিয়ে কাত্যায়ণী বললেন,—কিন্তু বাবা, এখানে যা হয়ে গেছে, তাতে তোমার তো শিবুকেই বিয়ে করা উচিত। তুমি তাকে বিয়ে না করলে, চিরকালের মত তার অনিষ্ট হয়ে যাবে।

শিবানীর সারা গা যেন পুড়ে যাচ্ছে, মুখচোখ দিয়ে আগুনের হলকা বেরিয়ে আসছে। সে দরজায় কাণ পেতে শুনতে লাগল তার ভবিষ্যতের ইতিকথা।

—মাপ করবেন মাসীমা, বিয়ে আমি ওকে করতে পারব না। অবশ্য ওর বিয়ের জন্য দায়ী রইলাম আমি। ছেলে আপনারা ঠিক করুন যত টাকা লাগে আমি দেব।

—এই অবস্থায় ওকে কি আর কেউ বিয়ে করতে চাইবে? ওকে নিয়ে তুমি ঘর করতে রাজী না হও, শুধু সিঁথেয় ওর তোমার নিজের হাতে সিঁদুর দিয়ে চলে যাও। তাহলে লোকের চোখে ও হেয় হবে না। মেয়েমানুষের যে এ সকলের বাড়া লজ্জা দিবাকর!

—রেণুর কাছে আমি বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারব না, মাসীমা! একটা ভুল যদি মানুষ করেই থাকে, তাকে এভাবে প্রায়শ্চিত্ত করানোর কোন অর্থ হয় না।

প্রস্থানোদ্যত দিবাকরকে কাত্যায়নী কাতরস্বরে বললেন,—একটু অপেক্ষা কর, তাকে একবার ডাকি। শিবু! শিবানী! ভিতরের ঘরের দরজা খুলে কাত্যায়নী দেখলেন,—ঘর শূন্য, খিড়কীর দরজাটা খোলা।

বাইরের ঘরে ফিরে এসে কাত্যায়নী বললেন,—এই তো ছিল ঘরে কোথায় গেল! এ ভুল তো সাধারণ ভুল নয়, এ ভুল মানুষের জীবন নিয়ে। তোমার মনুষ্যত্ব থাকে, তুমি ভুল সংশোধন কর, না থাকে রায়মশায়ের নাতনীকে বিয়ে করে সুখী হও।

কাত্যায়নীর গলা শুষ্ক, চোখে একফোঁটা জল নেই। দিবাকর কি রকম একটা অস্বস্তি বোধ করতে লাগল। আর মনে হল নিয়তির মত কাত্যায়নী যেন তাকে পথনির্দেশ করছেন। পরক্ষণেই তার মনে হল কলকাতায় রেণুর মামাবাড়ীর ড্রইংরুমের কথা। একটা কৌচে এই কিছু দিন আগেই সে আর রেণু পাশাপাশি বসেছিল। চারিদিকের রমণীয় আবেষ্টনী, অর্গ্যানের মিষ্টি সুর আর এসেন্স পাউডারের সুগন্ধ। এর সঙ্গে তুলনায় শক্তিপুর ও শিবানী অত্যন্ত নিষ্প্রভ মনে হল। নিঃশব্দে প্রস্থান করল দিবাকর।

সন্ধ্যার অন্ধকারে চারিদিক তখন গাঢ় হয়ে এসেছে। চিন্তামগ্ন দিবাকর ধীরে ধীরে চলতে লাগল। শিবানীর সঙ্গে তার আলাপের পরিণতি এই পর্য্যায়ে দাঁড়াবে, দিবাকর কোনদিন স্বপ্নেও ভাবে নি। বিলেত থেকে ফিরে গ্রামে আসা তার বহুদিনের পরিকল্পিত কামনা, নিজের মনকে সে অন্ততঃ এই বলে সান্ত্বনা দিল যে, বিলেতফেরত হলেও স্বদেশকে সে বিস্মৃত হয় নি। পরেশবাবুর বাড়ীতে অতিথি হওয়াও

তার এই খেয়ালের অন্তর্ভুক্ত। গরীবের বাড়ীতে কিছুদিন বাস করে অন্ততঃ সে বন্ধু মহলে গর্ব্ব করে বলতে পারবে যে, দেশের জনসাধারণের সঙ্গে তার যোগাযোগ আছে। এ পর্য্যন্ত প্ল্যান ভালই চলে এসেছিল। কিন্তু মুস্কিল করে দিল এই এক নূতন পরিস্থিতি। গ্রাম্য পরিবেশের মধ্যে গ্রামের মেয়ে শিবানীকে তার ভালই লেগেছিল, কিন্তু শহরে ফিরে যাওয়ার পর শিবানী একেবারে মুছে গেছে তার মন থেকে। শিবেনবাবুর ড্রইংরুমে শিবাণীকে কল্পনা করা যায় না, তাকে মানায় শক্তিপুরের শিবমন্দিরের পিছনে সেই নির্জ্জন বনচ্ছায়ায়। সুসভ্য নাগরিক জীবনের সঙ্গিনীরূপে শিবানীকে কল্পনা করা যায় না।

রেল লাইনের ধারে ধারে পথ চলছিল দিবাকর। সিগ্‌ন্যালের কাছাকাছি তার গতি রুদ্ধ হয়ে গেল। কে একজন দাঁড়াল তার সামনে পথ আগ্‌লিয়ে। অন্ধকারেও দিবাকর চিনতে পারল তাকে,—সে শিবানী।

চমকে একটু পিছিয়ে গেল দিবাকর।—পথ ছাড় শিবানী!

—আমাকে গ্রহণ না করলে কিছুতেই পথ ছাড়ব না আমি। আমার এতবড় সর্ব্বনাশ করে তুমি চলে যাচ্ছ! রেণুকে বিয়ে করতে হয় কর, কিন্তু তার আগে আমার সিঁথিতে সিঁদূর তোমাকে দিয়ে যেতে হবে।

শিবানীর সবল ও সুদৃঢ় উক্তিতে দিবাকর অবাক হয়ে গেল। কাত্যায়নীও এত জোর দিয়ে কথা বলতে পারেন নি। স্বভাবতঃ মুখচোরা শিবানী হঠাৎ মুখরা হয়ে উঠল কোন্ যাদুমন্ত্রবলে? সে শুধু বলল,—ভাল আছ শিবু! এ প্রশ্ন কেন সে করল তাও বুঝে উঠতে পারল না।

শিবানী আবার বলল,—আমার কথার আগে উত্তর দাও। মার কথা আমিও বলছি, তোমার ঘর আমি করতে চাই নে, কিন্তু সমাজে অচল করে আমাকে রেখে যেও না।

দিবাকর বিস্মিতনেত্রে শুধু তাকে নিরীক্ষণ করছিল। এই সেই শিবানী, তার সন্তান গর্ভে ধারণ করেছে। তার প্রথম অনুরাগের উপহার অঙ্গে সাগ্রহে গ্রহণ করেছে এই শিবানী। অন্ধকারে আজ অদ্ভুত দেখাচ্ছে তাকে। অসংযত শিথিল বেণী, মসৃন কপোলে অশ্রুধারা। কাজলের টিপ মুছে গেছে। দিবাকরের বুক মমতায় ভরে গেল। সে বলল,—তাই হবে শিবু।

—ঠিক করে বলে যাও কবে হবে। রেণুর সঙ্গে তোমার বিয়ে ফাল্গুন মাসে, আমাদের তার আগে হওয়া চাই।

—তাই হবে শিবু, এই মাঘ মাসেই। একবার কলকাতায় গিয়ে দুচার দিনের মধ্যেই ফিরে আসব। আজ আসি, বড় অন্ধকার!

দিবাকরের প্রস্থানের পর শিবানী অনেকক্ষণ সেখানে দাঁড়িয়ে থাকল, তারপর একটা গাছের নীচে বসে ঝরঝর করে আর একবার কেঁদে ফেলল।

সেদিনকার রজনীর অভিযাত্রী অশোক তাকে এই অবস্থায় দেখেছিল।

মুকুন্দরায় গৃহিণীকে বললেন,—তিনখানা চিঠি আছে, সব রেণুর।

রায়গিন্নী বললেন,—এসেছে তো মোটে আট দিন, এর মধ্যে চিঠি এল মেয়ের চব্বিশ খানা।

—তোমাদের সময়ের কথা ছেড়ে দাও। বিয়ের পর তুমি আমাকে একখানিও চিঠি লিখনি।

—আর তুমি বুঝি আমাকে রোজ চিঠি লিখতে।

—বড় লজ্জা করত গিন্নী। রায়মশায় হাসতে লাগলেন।

—তাও তো রেণুর বিয়ে হয় নি। বিয়ে হলে চিঠির স্রোতে মেয়ে ভেসে না যায়।

একখানা বই হাতে করে রেণু ঘরে ঢুকল। চিঠি আছে নাকি দাদু? রেণু মুকুন্দ রায়ের দিকে বামহস্ত প্রসারিত করল।

—সব তোমার, কিন্তু ডান হাত পাততে হবে রেণু। আজকাল অবশ্য বাঁ হাতের ব্যবহারই বেশী হয়েছে, আচারে ব্যবহারে সবাই লেফটিষ্ট হয়ে পড়ছে। মুকুন্দ রায় উচ্চকণ্ঠে হাসতে লাগলেন।

রাগতভাবে রেণু বলল,—ডানহাত বাঁহাত বুঝিনে বাপু। আমার চিঠি আছে, দাও। শহরে দেখি সুশিক্ষিত ও সুমার্জ্জিত লোকেরাও বাঁহাতের ব্যবহার বেশী করে। সিগারেট খায় বাঁহাতে, হোটেলে চপ্‌কাট্‌লেটও খায় বাঁহাতে। তোমাদের তুলনায় তারা অনেক বেশী সভ্য।

রায়গিন্নী বললেন,—তুই বড় যা তা বলিস্ রেণু। দুই হাতের কাজ যদি সমান হত, ভগবান তাহলে একটা হাত সৃষ্টি করেই সন্তুষ্ট থাকতেন। যাক্ ওসব বাজে কথা। দিবু আজ সকালে চলে গেল যে? কলকাতায় তো সব একসঙ্গেই ফেরার কথা ছিল।

—আমি অত পারব না বাপু। তোমরা থাক তোমাদের দিবুকে নিয়ে, আমার চিঠি আমাকে দাও।

রেণু চিঠি নিয়ে একেবারে নিজের ঘরে উপস্থিত হল। তিনখানিই খামের চিঠি। একখানির মাত্র ঠিকানা অপরিচিত হস্তে লিখিত, আর দুখানি পরিচিত বন্ধুদের লেখা। শক্তিপুরে আসার পর অপরিচিত হাতে লেখা আটখানি চিঠি রেণু পেয়েছে। প্রথমখানি আসে সুশান্তর কাছ থেকে, তারপর তার গুণমুগ্ধ ভক্তদের কাছ থেকে। এর মধ্যে সুশান্তর চিঠি রেণুর সবচেয়ে ভাল লেগেছিল। লেখার কি সুন্দর ষ্টাইল! সুশান্ত নিশ্চয়ই কবিতা লেখে, চিঠি লিখেছে যেন গানের সুরে! তারপর আর চিঠি রোজ একটা করে পেয়েছে রেণু,—ক্রমশঃ চিঠির সুর গেছে পালটে। বন্ধু সুশান্ত এসে দাঁড়িয়েছে প্রেমিকের পর্য্যায়ে।

আজ এই অচেনা হাতের চিঠিখানা দেখে রেণু কৌতূহলে উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠল। তাড়াতাড়ি খাম ছিঁড়ে চিঠির নীচে দৃষ্টি গেল তার। চিঠি লিখেছে সুন্দরলাল। সুন্দরলালকে রেণু ভোলে নি। জাগরণী ক্লাবের প্রতিষ্ঠাদিবসে সবচেয়ে ভাল মোটরগাড়ী চড়ে যে ভদ্রলোক এসেছিলেন। সুন্দরলাল লিখেছে,—বহু কোস্টে আপনার ঠিকানা যোগাড় করলাম সুশান্তবাবুর কাছ থেকে। আমাদের একটা উৎসব হোবে সীগগীর। আপনি আসুন। আপনার গান না হলে চোলবে না। চিঠির নীচে অনেক কষ্টে ইংরাজীতে নাম স্বাক্ষর করেছে সুন্দরলাল।

এই চিঠি পেয়ে খুশী হয়ে রেণু আর দুখানা চিঠি খুলল। একখানা লিখেছে তার মামাতো বোন মালিনী আর একখানি সুশান্ত। সুশান্তর চিঠিতেও সুন্দরলালের অনুরূপ উক্তি,—তুমি এস। আমাদের বসন্ত উৎসব এগিয়ে আসচে, কিন্তু বসন্তের রাণী শক্তিপুরে নির্ব্বাসিত। মালিনী লিখেছে,—তোমার বিয়ের দিন এগিয়ে এল। আর কতদিন শক্তিপুরে থাকবে? কাপড়-চোপড় পচ্ছন্দ করে এখন থেকে কেনা দরকার। তুমি এলেই দুজনে মিলে শপিং আরম্ভ করা যাবে। বাবা অর্থাৎ তোমার মামা আজকাল জাগরণী ক্লাবের বিশেষ ভক্ত হয়ে উঠেছেন। সুশান্তদা দুবেলা আমাদের বাড়ীতে যাতায়াত করছেন। তোমার দিবুর খবর কি? ভদ্রলোক সদ্য বিলেত থেকে ফিরেছেন, হঠাৎ বেসামাল করে দিও না।

মালিনীর চিঠি শেষ না করেই রেণু তরতর করে নীচে নেমে গেল, এবং একেবারে মুকুন্দরায়ের বাইরের ঘরে হাজির। মুকুন্দরায় একজন অপরিচিত ভদ্রলোকের সঙ্গে বেশ ঘনিষ্ঠ ভাবে আলাপ করছিলেন, রেণু কিছুমাত্র সঙ্কোচ না করে বলল,—আর বসে গল্প করলে চলবে না দাদু, কলকাতা যাওয়ার ব্যবস্থা কর।

অপরিচিত ভদ্রলোক উঠে দাঁড়ালেন, মুকুন্দরায় শশব্যস্তে বললেন,—কেন, কি হল দিবুর কোন খবর এসেছে কি?

—তোমার যেমন কথা! এই তো আজ সকালেই গেল, এরি মধ্যে খবর আসবে কি করে?

—তবে? এখানে ভাল লাগচে না আর? তাহলে ব্যবস্থা কর, আজ বিকেলেই। প্যাসেঞ্জার কটায় হে সন্তোষ? ও হো তোমাদের পরিচয় নেই! এটি আমার নাতনী রেণু, আর ইনি হলেন ইস্কুলের নতুন মাষ্টার সন্তোষ। উপাধি ওঁর জানি না, ওটি উনি বর্জ্জন করেছেন।

মুগ্ধ বিস্ময়ে সন্তোষ রেণুর অজ্ঞাতসারে তার দিকে তাকিয়েছিল, মুকুন্দ রায়ের কথা শেষ হলে বলল,—ওঁর কথা আমি অনেক শুনেছি গাঁয়ের লোকের কাছ থেকে। তারপর রেণুকে নমস্কার করে বলল,—দেখুন, আমরা হলাম নতুন যুগের মানুষ। মার্কস্ বলেন,—Man is born free, yet everywhere he is in chains.

রেণু বলল,—কিন্তু ওটা তো মার্কসের কথা নয়, রুশো বলে গেছেন ও কথা।

—ঐ একই হল, রুশোও বিপ্লবী, মার্কস্‌ও-বিপ্লবী। দেখুন এযুগে আর কোন কিছুর তারতম্য নেই, সব এক হয়ে গেছে। রুশিয়ার কথা জানেন তো? সে দেশে রাজাপ্রজার প্রভেদ নেই, নরনারীর বিভেদ নেই, আছে শুধু মানুষ! মেকী নয়, একেবারে খাঁটি প্রলিট্যারিয়েট। বুকে তার জ্বলেপুড়ে যাচ্ছে বিপ্লবের বহ্নিশিখা, সে আগুনে সারা পৃথিবী সে পুড়িয়ে ছাই করে দিতে চায়।

মুকুন্দ রায় সভয়ে একপা পিছিয়ে দাড়ালেন,—সন্তোষের হাত পা যে রকম নড়ছে, তার ফলে তাঁর আহত হওয়া বিচিত্র নয়। রেণুর চোখে সপ্রশংস দৃষ্টি।

দম নিয়ে আবার আরম্ভ করল সন্তোষ।—আগামী দিন আসছে, যেদিন পৃথিবীতে ভেদ বলে কিছু থাকবে না। অর্থভেদ, শিক্ষাভেদ, আচারভেদ, ব্যবহারভেদ,—সব ভেদের সেদিন হবে অবসান।

এই ভেদপ্রথার অবসান না হলে জগতের উন্নতি হবে না। তারপর আছেন লেনিন, ষ্ট্যালিন। পেডাভস্কির কবিতা পড়েছেন তো? আহা-হ, নিপীড়িত জগতের মুক্তির সুর।

সন্তোষ আবার একটা বক্তৃতার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল, মুকুন্দ রায় বাধা দিয়ে বললেন, আগে আমাদের সেই বিষয়ের একটা মীমাংসা হয়ে যাক্ সন্তোষ।

একটু বিরক্তভাবে সন্তোষ বলল,—প্যাসেঞ্জার তো সচারটেয় মুকুন্দবাবু, এখন মোটে সাড়েনটা। যাক্, পরে এ সম্বন্ধে আপনার সঙ্গে আলোচনা করব। মুকুন্দবাবুর সঙ্গে প্রাইভেট একটা ব্যাপার আছে। ষ্টেশনে দেখা হবে।

বিশেষ অভিভূত হয়ে রেণু প্রস্থান করলে পর সন্তোষ বলল,—রেণুর বেশ পড়াশুনা আছে মুকুন্দবাবু।

মুকুন্দ রায় হঠাৎ খাপ্পা হয়ে বললেন,—একটু ভদ্রভাবে কথা বল সন্তোষ, অপরিচিতা মহিলাকে নাম ধরে উল্লেখ করা উচিত নয়।

সন্তোষ হো হো করে হেসে উঠল। আপনি অবাক করলেন মুকুন্দবাবু। নাম ধরে ডাকব না তো কি ধরে ডাকব! আমরা তবু নামটা রেখেছি, রুশিয়াতে মানুষের আর পৃথক নাম নেই। সেখানে মানুষ মানুষ নামে পরিচিত। অবশ্য এদেশের চলতি কথাবার্ত্তা অনুযায়ী আমার বলা উচিত ছিল রেণুদেবী। আপনি যখন রাগ করছেন এখন থেকে এইভাবে সম্বোধন করব। আসুন, এখন কাজের কথা পাড়া যাক্।

রায়মশায় বললেন,—হ্যাঁ, কি বলছিলে? বিরাজবাবু এবার ইস্কুলের সেক্রেটারী হবার চেষ্টায় আছেন?

—তাই তো শুনছি, আমার সঙ্গে এবিষয়ে একটা আলোচনাও করেছেন।

এ ইস্কুল প্রতিষ্ঠা হয়েছে পঁচিশ বছর, প্রধানতঃ আমাদের রায়বাড়ীর চেষ্টায়। আমার ছেলে রমেন ছিল ইস্কুলের প্রথম সেক্রেটারী। তার মৃত্যুর পর আজ দশ বছর আমি এই পদে আছি। এমন কি গুরুতর ব্যাপার ঘটল যে সেক্রেটারী চেঞ্জ করা দরকার ?

—আপনার বিরুদ্ধে প্রধান অভিযোগ এই, আপনি গ্রামে বিশেষ বাস করেন না। বছরের মধ্যে আটমাস কাটান কলকাতায়।

—সে অভিযোগ তো বিরাজবাবুর পক্ষেও খাটে। তিনি কলিয়ারীর মালিক, প্রায় রোজই তাঁকে কলকাতা যেতে হয়।

—কিন্তু কলকাতায় গিয়ে তিনি দীর্ঘকাল আটকে থাকেন না। এই সেদিন তাঁর মোটরে আমাকে নিয়ে গেলেন সকালবেলা, আবার ফিরলাম দুজনে সেইদিন সন্ধ্যার আগে। তাছাড়া সমস্যা আরও নানারকম দেখা দিয়েছে। কলিয়ারীর শ্রমিকদের ছেলেরা ইস্কুলে পড়তে আরম্ভ করেছে। এ অবস্থায় মালিকদের মধ্যে একজন সেক্রেটারী হওয়াই বাঞ্ছনীয়। ডোনার হিসাবে আপনি কমিটি মেম্বর থাকুন।

মুকুন্দ রায় হঠাৎ সন্তোষের হাত ধরে বললেন,—আমাকে তুমি বাঁচাও সন্তোষ, এই ইস্কুলের সঙ্গে আমার রমেনের বহুস্মৃতি জড়িয়ে আছে। এর সেক্রেটারীগিরি থেকে আমাকে বঞ্চিত কোরো না। বিরাজবাবুকে বরং কমিটি মেম্বর করে নাও।

হাত কচলে সন্তোষ বলল,—আমি কি করব বলুন, সকলেরই এই মত। বিরাজবাবু টাকাকড়িও কিছু ইতিমধ্যে খরচ করে বসে আছেন।

—টাকার কথা বলছ! যত টাকা লাগে আমি দেব। আপাততঃ পাঁচশো নাও। রায়বংশের টাকার অভাব এখনও হয়নি।

মুকুন্দরায় বাড়ীর ভিতর থেকে পাঁচখানা একশো টাকার নোট এনে সন্তোষের হাতে দিয়ে বললেন,—এই দিয়ে আপাততঃ কাজ চালিয়ে

নাও। আর ভোটারদের জানিয়ে দিও, আমার নাতনীর বিয়ের পরেই আমি গ্রামে স্থায়ীভাবে বসবাস করব।

হঠাৎ চমকে উঠল সন্তোষ, বলল,—ওঁর বিয়ে নাকি!

—হ্যাঁ, এই সামনের মাসের এগারোই। ছেলেটি বিলেত ফেরত ডাক্তার, তোমার সঙ্গে নাকি আলাপ হয়েছে একদিন ইস্কুলে।

—ওঃ, দিবাকরবাবু! আপনার পাত্র নির্ব্বাচনের কিন্তু সুখ্যাতি করতে পারলাম না মুকুন্দবাবু! পর্দ্দার আড়ালে রেণুর অস্তিত্ব অনুভব করে চীৎকারের সুরে সন্তোষ বলল,—লোকটি একেবারে গোঁড়া সেকেলে, মহাভারতের যুগের মানুষ। মার্কস্ বলেন, এই রকম লোক সমাজের পক্ষে ভয়ানক ক্ষতিকর।

—ওদের বিয়ে অনেদিন থেকে ঠিক হয়ে আছে সন্তোষ। মুকুন্দ রায় হঠাৎ থেমে গেলেন, বহির্দ্বার পথে কে যেন প্রবেশ করছে। আগন্তুককে দেখে উল্লাসে চীৎকার করে উঠলেন তিনি,—এস অশোক, তুমি যে আমার সঙ্গে দেখা করতে আসবে, আমি স্বপ্নেও ভাবিনি।

হঠাৎ যেন আঘাত পেয়েছে এইরকম সুরে অশোক বলল,—আপনি এমন কথা বলছেন কেন রায় মশায়! আপনি শক্তিপুরে এলে আমি তো বরাবরই দেখা করে থাকি।

—না, না, তুমি আমাকে ভুল বুঝছ অশোক। অর্থাৎ আমি বলতে চাইছি, তোমার কাজের ভিড়ে তুমি আমার সঙ্গে দেখা করার সময় পাবে কি করে?

নোট কখানা সার্টের পকেটে সন্তর্পণে রেখে সন্তোষ বলল,—অকাজের কাজ!

পাশে মন্তব্যকারী সন্তোষকে দেখে অশোক বলল,—আপনিও আছেন দেখছি। ও নোট কখানা কোথায় বাগালেন সন্তোষবাবু? বিরাজবাবু না রায়মশায়ের মারফত?

বিকট চীৎকার করে সন্তোষ বলল,—তার মানে? আমি জানতে চাই কি মীন্ করছেন আপনি! সন্তোষ রায়মশায়ের টেবিলে প্রচণ্ড মুষ্ট্যাঘাত করে বসল!

শান্তস্বরে অশোক বলল,—বলছি যে, বিরাজবাবু আপনাকে একশ টাকা মাসোহারা দেন। তাছাড়া ইস্কুলের সেক্রেটারী নির্ব্বাচন ব্যাপারে তাঁর কাছ থেকে আপনি বেশ কিছু আদায় করেছেন। আপনার পকেটস্থ টাকা সম্ভবতঃ রায়মশায় দিয়েছেন।

সেই রকম তেজের সঙ্গে সন্তোষ বলল,—আপনাদের মত টাকা আমরা বাজে কাজে নষ্ট করি না। এই টাকা ইস্কুলের কল্যাণেই খরচ করা হবে।

হেসে বলল অশোক,—তাহলে স্বীকার করলেন আপনি, টাকা নিয়েছেন।

—হ্যাঁ, নিয়েছিই তো, যা করতে পার কর তুমি। সন্তোষ বেগে বেরিয়ে গেল।

মুকুন্দ রায় অপরাধীর মত বললেন,—ভারী অশিষ্ট লোকটা।

অশোক বলল,—এ ধরণের আচরণ সহ্য হয়ে গেছে রায় মশায়। তবে সন্তোষবাবু দুপক্ষে থেকেই টাকা নিচ্ছেন, সেক্রেটারী নির্ব্বাচন ব্যাপারে ওঁর উৎসাহই সবচেয়ে বেশী। তবে আপনার টাকা আপনি যেভাবে খরচ করবেন, করুন। আমার বলবার কোন অধিকার নেই। এই প্রসঙ্গ বন্ধ রেখে কাজের কথা পাড়া যাক্।

—তোমার প্রতিষ্ঠানের কাজকর্ম্মে কি সব গোলমাল বেধেছে!

—আজ্ঞে হ্যাঁ, সেইজন্যই আপনার কাছে আসা। কলিয়ারী অঞ্চলে আমাদের একটা নাইট্ স্কুল ছিল, বিরাজবাবুর হুকুমে সেটা বন্ধ করে দিতে হয়েছে। স্কুলের জমিটা নাকি কলিয়ারীর মালিকদের।

—আরে ও জমি তো বহুকালের পতিত,—শালবন আর কাঁটাবনে

বোঝাই। ওখান থেকে বিরাজবাবু ইস্কুল তুলে দিলেন কার পরামর্শে ?

—ঠিক বলা কঠিন, তবে আমার ছাত্রেরা বলছিল, সন্তোষবাবুর নাকি এর মধ্যে হাত আছে!

—ওঃ, এই মাষ্টারটি কুক্ষণে আমদানী করেছিলাম, শক্তিপুরের শনি হয়ে দাঁড়িয়েছে। এখানে আসার আগে কলকাতায় আমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল শিবেন্দ্র। শিবেন্দ্রকে চেন বোধ হয়, আমার সম্বন্ধী, কয়েকবার এসেছে এখানে। শিবেন্দ্র বলেন,—এ একজন মস্তবড় কর্ম্মী, গ্রামে গিয়ে গ্রামসেবা করতে চায়। সেবার নমুনা বেশ ভালই দেখছি।

—এ কথায় আমার একটু আপত্তি আছে, রায় মশায়। সন্তোষবাবুকে ঠিক দোষ দেওয়া যায় না। যে আদর্শের দ্বারা তিনি অনুপ্রেরিত হয়েছেন, সেই অনুযায়ী কাজ করে চলেছেন। গলদ তাঁর মধ্যে নয়, গলদ তাঁর আদর্শে। যাক্, আমি যেজন্য এসেছি বলি। হাতীগাঁয়ে আপনার খানিকটা পোড়ো জমি আছে হরিমন্দিরের পাশে। ঐখানে আমাদের নাইট্ স্কুল আবার বসাতে চাই।

মুকুন্দ রায় বললেন,—একটু মুস্কিল আছে। জমিটা ঠিক আমার নয়। অনুমতি দেবার মালিক রেণু। ওটা ওর মায়ের জমি কিনা। আমার হলে তোমার অনুমতি প্রয়োজন ছিল না। অবশ্য এতেও বিশেষ আপত্তি হবে না। একটু বোসো, রেণুকে ডেকে পাঠাই। উঠে যাওয়ার সময় অস্ফুটস্বরে বললেন, আজ রমেন থাকলে কোন কিছুরই দরকার হত না।

রায়বাড়ীর বাইরের ঘরে অশোক একা। এক ক্ষণিকের দুর্ব্বলতায় বুকের মধ্যে তার সুরু হয়েছে অজানা আন্দোলন। সে যেন বহুদিনের সাধনার ফল আত্মসংযম হারিয়ে ফেলেছে। রেণু আসবে, তাকে কি বলে সম্বোধন করবে, কি ভাবে কথা বলবে তার সঙ্গে! এক সুমধুর চিন্তায় অশোক নিমগ্ন হয়ে গেল।

—সে এল না। ঘরে প্রবেশ করতে করতে মুকুন্দ রায় বললেন। তারপর দুঃখিত ভাবে বললেন,—জমি দিতেও রাজী নয়।

অশোক পায়ের শব্দ শুনে উঠে দাঁড়িয়েছিল, রায়মশায়ের সংক্ষিপ্ত বার্ত্তা শুনে বুঝতে পারল, তিনি অনেক কিছু লুকোচ্ছেন। সত্যিই রেণু হাতীগাঁর পল্লী প্রতিষ্ঠান ও তার কর্ণধার সম্বন্ধে বহুবিধ অশিষ্ট মন্তব্য প্রকাশ করেছে।

—তার মেজাজটা এখন ভাল নেই অশোক! দিবাকর চলে গেছে আজ সকালে, ওবেলা আমরা সকলেই কলকাতা যাচ্ছি, ফিরব একেবারে রেণুর বিয়ের পর। ফিরে এসে তোমার নাইট্ ইস্কুলের একটা ব্যবস্থা আমি করে দেব। আর দেখ, তুমিও একটু চেষ্টা কোরো, হাই ইস্কুলের সেক্রেটারীগিরিটা আমার যেন বজায় থাকে।

অশোক যেন একটা বিষম ভার থেকে মুক্ত হয়েছে। লঘুচিত্তে বলল,—নাইট্ স্কুল আমি ঠিক চালিয়ে নেব রায়মশায়, তবে আপনার কোন কাজে লাগতে পারব না। হাই স্কুলের ব্যাপারে আমার হস্তক্ষেপ না করাই ভাল। করলে অনধিকারচর্চ্চা হবে। সন্তোষবাবু যদি আপনার পক্ষ সমর্থন করেন, তাহলে শিক্ষক, ছাত্র ও অভিভাবক, সকলেই আপনাকে সমর্থন করবে। তবে টাকা দিয়ে আপনি সন্তোষ-বাবুকে হাত করতে পারবেন না। বিরাজবাবু আপনার চেয়ে অনেক বেশী টাকার মালিক।

অশোকের এই স্পষ্টোক্তিতে মুকুন্দ রায় হতাশভাবে চেয়ারে বসে পড়লেন।

পরেশবাবু দুপুরে খেতে বসেছেন। শিবানী পরিবেশন করছে। কাত্যায়নী ছোট ছেলেমেয়েদের তদারক করছেন।

অনেকক্ষণ নীরবে ভোজন সমাধা করার পর পরেশবাবু বললেন,—

বড় রায়বাড়ীর ওরা সব আজ চলল কলকাতায়। ওদের চাকর এসে একরাশ লাগেজ জমা দিয়ে গেল।

কাত্যায়নী বললে,—ওদের বিয়ে হল আসচে মাসের এগারোই, আমাদের এখানে হল এ মাসের সাতাশে। হ্যাঁরে শিবু, দিবাকর তোকে তো তাই বলে গেছে?

শিবানী বলল,—কোন্ দিন তা ঠিক করে বলেন নি, বলেচেন মা মাসের শেষে আসবেন।

নির্ব্বাক শিবানী কোন্ এক মন্ত্রবলে হঠাৎ সবাক হয়ে গেছে। যে মেয়েকে কথা বলাতে অনেক সাধ্যসাধনা করতে হত, আজ সে নিজের এই অত্যন্ত লজ্জাকর বিবাহ সম্বন্ধে মুক্তভাবে আলোচনা করছে।

পরেশবাবু চিরকালই কম কথা বলেন, কিন্তু আজ তিনিও মেয়ের এই মুখরতার প্রভাবে মুখর হয়ে উঠলেন। বললেন,—ঠিক আসবে তো? এই ব্যাপারের পর তার উপর একটুও শ্রদ্ধা নেই আমার। সে তোকে বিয়ে করতে রাজী হয়েছে অনেক বলবার পর।

এইবার শিবানী অত্যন্ত লজ্জা অনুভব করল। তার নারী হৃদয় সুস্পষ্ট জানে, দিবাকরকে বিবাহে সম্মত করান তার জীবনের শ্রেষ্ঠ পরাজয়। পরেশবাবুর কথায় উত্তরে সে কিই বা বলতে পারে। কাত্যায়নী মেয়ের হঠাৎ গম্ভীর মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন,—মেয়ের সামনে এসব কথা না বলাই ভাল। সাতাশে মাঘ বিয়ের শেষ দিন, আজ হল বাইশে। আসবে যখন বলে গেছে, ঠিক আসবে। বিশ্বাস না হয় চিঠি একখানা লিখতে পার।

—চিঠি লিখতে গেলে ঠিকানা দরকার।

—ঠিকানা আছে শিবুর কাছে। প্রথম বার যাওয়ার পর শিবুকে চিঠি লিখেছিল একখানা।

পরেশবাবু বললেন,—ভেতরে ভেতরে এত কাণ্ড হয়েছে, আর আমাকে জানালে একেবারে শেষ সময়ে। শিবুর সঙ্গে ওর মেলামেশা হয়েছে, তারপর শিবুকে চিঠিপত্রও লিখেছে। গোড়ায় জানতে পারলে পঞ্চু আর সীতারামকে দিয়ে ওর দুইহাত ধরে সেইদিনই শিবুর সঙ্গে বিয়ে দিয়ে ছাড়তাম।

উত্তেজনায় পরেশবাবুর মুখ কঠিন হয়ে উঠল। খাওয়া তাঁর তখনও শেষ হয় নি। কাত্যায়নী বললেন,—অপরাধ অবশ্য আমাদেরই, কিন্তু ভেবে দেখ, অত লেখাপড়া জানা লোককে সন্দেহ করি কি করে! তাছাড়া আমাদের সঙ্গে কত আপনভাবে মিশতে আরম্ভ করেছিল!

—অপরাধ তোমাদের খুব বেশী নয়। সরল গ্রাম্য লোক তোমরা, ওসব শহুরে হালচাল বুঝতে পারবে না। লেখাপড়া জানা লোক দেখলেই আজকাল বেশী সন্দেহ হয়। প্রমাণ দিবাকর, প্রমাণ সন্তোষ মাষ্টার। ভাল ক্বচিৎ একটা দেখা যায়, যেমন হাতীগাঁর অশোক। তোমার অপরাধ হল, বয়স্থা মেয়েকে তুমি অপরিচিত এক যুবকের সঙ্গে অবাধে মেলামেশা করতে দিয়েছ। এ বয়সটা যে বড় সাংঘাতিক গিন্নী! দুষ্টলোকে এর সুযোগ তো গ্রহণ করবেই!

—যা হবার হয়ে গেছে, দিবাকরকে চিঠি একখানা আজই লেখ। লিখে দাও, চুপিচুপি আসবে, বিয়ে সেরে চুপিচুপি চলে যাবে। মেয়ে আমার সমাজে চল হলেই হল।

কাত্যায়নী হঠাৎ ঝরঝর করে কেঁদে ফেললেন। বললেন,—বড় মেয়ের বিয়ে, কত সাধ আহ্লাদ ছিল!

পরেশবাবুর চোখের কোণেও অনেকখানি জল এসে জমা হল, কোন রকমে সামলে নিয়ে তিনি বললেন,—শিবুর জন্মদিনের কথা মনে আছে কাতু! আঁতুড় ঘরে চুপিচুপি আমি দেখতে গেলাম তোমাকে, তুমি বললে,—টাকার যোগাড় দেখ। তখনও চাকরী হয় নি আমার। ওঃ,

তারপর উনিশটা বছর যেন দেখতে দেখতে কেটে গেল। শিবুকে আমার এখনও মনে হয় আঁতুড় ঘরে সেই নেকড়াজড়ান খুকী।

কাত্যায়নী বললেন,—আজ দুবচ্ছর ধরে শিবুর বিয়ের চেষ্টা চলছে। কত ছেলের সঙ্গে কথা হল, একটাও লাগল না। এই যে তুমি অশোকের কথা বললে, ওর সঙ্গেও কথা হয়েছিল, কিন্তু রাজী হল না।

—অশোকের মত ছেলেরা ঠিক বিয়ের জন্য নয়। ওরা জগতে এসেছে কাজ করবার জন্য।

—তবে আমাদের মেয়েদের গতি কি হবে? ধর অশোক যদি শিবুকে বিয়ে করত, ওর এ অবস্থা কখনই হত না।

—অশোকের মত ছেলের সংখ্যা দেশে কম, হাজারে একটি। বেশীর ভাগই হয় দিবাকর, না হয় সন্তোষ। হয় ভিজে বেড়াল হয়ে থাকে, নয় তো লম্ফঝম্ফ করে। শিবমন্দিরে তো মাঝে মাঝে যাও, এবার হাতীগাঁ গিয়ে দেখে এসো। দেখবে শক্তিপুরের সঙ্গে তফাৎ কতখানি। ঘরে ঘরে চরকা ঘুরছে, আর প্রতি দশখানি বাড়ী পিছু একটা করে তাঁত। পঞ্চুসীতারাম সেদিন ঘুরে এসে বললে, গাঁয়ের লোক নাকি বাজার থেকে কাপড় কিনে পরে না। আর তোমার দিবাকর! তিনি বহু টাকা খরচ করে বিদেশ থেকে পড়ে এলেন, তারপর বসলেন শহরে। দেশের প্রকৃত উপকার কিছুই করলেন না, উপকারের নমুনা আমাদের ঘরেই দেখতে পাচ্ছি। তারপর দেখ সন্তোষমাষ্টার। গ্রামের ছেলেদের উচ্ছন্নে দিল। শুনতে পাই কোন ছেলে আজকাল আর বাড়ীতে থাকে না। বাড়ী আসে খালি খেতে আর শুতে। দিনরাত খালি হৈহৈ করে বেড়ান আর বড়বড় বুলি কপ্‌চান। এই তোমার ছেলেই রয়েছে তার জাজ্জ্বল্য প্রমাণ। আজ বাদে কাল পরীক্ষা, বাড়ীতে তার টিকিটি দেখবার উপায় নেই।

কাত্যায়নী বললেন,—বক্তৃতায় তুমিও কম যাও না। টুকুর কথা

পরে ভাবলেই চলবে, আগে এদিকে সামলাও। দিবাকরকে চিঠি একটা লেখ ঘরে বসে, তারপর কাজে যাও।

পরেশবাবু বললেন,—ষ্টেশনে প্যাসেঞ্জারদের সঙ্গে রাতদিন বকাবকি করে আর অনেকরকম দেখে শুনে জ্ঞান আমারও কিছু হয়েছে, গিন্নী। তবে এসব ব্যাপারে তোমার আজ্ঞাই শিরোধার্য্য। তোমরা খেয়েটেয়ে নাও, তারপর ধীরেসুস্থে চিঠি লেখা যাবে। তুমি বলে দিও, আমি শুধু লিখে যাব। শিবু কোথায় গেলি মা! পানটান দে একটা।

পরেশবাবু ঘরে উঠলেন। কাত্যায়নী মেয়েদের নিয়ে খেতে বসলেন শিবানী মাথা নীচু করে খাচ্ছে, কাত্যায়নী মেয়ের মুখের দিকে তাকালেন। শিবানীর মুখশ্রী ও সারা অবয়বে দ্রুত পরিবর্ত্তন আসছে, আর তিনচার মাস পরে সকলেই জানতে পারবে। তখন অবশ্য কোন ক্ষতি নেই। একাদিক দিয়ে ভালই আছেন তাঁরা, গ্রামের লোকের সঙ্গে বিশেষ সংস্রব নেই। নইলে গিন্নীদের চোখে ধূলো দেওয়া মুস্কিল হত। কিন্তু শিবানীর চেহারা দিন দিন সুন্দর হচ্ছে। দারুণ দুশ্চিন্তার মধ্যেও প্রথম মাতৃত্বের ছাপ তার মধ্যে এনে দিয়েছে একটা কমনীয় কান্তি। রেণুর চেয়ে শিবানীকে খারাপ দেখায় না। রেণুর রং একটু কটা, কিন্তু এমন ঢলঢলে মুখশ্রী রেণুর নেই। একটা সতেজ অপরাজিতা ফুলের চারা যেন পুষ্পিত হয়ে উঠেছে। মনকে প্রবোধ দিলেন কাত্যায়নী, রেণুকে নিয়ে ঘর করলেও দিবাকর শিবানীকে একেবারে অবহেলা করতে সাহস করবে না। তার সন্তানের জননী,—শিবানী একদিন তার স্বামীর ঘরে প্রতিষ্ঠিত হবেই।

কাত্যায়নী আশা করছিলেন শিবানী কিছু একটা বলবে, কারণ দিবাকরের দ্বিতীয়বার আগমনের পর তার কথা বলার প্রবৃত্তি হঠাৎ বেড়ে গেছে। কিন্তু তাকে মৌন দেখে বললেন,—আজ ষ্টেশনে যাবি একবার? রায়েরা সব কলকাতায় যাবে। ষ্টেশনে যাওয়ার ইচ্ছা তাঁরই

খুব বেশী ছিল, কাত্যায়নী যেন রায়গিন্নীর সম্মুখে দাঁড়িয়ে কথা বলার মত শক্তি সঞ্চয় করেছেন।

শিবানী সম্মতিসূচক ঘাড় নেড়ে বলল, আমাদেরও একবার কলকাতায় নিয়ে চল না, মা। বাবাকে বল, টিকিট তো আর লাগবে না!

—যেতে তো ইচ্ছে করে শিবু, কিন্তু গিয়ে উঠব কোথায়? আমাদের আত্মীয় বলতে কলকাতায় কেউ নেই।

—তুমিও তো কলকাতা দেখ নি, মা!

—নারে, আমি একবার দেখেছি। খুব ছোটবেলায়, বয়স যখন আমার আট। তোর দাদামশায় দিদিমা সব গিছলেন। তা কি কিছু মনে আছে! আমরা ছিলাম এক হোটেলে। বড় বড় বাড়ী আর সুন্দর সুন্দর রাস্তা, অনেক লোকজন আর গাড়ীঘোড়া,—এইসব মনে পড়ে একটু একটু।

—যাদের বাড়ী নেই তারাই হোটেলে থাকে, না মা?

কাত্যায়নী বুঝতে পারলেন,—শিবানী কি উদ্দেশ্যে একথা জিজ্ঞাসা করছে। তিনি বললেন,—বিয়ের পর কি আর দিবাকর হোটেলে থাকবে! বাড়ী ওকে ঠিক করতে হবে। তোর কপালে থাকে, তোকেও নিয়ে যাবে।

খাওয়ার পর কাত্যায়নী পরেশবাবুকে চিঠির জন্য তাগাদা দিতে গেলেন শিবানী রান্নাঘরের বারান্দার এক কোণে নিঃশব্দে বসে থাকল। ছোট ভাইবোনেরা ওদিককার বারান্দায় মহা হৈচৈ লাগিয়েছে। মিনুর পুতুলের আজ বিয়ে। পুরুষ হয়েছে সাত বছরের ঝণ্টু। মিনু গৃহিণী জনোচিত ভাষায় গম্ভীরভাবে সকলের সঙ্গে কথা বলছে। শিবানীর আজ আর এসব শোনার অবসর নেই। এই সেদিনও সে মিনুদের সঙ্গে পুতুল খেলেছে। ন্যাকড়া সেলাই করে চমৎকার পুতুল সে ভাইবোনদের বানিয়ে দিয়েছে। আজ তার নিজের মনই যেন পরিণত

হয়েছে একটা নিষ্প্রাণ পুত্তলিকায়। সাড়া নেই, শব্দ নেই, মন হয়েছে যেন অপরের খেলার সামগ্রী। যে যেদিকে চালনা করছে, তার মন চলেছে সেই দিকে। স্বাধীন সত্তা তার হয়েছে অবলুপ্ত।

চারিদিকে দ্বিপ্রহরের স্তব্ধতা শীতের রৌদ্রতাপে বিলীন হয়ে আছে। হাওয়ার সঙ্গে ভেসে আসছে আম্রমুকুলের সুগন্ধ আর দূর পলাশবনের রক্তিমা। রেললাইনের ওপারে লাল কাঁকর ভরা মাঠ, একটি প্রাণীও সেখানে দেখা যায় না। শিবানীর মনে হল, আজিকার দ্বিপ্রহরে জগতে সে একা ভাইবোনদের সঙ্গে আনন্দ করবার অধিকার নেই, বাপমার বিশ্রম্ভালাপে বাধা দিতে সে সক্ষম। তাকে একান্ত আপনভাবে আহ্বান করছে শুধু ঐ শীতের রৌদ্র-স্নিগ্ধ মাঠ আর প্রাকৃতিক পরিবেশ। দিবাকর তাকে বিবাহ করবে, কিন্তু স্ত্রীর মর্য্যাদা দেবে না। সে অধিকার পাবে রায়বাড়ীর মেয়ে রেণু। রেণুকে দিবাকর সত্যিই ভালবাসে, আর তাকে বিবাহ করছে একটা দায়সারা গোছের কাজের মত। কিন্তু তাই যদি হয়, তবে দিবাকর শক্তিপুরে অবস্থানকালে তার প্রতি অত ভালবাসা দেখিয়েছিল কেন ?

একটু চিন্তার পর ব্যাপারটা আগাগোড়া তার জলের মত পরিষ্কার হয়ে গেল। দিবাকর তাকে ভালবাসেনি, ভালবেসেছিল তার যৌবনকে। ভ্রমরের মত লুব্ধ হয়ে এসেছিল, মধু আহরণ করে চলে গেছে। যে ভ্রমর একবার চলে যায় সে কি আর সহজে ফিরে আসে ফলিত পুষ্পে? শিবানী নিজের শরীরের প্রতি একবার দৃষ্টি নিক্ষেপ করল। কী এক মহাপরিবর্ত্তন সুরু হয়েছে তার দেহে! এই পরিবর্ত্তন অন্যান্য বিবাহিত নারীদের মত সংঘটিত হলে কত সুখের হত!

চিন্তামগ্ন শিবানী আবার তাকাল রেললাইনের দিকে। স্লিপারের উপর দিয়ে একটি প্রাণী চলেছে। গায়ে আধময়লা একটি চাদর, হাতে কয়েকটি চারাগাছ। শিবানী দূর থেকেও তাকে চিনতে পারল।

পরিচিত কারুর সঙ্গে কথা বলার জন্য সে যেন হাঁপিয়ে উঠেছে, এমনি ভাবে চীৎকার করে ডাকল,—অশোকদা !

সবিস্ময়ে মুখ ফিরিয়ে অশোক দেখে তার আহ্বানকারী শিবানী, পরেশবাবুর মেয়ে। শিবানীদের বাড়ীতে ছেলেবেলায় সে অনেক যাতায়াত করেছে, এবং এক সময় শিবানীর সঙ্গে তার বিয়ের কথাবার্ত্তাও হয়েছিল। বর্ত্তমানে কাজের চাপে বিনা প্রয়োজনে পরিচিত মহলে যাতয়াত সে বন্ধ করতে বাধ্য হয়েছে। অবশ্য পরেশবাবুর সঙ্গে ষ্টেশনে তার বাক্যালাপ হয়। সে যাই হোক, শিবানী তাকে এত আত্মীয়তার সুরে কখনও ডাকেনি। অশোক রেললাইন ছেড়ে পরেশবাবুর কোয়ার্টার্সের দিকে পা বাড়াল।

কাছে আসতেই শিবানী বলল,—এত গাছ নিয়ে এই দুপুরবেলা কোথায় চলেছেন অশোকদা ? শিবানীর কথায় একটুও সঙ্কোচ নেই, যেন অশোকের সঙ্গে তার বহুদিনের একটা প্রিয়সম্পর্ক বিদ্যমান।

অশোক কিন্তু এই পরিস্থিতি অত সহজে গ্রহণ করতে পারল না ! সে বলল,—ওঃ, আপনাদের বাড়ী কতদিন আসিনি। আপনার বাবার সঙ্গে প্রায়ই দেখা হয়, খোঁজ খবর সব তাঁর কাছেই পাই। টুকু কোথায় ? সে তো এবার পরীক্ষা দেবে, না ?

শিবানী বলল,—আপনি আমার প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে নিজেই প্রশ্ন করে বসচেন। আপনি এতদিন না আসায় আমি তো কোন অনুযোগ করিনি। টুকুর কথা আমাকে জিজ্ঞাসা না করে সন্তোষ মাষ্টারকে জিগ্যেস করুন। সে আসে শুধু খাওয়ার সময়, রাতে কোনদিন আসে, কোনদিন আসে না। এইবার আমার কথার উত্তর দিন।

—এই গাছের কথা বলছেন ? বড় উপকারী গাছের চারা এগুলো,—কণ্টিকারী আর বিশল্যকরণী। রেললাইনের ওধারে ঝোপ হয়ে আছে।

—আজকাল আপনি খুব ভদ্রতা শিখেছেন অশোকদা। যাকে একদিন তুই বলতেন, আজ তাকে বলছেন আপনি।

অশোক হেসে বলল,—ওটা স্বভাবের দোষ শিবু, আজকাল কমবয়সের ছেলেমেয়েরাও তুমি বললে অপমান বোধ করে। কাজেই ছেলেবুড়া সকলকেই আপনি বলা সুরু করে দিয়েছি।

শিবানী বলল,—কন্টিকারী আর বিশল্যকরণী তুলতে গিয়ে তো দুপুর কাবার করে এনেছেন। চেহারা দেখে বুঝচি খাওয়াদাওয়া হয় নি এখনও।

—হাতীগাঁর দুটি পরিবার কদিন হল অসুখে ভুগচে। ডাক্তার ডাকার সামর্থ্য তাদের নেই, এই গাছ নিয়ে যাচ্ছি তাদের জন্য! খাওয়াদাওয়া তারপর হবে। কুকারে চাল-ডাল চড়িয়ে দেব, এক ঘণ্টার মধ্যে হয়ে যাবে।

শিবু, ও কার সঙ্গে কথা বলছিস্ রে! বলতে বলতে কাত্যায়নী বেরিয়ে এলেন। ওমা, এ যে অশোক। এই আজকেই উনি তোমার কত সুখ্যাতি করছিলেন, বাবা।

—অশোকদার এখনও খাওয়া হয় নি, মা।

কাত্যায়নী ব্যস্ত হয়ে বললেন,—সর্ব্বনাশ বেলা যে আড়াইটে। স্নানাহার তুমি এখানেই সেরে যাও, বাবা। হাঁড়ীতে ভাত ডাল তরকারী সবই আছে একজনের মত।

অশোক সবিস্ময়ে বলল,—এই দুর্ভিক্ষের বাজারেও আপনারা অতিথি সেবার ব্যবস্থা করে রাখেন?

—বহুকালের অভ্যাস, বাবা, সহজে ছাড়া যায় না।

খাওয়ার পর তৃপ্তির উদ্গার তুলে অশোক বলল,—এবার থেকে লাইনের ধার দিয়ে গেলেই তোমাদের বাড়ীতে এসে হাজির হব, শিবু। আমি জানতাম না এরকম চমৎকার ব্যবস্থা তোমরা করে রাখ। তবে আর কোন লোক এখবর জানে না তো?

অশোকের কথা শুনে সকলেই হেসে ফেলল। এই মুক্ত হাসির জোয়ারে কাত্যায়নী ও শিবানীর মানসিক গ্লানি যেন অনেকটা মুছে গেল।

অশোকও হাসিতে যোগ দিল, তারপর বলল,—একদিন হাতীগাঁয়ে চলুন না মা। আপনি, শিবু, ছেলেমেয়েরা। সব দেখেশুনে আসবেন। খাওয়াদাওয়ার কোন অসুবিধে হবে না। একটা ফ্যামিলি কুকার আছে, রান্না চড়িয়ে দিলে এক ঘণ্টায় সব শেষ! কবে যাবেন বলুন, গরুর গাড়ী পাঠিয়ে দেব।

কাত্যায়নী বললেন,—এমাসে আর হয়ে উঠবে না অশোক, সামনের মাসে নিশ্চয়ই যাব।

—এমাসেই গেলেই ভাল হত, মা। সাতাশে আমাদের প্রতিষ্ঠানের বাৎসরিক উৎসব, সেদিন একটু ধূমধাম হয়।

—সাতাশে আমাদের বাড়ীতেও একটা কাজ আছে বাবা তাছাড়া টুকু শহরে যাবে পরীক্ষা দিতে তার দুদিন পরে। এসব মিটে গেলে আমরা যাব, তোমাকে আর বলতে হবে না।

শিবানী হঠাৎ বিবর্ণ হয়ে গেল, এবং তার বিবর্ণতা অশোকের দৃষ্টি এড়িয়ে যেতে পারল না। কাত্যায়নীকে প্রণাম করে সে প্রস্থানোদ্যত হলে শিবানী বলল,—আমার একটা চরকা কেনার সখ হয়েছে অশোকদা, আপনার সঙ্গে দেখা হলেই বলব ঠিক ছিল।

অশোক বলল,—চরকা! চরকা কি হবে?

—কেন আমরা কি অজাত? চরকা ছুঁতে নেই আমাদের!

অশোক দেখল শিবানী রাগ করেছে। সে একটু অপ্রস্তুত হয়ে বলল,—না না, তা বলছি না আমি। বাড়ীতে নানান কাজে তুমি কি সময় পাবে?

শিবানী বলল,—কেন, এই তো এখনও বসে আছি!

—বসে থেকে অবশ্য ভালই করেছ, আমার সুবিধে হল। কিন্তু হাতে চরকা থাকলে তো আমাকে দেখতে পেতে না।

কাত্যায়নী হাসতে হাসতে বললেন,—যত সব পাগলের ঝগড়া! এই বলে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললেন,—তুমি একটা চরকা পাঠিয়ে দিও বাবা, একলাটি থাকে। মনে মনে বললেন,—এদের বিয়ে হলে কতই সুখের হত!

মাকে দীর্ঘশ্বাস ফেলতে দেখে শিবানীও সহসা গম্ভীর হয়ে গেল। অশোকের মনে হল বেদনার একটা ঢেউ আনন্দের এই ক্ষণিক উচ্ছ্বাসটুকু চাপা দেওয়ার জন্য এগিয়ে আসছে। সে বলল,—সাতাশে পর্য্যন্ত বড় ব্যস্ত থাকব, শিবু। তারপরই চরকা পেয়ে যাবে।

পথ চলতে চলতে অশোকের মনে হল, শিবানী বড় দুঃখী। একথা কেন তার মনে হল, তার কোন কারণ সে ঠিক করতে পারল না, কিন্তু তবুও তার মনে হল কি একটা ব্যথা পরেশবাবুর স্ত্রী ও মেয়ের মনে স্থায়ী আসন লাভ করেছে। শিবানীদের সঙ্গে তার দেখা হয়নি এক বছর, এক বছর আগে পরেশবাবু তার সঙ্গে শিবানীর বিয়ের প্রস্তাব উত্থাপন করেছিলেন। তার পরে থেকে কতক লজ্জায়, কতক কাজের চাপে সে তাদের সঙ্গে দেখা করতে পারে নি। এক বৎসর আগেকার শিবানী ছিল ফুলের কুঁড়ি, আজ সে যেন ঝরা ফুল। চরকা একটা সে যেন আশ্রয় স্বরূপ প্রার্থনা করেছে। শিবানীকে বিয়ে করতে সে তখন রাজী হয়নি, কারণ রেণুকে পাওয়ার আশা তখনও সে ত্যাগ করেনি। আজ তার মনে হল শিবানীর মত একটি সহধর্ম্মিনী যেন সে মনে প্রাণে কামনা করছে। স্নেহে, ধর্ম্মে ও সেবায় সুনিপণ এই রকম মেয়েই পুরুষের জীবনে প্রয়োজন।

সিগন্যালের কাছে এসে থমকে দাঁড়াল অশোক। পুরাতন কি স্মৃতি তার মনে উদয় হয়েছে। বেশী দিন নয়, মাত্র কয়েকদিন আগেকার

ঘটনা। ওই তো সেই বড় গাছটা, যার নীচে এক সন্ধ্যারাতে শিবানীকে সে কাঁদতে দেখেছিল। সে ঘটনা যেন তার মনে দাগ দিয়ে আছে। শিবানী কাঁদছিল কেন?

অশোক মনস্থির করে ফেলল। হাতীগাঁর উৎসব শেষে সে পরেশ-বাবুর কাছে তাঁর কন্যার পাণিগ্রহণের প্রস্তাব করবে।

পরেশবাবু দিবাকরকে চিঠি লিখেছিলেন বাইশে মাঘ, তেইশে তার চিঠি পাওয়ার কথা। পরেশবাবুরা আশা করেছিলেন, চব্বিশে না হোক, পঁচিশে উত্তর ঠিক আসবে। কিন্তু পঁচিশে তো কেটে গেলই, ছাব্বিশেও দিবাকরের কাছ থেকে কোন উত্তর এল না। পরেশবাবু সকালের প্যাসেঞ্জার বিদায় করে আড়াই মাইল দূরে পোষ্টাপিসে নিজে গিয়ে খবর নিয়ে এলেন, তাঁর নামে চিঠিপত্র কিছু নেই। বাড়ীতে ফিরে দেখেন, কাত্যায়নী ও ছেলেমেয়েরা তাঁর অপেক্ষায় বাইরের উঠোনে দাঁড়িয়ে আছে। পরেশবাবুর গম্ভীর মুখ দেখে কাত্যায়নী আর কিছু জিজ্ঞাসা করতে ভরসা পেলেন না।

ঘরের ভিতরে খালি মেঝেয় বসে পড়লেন পরেশবাবু, কাছে থাকলেন শুধু কাত্যায়নী। অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে পরেশবাবু বললেন,—এ আমি জানতাম। শিবুকে কোন রকমে এড়ানোর জন্য সেদিন বলে গিছল এ মাসের শেষে আসবে।

মৃদুস্বরে কাত্যায়নী বললেন,—এখন উপায়!

—উপায় আর কি? আমি এই জন্যই নাপিত পুরুত কিছু ঠিক করিনি, লোক জানাজানিও হয় নি। বরং তুমি কিছু উদ্যোগ আয়োজন করেছ।

—করার মধ্যে এক বরণ ডালা গুছিয়ে রেখেছি। লোকজন এাদকে কেউ নেই একদিক দিয়ে ভালই হয়েছে।

পরেশবাবু মেঝের উপর সোজা হয়ে বসে বললেন,—দেখ, একেই বলে নিমকহারামী আর বিশ্বাসঘাতকতা। আমাদের নিমকের মর্য্যাদা সে ভালভাবেই রাখল। কতখানি বিশ্বাস আমরা তাকে করেছিলাম, প্রতিদান সে ভালই দিল।

কাত্যায়নী বললেন,—কালকের দিনটাও দেখ। কলকাতায় কত কাজ তার, হয়ত কাজের চাপে ঠিক সময় উত্তর দিতে পারে নি।

—শত কাজ থাকলেও এইটেই এখন তার কাছে সব চেয়ে গুরুত্ব-পূর্ণ কাজ। একাজ যদি যে ভুলে যায়, তাহলে বুঝতে হবে এভুল ইচ্ছাকৃত।

একথার উত্তরে কাত্যায়নী কি বলবেন? তিনি চুপ করে থাকলেন।

পরেশবাবু বললেন,—শিবু কোথায়? ডাক দেখি তাকে একবার।

পিতার আহ্বানে শিবানী ধীরপদে ঘরে এসে দাঁড়াল। পরেশবাবু বললেন,—বোস্ অনেক কথা আছে। তাঁর কথার রুক্ষ ভঙ্গীতে কাত্যায়নী একটু বিচলিত হলেন, শিবানী কিন্তু অচল, নির্ব্বিকার। সে যেন সকল আঘাত গ্রহণ করতে প্রস্তুত।

পরেশবাবু বলতে লাগলেন,—কাল পর্যন্ত অপেক্ষা কর, তারপর মনে রাখবে দিবাকর তোমার জীবনে মৃত, অন্ততঃ আমি যতদিন আছি। জীবনে কখনও কোন অন্যায় করিনি, কারুর তোষামোদও করিনি। চাকরীতে সেইজন্য উন্নতি হল না। তোমাকেও এই পথে ধরে চলতে হবে। দিবাকর তোমার প্রতি যে অন্যায় করেছে, সেই অন্যায় শতগুণে ফিরে যাবে তার উপর। অধর্ম্ম পৃথিবীতে জয়ী হয় বটে, কিন্তু এ জয় চিরস্থায়ী নয়। বিয়ে তোমার আমি আর দেব না, চেষ্টাও করব না। কারণ জেনেশুনে অন্য লোককে আমি ঠকাতে পারব না। একমাত্র দিবাকরই তোমার স্বামী হবার অধিকারী।

কিন্তু এদেশে নিঃসঙ্গ নারীর পথ বড় পিছল, কাজেই ভবিষ্যতের একটা ভাল পথ তুমি বেছে নাও।

পরেশবাবুর বক্তৃতাদানকালে শিবানী ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছিল, কাত্যায়নীর চোখও শুষ্ক ছিল না।

কোন রকমে কান্না থামিয়ে শিবানী বলল,—আমিও তাই ঠিক করেছি, বাবা। অশোকদাকে সেদিন বলেছি একটা চরকা পাঠিয়ে দিতে।

কাত্যায়নী বললে,—চরকা দিয়ে কি আর মেয়েমানুষের জীবন কাটাতে পারে? তার চেয়ে অশোককে হাত চেপে ধর, সব শুনলে তার মত ছেলে রাজী না হয়ে পারবে না।

দৃঢ়স্বরে পরেশবাবু বললেন,—এখন আর তা সম্ভব নয়। অশোক রাজী হলেও আমি সম্মতি দেব না। এক বছর আগে অশোকের হাত চেপে আমি ধরেছিলাম শিবুকে বিয়ে করবার জন্য। সে সেদিন আমাকে প্রত্যাখ্যান করেছিল। সেদিন যা হত, আজ তা সম্ভব নয়। শিবুর এ অবস্থায় দিবাকর ছাড়া আর কেউ ওর স্বামী হবার যোগ্য নয়।

কাত্যায়নী এবার হাউহাউ করে কেঁদে ফেললেন। তাহলে ওর জীবনটা কি এইভাবেই যাবে! বয়স ওর এখনও কুড়ি পেরোয়নি। আমাদের অবর্ত্তমানে ওর কি দশা হবে!

—সে সম্বন্ধে আমি বরং অশোকের সঙ্গে পরামর্শ করতে পারি। সে ছাড়া আমাদের নির্ভরযোগ্য বন্ধু আর কোথায়? কালকের দিনটা দেখেই আমি হাতীগাঁয়ে ওর সঙ্গে দেখা করব। শুনতে পাই ওদের প্রতিষ্ঠানে অসহায় মেয়েদের সদ্‌ভাবে জীবনযাত্রার ব্যবস্থা আছে।

—অশোক সেদিন আমাদের হাতীগাঁয়ে যাবার নেমন্তন্ন করে গেছে। এখন তার প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক উৎসব চলেছে, ফাল্গুন মাসের গোড়ার দিকে চল সকলেই একদিন যাই।

ইতিমধ্যে কেহই লক্ষ্য করেনি শিবানী কখন সেখান থেকে উঠে গেছে। পরেশবাবু করুণস্বরে বললেন,—তুমিই বল, বিয়ে কি ওর আর কারুর সঙ্গে দেওয়া যায়? বিবাহ একটা যাজ্ঞিক ব্যাপার। কলঙ্কিত দেহ নিয়ে দেবতার কাছে দাঁড়ান যায় না। সে রকম ধরলে অশোক হয়ত রাজী হবে, কিন্তু আমি কর্ত্তব্যচ্যুত হতে পারব না. কান্নার সময় এখন নয়। সারজীবনই কাঁদতে হবে এই মেয়েকে নিয়ে। মৃত্যুর পরেও আমাদের আত্মা শান্তি পাবে না। কড়া কথা আমি ছেলেমেয়েদের কোন দিন বলিনি, আজও বলব না। ভগবানের ইচ্ছাই পূর্ণ হোক।

পরেশবাবু হঠাৎ চোখ বুজলেন, দুফোঁটা জল তাঁর কোলের উপর পড়ল।

কাত্যায়নী বললেন,—এদিকে তো তিন মাস হয়ে গেল। কলকাতা যাবার দিন ষ্টেশনে রায়গিন্নী বললেন,—তোমার মেয়ের চেহারা অমন ফ্যাকাশে হয়ে যাচ্ছে কেন? তারপর ঠাট্টা করে বললেন, ছেলেপিলে হবে নাকি।

—সে যা হয় বলুক। সমাজের বাইরে আমি বাস করি, তার সঙ্গে কোন সংস্রবও ভবিষ্যতে রাখব না।

—মিনুদের ভবিষ্যৎ দেখবে ভগবান, আমাদের কর্ত্তব্য শুধু হবে ওদের যথাসাধ্য মানুষ করে তোলা, আর দিবাকরের মত লোকদের হাত থেকে রক্ষা করা। টুকুর ভবিষ্যৎ দেখবে সন্তোষ মাষ্টার? হতভাগা ছেলে সেদিন আমাকে কি বললে জান! তুমি ব্যথা পাবে বলে এতদিন বলিনি আমি.

কাত্যায়নীর উৎসুক মুখের দিকে তাকিয়ে পরেশবাবু বললেন,—সে দিন সকালে দেখি ও ষ্টেশনে ঘুরে বেড়াচ্ছে কয়েকটি ছেলের সঙ্গে। আমার অপরাধের মধ্যে আমি বললাম, পড়ার সময় তুই এভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছিস? তোর না আজকাল পরীক্ষা? পাশ করতে না পারলে

কিন্তু আমার বাড়ীতে জায়গা হবে না। নিজের পথ তোমাকে নিজে দেখতে হবে। ছেলে আমার হাতমুখ নেড়ে উত্তর দিল,—আমাকে এ পৃথিবীতে আনবার জন্য আপনি দায়ী, অতএব আমাকে ভরণ পোষণ করতে আপনি বাধ্য।

কাত্যায়নী স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। যে টুকু সেদিন পর্য্যন্ত তাঁর কাছে রাত্রে শোয়ার জন্য বায়না করেছে, তার এ কী পরিবর্ত্তন! কাল-ধর্ম্মের প্রভাব এ যুগের ছেলেদের জীবনে কিভাবে বিস্তারিত হচ্ছে, টুকুর স্বল্পকালব্যাপী ছাত্র জীবন তারই প্রমাণ। কাত্যায়নী বললেন,—পরশু সে যাবে শহরে পরীক্ষা দিতে, তার আগে কিছু বলে দরকার নেই। পরীক্ষার পর আমিই তাকে বলে দেব, এবাড়ীতে তোমার স্থান হবে না।

—বলতে পারা বড় শক্ত গিন্নী! আমি নিজে তার প্রতি কঠোর হতে পারলাম না। শিবুকেও একটা কড়া কথা বলতে পারলাম না।

ঘুরে ফিরে শিবানীর প্রসঙ্গ চলে আসাতে কাত্যায়নী বললেন,—শিবুর কথা এখন বাদ দাও, নইলে মাথা খারাপ হয়ে যাবে। সব মেয়েরই তো আর বিয়ে হয় না। ওকে যদি লেখাপড়া শিখাতে পারতাম, তাহলে আর ভাবনা ছিল না।

এই কথাবার্ত্তার মাঝখানে ঘরে প্রবেশ করল টুকু। মাবাপের সামনে দাঁড়িয়ে বলল,—সন্তোষদা বললেন, বিছানাপত্তর ছাড়া সঙ্গে নিতে হবে পঞ্চাশ টাকা করে।

কাত্যায়নী বললেন,—অত টাকা কি হবে? তোর তো টিকিট করতে হবে না।

পরেশবাবু বললেন,—অত টাকা তোমাকে দেওয়া আমার ক্ষমতার বাইরে। তোমার শহরে থাকার কথা আট দিন। আট দিনে খরচ হতে পারে বড় জোর কুড়ি টাকা দেওয়াই আমার পক্ষে কষ্টকর।

টুকু বলল,—তবে আমি পরীক্ষা দিতে যাব না।

—দেওয়া না দেওয়া তুমি বুঝবে। তোমাকে পঞ্চাশ টাকা দেওয়া মানে সারা মাস আমাদের উপোস করে থাকা। কুড়ি টাকার বেশী এক পয়সাও আমি দিতে পারব না!

কাত্যায়নী বললেন,—লক্ষ্মী বাবা, এই টাকা নিয়েই ভালভাবে পরীক্ষা দিয়ে এস।

—তোমাদের আদরে দরকার নেই। মার্কস্ ঠিকই বলেছেন, এইসব বাপমাই দেশের পক্ষে ক্ষতিকর।

অনেক কষ্টে পরেশবাবু নিজেকে সংবরণ করলেন, কিন্তু তাঁর মুখ চোখ দেখে মনে হল কি একটা প্রচণ্ড আঘাত তিনি হঠাৎ পেলেন। কাত্যায়নী কিন্তু চুপ করে থাকতে পারলেন না? বললেন, যারা বলে বাপ-মা দেশের ক্ষতিকর তাদের কাছে যাও, কুড়ি টাকা কেন, এক পয়সাও পাবে না। পরীক্ষার দরকার নেই তোমার, লেখাপড়া যথেষ্ট হয়েছে।

টুকু যেভাবে এসেছিল, ঠিক সেইভাবেই বেরিয়ে গেল।

পরদিন পরেশবাবু ইচ্ছে করেই পোষ্টাপিসে গেলেন না, চিঠি থাকে তো বাড়ীতেই আসবে। সকালের প্যাসেঞ্জার বিদায় করে তিনি উঠব উঠব করছেন, এমন সময় দরজায় অনেকগুলি ছায়া পড়ল। সবিস্ময়ে পরেশবাবু তাকিয়ে দেখেন, অনেকগুলি ছেলে সঙ্গে নিয়ে সন্তোষমাষ্টার ঘরে ঢুকলেন।

কোনরূপ ভনিতা না করেই সন্তোষ বলল,—আপনারা নাকি আমাদের আপমান করেছেন?

পরেশবাবু বললেন,—এখবর আমার কাছে নতুন বটে, তা কোথা থেকে সংগ্রহ করলেন এই অভিনব সংবাদ? তাঁর কণ্ঠে একটু বিদ্রূপের আভাস ছিল

পাঞ্জাবীর আস্তিন গুটিয়ে সন্তোষ বলল,—জানতে আমাদের কিছু বাকী থাকে না পরেশবাবু। শুনবেন, কে বলেছে? বলেছে টুকু। ছেলের জন্য অর্থব্যয় করতে না পারেন তো ছেলেকে সংসারে আনেন কেন?

—সে কৈফিয়ৎ উনি আপনাকে দিতে প্রস্তুত নয়, কারণ ছেলেকে প্রতিপালনের জন্য উনি আপনার কাছে সাহায্য প্রার্থী কখনও হন নি। বলতে বলতে ঘরে প্রবেশ করল অশোক।

সন্তোষের এই অযথা ও আকস্মিক আক্রমণে পরেশবাবু দিশেহারা হয়ে পড়েছিলেন, অশোকের আবির্ভাব তাঁর দৈবপ্রেরিত মনে হল। তিনি সন্তোষকে বললেন,—আপনার সঙ্গে এব্যাপার নিয়ে বাগ্‌বিতণ্ডা করবার মত মনের অবস্থা এখন আমার নয়। ছেলে বাপের নামে নালিশ করছে পরের কাছে, এইটেই আমার কাছে মস্ত এক রহস্য মনে হচ্ছে।

সন্তোষ বলল, এরকম বেআইনি কাজ করে এদেশ বলেই বেঁচে গেলেন। রাশিয়াতে নিষ্ঠুর পিতামাতার হাত থেকে বাঁচানোর জন্য নানারকম আইন হয়েছে ছেলেমেয়েদের জন্য। সে দেশ হলে আপনাকে গুলি করে মারত।

পরেশবাবু কোন কথা বলতে পারলেন না, শুধু ঠক্‌ঠক্ কাঁপতে লাগলেন।

অশোক বলল,—রাশিয়াতে এমন কোন আইন আছে কিনা জানিনা যে, ছেলের নালিশে বাপকে গুলি করা হয়। তবে আপাততঃ আপনি একটি বেআইনি কাজ করে বসে আছেন। জোর করে ষ্টেশন ঘরে ঢুকে ষ্টেশনমাষ্টারকে শাসাচ্ছেন।

অশোকের কণ্ঠস্বরে আশ্বস্ত হয়ে পরেশবাবু চীৎকার করে পঙ্কুকে ডাকলেন।

সন্তোষ জিহ্বা প্রসারিত করে বলল,—পঞ্চুকে ডেকে কোন ফল হবে না মাষ্টার। তোমার ষ্টেশন এই মুহূর্ত্তে গুঁড়ো করে দিতে পরি, জান! কেউ ঠেকাতে পারবে না, তোমার অশোকও না। সন্তোষের সঙ্গী ছেলেরা সবাই আস্তিন গুটোচ্ছে, সন্তোষ হঠাৎ চীৎকার করে উঠল,—ষ্টেশন মাষ্টার! পনেরটি ছাত্র সমস্বরে কোরাস্ গেয়ে উঠল,—ধ্বংস হোক্! তারপর নানাবিধ শ্লোগ্যানের মধ্যে দলটি ষ্টেশন প্রাঙ্গণ ত্যাগ করল।

পরেশবাবু দুহাতে মুখ ঢেকে টুলের উপর বসে পড়লেন। বিস্মৃতির একটা ঘোর যেন তাঁকে আচ্ছন্ন করেছে। তিনি ভুলে গেছেন, আজ সাতাশে মাঘ, দিবাকরের চিঠি আসতেও পারে। কাত্যায়নী তাঁকে বলে দিয়েছিলেন সকাল সকাল বাড়ী ফিরতে, তাঁর কোন খেয়ালই নেই। পাশে দাড়িয়ে অশোক, তিনি তার অস্তিত্ব পর্য্যন্ত বিস্মৃত হয়েছেন।

সমবেদনার সুরে অশোক বলল,—চিন্তা করে লাভ নেই মাষ্টারমশায়। ঐ হল যুগের হাওয়া। ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠার আগে অধর্ম্মের দাপাদাপি খানিকটা দেখা যায়। এই অধর্ম্মকে ঠেকাতে হবে আমাদেরই, নিশ্চেষ্ট হলে চলবে না।

মুখ তুলে পরেশবাবু বললেন, সব সহ্য হয় অশোক, কিন্তু টুকু আমার নামে নালিশ করেছে নিঃসম্পর্কীয় এক ব্যক্তির কাছে!

—এতে আশ্চর্য্য হচ্ছেন কেন মাষ্টার মশায়? এই সেদিন কাগজে দেখলাম, কোন এক কলেজের ছাত্র অধ্যাপককে প্রহার করেছে। শনি যখন স্কন্ধে ভর করে, তার প্রকোপের পূর্ণ বিকাশ হবে তো!

অশোকের কথা শেষ হতেই এক বিরাট চীৎকারে দুজনে চমকে উঠলেন। ষ্টেশনের পাশের সড়ক দিয়ে এক শোভাযাত্রা এগিয়ে আসছে আর তার মধ্য থেকে ধ্বনি উঠছে, বাপ-মার জুলুম!—বন্ধ কর! পঞ্চাশ টাকা!—দিতে হবে! ইনক্লাব জিন্দাবাদ! ইত্যাদি। শোভাযাত্রার

পুরোভাগে লাল পতাকা হস্তে কয়েকটি কিশোর ছাত্র, আর মাঝখানে সন্তোষ পরিচালকের ভার গ্রহণ করেছে। ষ্টেশনের কাছাকাছি এসে ধ্বনির দমক সপ্তমে উঠল।

অশোক হেসে বলল,—মাষ্টার মাশায় আপনার একার নয়, গ্রামের কোন বাপমাই সম্ভবতঃ ছেলেকে এতটাকা দিতে রাজী হন নি আমাদের হাতীগাঁর একটি ছেলে পড়ে শক্তিপুর ইস্কুলে। দলের সঙ্গে না গিয়ে সে একা যাবে শহরে পরীক্ষা দিতে, বাড়ী থেকে যেতে মাত্র পনেরটি টাকা।

—কি এই যে এরকম হচ্ছে, এর জন্য দায়ী কে ?

—আমার মতে এর জন্য একভাগ দায়ী ছেলের বাপমা ও অভিভাবকরা, আর তিনভাগ দায়ী বিদ্যালয়ের মাষ্টারমশায়রা। একটা নমুনা দিই শুনুন। হাতীগাঁয়ে আসার আগে একটা ইস্কুলে মাষ্টারি করতাম আমি। একবার একটি ছাত্র আমার সন্মুখে হেড্‌মাষ্টারমশায়ের নামে অশিষ্ট মন্তব্য করতে আমি তাকে প্রহার করি। একটু পরেই দেখি সেই ছাত্রের মারফত খবর পেয়ে ছাত্রের অভিভাবক সমেত পাড়ার লোক স্কুল চড়াও করল। উদ্দেশ্য আমাকে প্রহার করা। শুনে আশ্চর্য্য হবেন, হেড্‌মাষ্টার কি অপর কোন শিক্ষক আমার পক্ষ অবলম্বন করতে সাহস করলেন না। পরে জানতে পারলাম, জনৈক শিক্ষকেরও নাকি এই ব্যাপারে উস্কানি ছিল। সেইদিনই সেখানকার কাজে ইস্তাফা দিয়ে চলে আসি আমি।

পরেশবাবু বললেন,—আজ আমি উঠি অশোক, বাড়ীতে কাজ আছে একটু।

কুণ্ঠিতভাবে অশোক বলল,—একটা কথা ছিল আপনার সঙ্গে, যদি—

অশোকের কুণ্ঠা ও ইতস্ততঃ ভাব দেখে পরেশবাবু বললেন,—আমার

কাছে বলতে বিন্দুমাত্র সঙ্কোচ করো না, সম্ভব হলে তোমাকে অদেয় আমার কিছুই নেই।

কম্পিত কণ্ঠে অশোক বলল,—এক বৎসর আগে আপনার একটি প্রস্তাব আমি প্রত্যাখ্যান করেছিলাম, আজ আমি নিজের থেকে সেই প্রস্তাব উত্থাপন করছি।

পরেশবাবুর বিস্ময়ের আর অবধি রহিল না। অশোকের মুখ রাঙা উঠেছে, তার চোখে মিনতি। তিনি ব্যাকুলভাবে বললেন,—আজ আর তা সম্ভব নয় অশোক। সেদিন যা অতি সহজে হতে পারত, আজ তা সম্পন্ন হওয়ার পথে বিরাট এক বাধা উপস্থিত হয়েছে।

অশোক ব্যগ্রভাবে বলল,—শিবানীর বিবাহ কি অন্যত্র স্থির করেছেন?

—ঠিক কিছুই হয় নি। যথাসময়ে জানতে পারবে সব। ফাল্গুন মাসের প্রথম সপ্তাহে তোমার ওখানে আমরা সকলেই যাব। অনেক পরামর্শও আছে তোমার সঙ্গে।

অশোক বলল,—হাতীগাঁয়ে যে কর্ম্মে আমি ব্রতী হয়েছি, তার মধ্যে সংসার ধর্ম্ম পালন করবার প্রশ্ন সাধারণতঃ ওঠে না। কিন্তু অনেক চিন্তার পরে দেখলাম, শিবানীর মত স্ত্রী আমার কাজে মস্ত সহায় হয়ে দাঁড়াতে পারে।

—বড় দেরীতে তুমি এলে অশোক! তিন মাস আগেও তুমি যদি শিবুকে বিয়ে করতে চাইতে, আমি সানন্দে সম্মত হতাম। যাক্, তোমার ওখানে আমরা তো যচ্ছি। আজ উঠি তাহলে।

অশোক প্রস্থান করলে পর পরেশবাবু কোয়ার্টার্সের দিকে চললেন। দিবাকরের চিঠি আসেনি নিশ্চয়, তাহলে খবর পেতেন। মিনু, ঝণ্টু এরা কয়েকবার ষ্টেশনঘরের জানালা দিয়ে উঁকি মেরে গেছে। বাড়ীতে ঢুকে দেখেন শিবানী রান্না করছে—আর কাত্যায়নী বারান্দায় বসে কি

ভাবছেন, তাঁর চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ছে। সামনে পড়ে একখানি হলুদ রঙের খাম। শিবানী যেন সাতাশে মাঘের অস্তিত্ব একেবারে ভুলে গেছে। সকাল সকাল স্নান করে ভিজা চুলে রান্নাঘরে ঢুকেছে, কোমরে কাপড় জড়িয়ে ভাতের ফ্যান গালছে। মুখে তার চিন্তার লেশ মাত্র নাই, তার তরুণ জীবনে যেন কোন রেখাপাত হয় নি।

বিস্মিতভাবে মেয়েকে নিরীক্ষণ করে পরেশবাবু দাঁড়ালেন কাত্যায়নীর সামনে। কাত্যায়নী শুধু পরেশবাবুকে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিলেন খামখানা। বুকপোষ্টে এসেছে, ভিতরে নিমন্ত্রণপত্র। পরেশবাবু পড়তে লাগলেন,—সবিনয় নিবেদন, ইত্যাদি। আগামী এগারোই ফাল্গুন আমার পৌত্রী রেণুর সহিত অমুকের পুত্র শ্রীমান দিবাকরের শুভবিবাহ মমালয়ে সুসম্পন্ন হইবে; অতএব মহাশয়, ইত্যাদি।

অনেক কষ্টে আত্মসংবরণ করে পরেশবাবু বললেন,—সব শেষ! ছেলে মেয়ে দুজনের জন্যই আজ বড় দাগা পেলাম।

স্ত্রীর উৎসুক দৃষ্টি অনুসরণ করে পরেশবাবু ধীরে ধীরে সেদিনকার কাহিনী বিবৃত করলেন। আড়চোখে একবার রান্নাঘরের দিকে তাকালেন। শিবানী সেইরকম কাজে ব্যস্ত। ভাতের ফেন গেলে কি একটা সাঁতলাচ্ছে। মা-বাপের কথোপকথনে কান দেওয়ার অবশ্যকতা তার যেন ফুরিয়ে গেছে। সর্ব্বশেষে পরেশবাবু অশোকের কথা উত্থাপন করলেন।

গালে হাত দিয়ে কাত্যায়নী বললেন,—সে নিজের থেকে শিবুকে বিয়ে করতে চাইল, আর তুমি তাকে ছেড়ে দিলে! অশোকের মত ছেলে তুমি আর কোথায় পাবে!

শিবানী রান্না করতে করতে হঠাৎ চঞ্চল হয়ে উঠল, এবং বারান্দার দিকে কান রেখে ঝোল চড়িয়ে দিল।

কাত্যায়নী আবার বললেন,—এ যে ভগবানের আশীর্ব্বাদ! অশোক

নিজে এই প্রস্তাব করবে, আমি কোনদিনই ভাবিনি। আহা, আর তিন মাস আগে যদি সে আসত!

—অদৃষ্টে দুঃখ থাকলে কেউ খণ্ডাতে পারে না গিন্নী। এ অবস্থায় অশোককে মেয়ে দিতে আমি তো কিছুতেই রাজী হতে পারি নে। সব জেনেশুনে অশোক স্বেচ্ছায় ওকে বিয়ে করে তো আমি বাধা দেব না। হাতীগাঁয়ে যাচ্ছি তো সকলেই একদিন, একটা মীমাংসা সেইদিন হবে।

সেরাত্রে সকলে ঘুমিয়ে পড়লে পর শিবানী চুপি চুপি রান্নাঘরের বারান্দায় এসে বসল। সেদিন এখান থেকেই অশোককে ডেকেছিল! বারান্দার এক কোণে ক্যাত্যায়ণীর সযত্ন রচিত বরণডালা অবহেলায় পড়ে আছে শিবানী একবার সেদিকে তাকিয়ে রেললাইনের দিকে মুখ ফিরাল। দূরে কি একটা বাজনা বাজছে, বোধ হয় হাতীগাঁয়ের উৎসব-বাদ্য।

কলকাতায় ফিরে দিবাকর শিবানীর সঙ্গে তার মেলামেশার পরিণতি গভীরভাবে চিন্তা করল। গ্রাম্য পরিবেশে শিবানীকে তার মন্দ লাগেনি, কিন্তু বিলাতফেরতের স্ত্রীরূপে শিবানীকে সে কল্পনা করতে পারল না। ছায়াঢাকা শিবমন্দিরের পিছনেই যেন এ মেয়েকে ভাল মানায়, উজ্জ্বল ইলেকট্রিকের আলোয় সে হয়ে যায় নিষ্প্রভ। শিবানীর অশ্রুজলে বিচলিত হয়ে সে তাকে শক্তিপুরে একটা মৌখিক অঙ্গীকার মত করে এসেছিল বটে, কিন্তু শহরে ফিরে প্রতিজ্ঞা রক্ষা করতে তার মন সম্মত হল না। সে বিচার করে দেখল, শক্তিপুরে তার জীবনাঙ্ক অতি লঘু, যৌবনবয়সে সকলেই ওরকম করে থাকে। বিলাতের বহু দৃষ্টান্ত তার মনে পড়ল, সে সব মেয়ের কি আর বিয়ে হয় না! সে নিজেও বিলাতে কিছু একটা সাধু জীবন যাপন করে আসেনি। মিস্ কেলীর কথা তার মনে হল। ইষ্ট এণ্ডের একটা রেস্তোঁরায় কাজ করত মেয়েটা. তার গোটা চারেক সন্তান, কোনটিরই বাপের ঠিক নেই। একটি তার নিজের হলেও হতে পারে। সেই মিস্ কেলীর একদিন বিয়ে হয়ে গেল,

চারটি সন্তান নিয়ে সে স্বামীর ঘর করতে গেল। শিবানীর গর্ভস্থ সন্তান সম্বন্ধে দিবাকর মোটেই মাথা ঘামাল না।

হোটেলে পরেশবাবুর চিঠিও সে যথাসময়ে পেল। চিঠি ওয়েষ্ট পেপার বাস্কেটে নিক্ষেপ করে সে ঠিকানা পরিবর্ত্তন করল। এবার আর বিলাতী হোটেলে নয়, এক দেশী হোটেলে আস্তানা পাতল দিবাকর। সায়েবী পোষাক ছেড়ে ধুতি পাঞ্জাবী পরে সে একদিন হাজির হল শিবেনবাবুর বাড়ী। বৈঠকখানায় উপস্থিত ছিলেন মুকুন্দরায়, রায়গিন্নী ও মালিনী।

মালিনী বলল,—এটা কিন্তু ভাল করলেন না মিঃ সেন, সায়েবী পোষাকেই আপনাকে ভাল মানাত। এ পোষাকে আপনার ডাক্তারীতে পসার হবে না।

রায়গিন্নী বললেন,—এই ভাল করেছ দিবু, বিয়ের বরকে কি আর কোট পেণ্টুলুনে মানায়!

মুকুন্দরায় মন্তব্য করলেন,—এখন এ বেশ থাকলেও প্র্যাকটিসের সময় তোমাকে ধরাচূড়া পরতে হবে দিবু। তোমার হোটেলের বেয়ারারা তো ধুতিপরা লোক দেখলে আমলই করে না। তুমি যখন শক্তিপুরে ছিলে, আমাদের কতদিন ভুগতে হয়েছে।

দিবাকর বলল,—আপনাদের সকলের কথার উত্তর একসঙ্গে দিচ্ছি। প্রথমতঃ আমি সায়েবী পোষাক আর পরব না ঠিক করেছি, দ্বিতীয়তঃ সে হোটেলে বাস উঠিয়ে আমি এখন আছি এক খাঁটি স্বদেশী হোটেলে।

দিবাকরের কথা শিবেনবাবুর বৈঠকখানায় যেন একটা পটকা নিক্ষেপ করল! সকলেই চকিত, সন্ত্রস্ত। শুধু রায়গিন্নী খানিকটা সামলে নিয়ে বললেন,—তা বেশ করেছ দিবু, তোমার ও সায়েবী হোটেলে যাতায়াত আমার পোষায় না।

বিদ্রুপহাস্যে মালিনী বলল—এবার তাহলে এক কাজ করুন।

তল্পীতল্পা গুটিয়ে কলকাতা ছেড়ে শক্তিপুরে গিয়ে আড্ডা গাড়ুন। সেখানে শুনেছি এক পল্লীপ্রতিষ্ঠান আছে, তাদের সঙ্গে আপনার মানাবে ভলে।

মুকুন্দরায় বললেন,—ছেলেমানুষী করো না দিবু। চিরজীবন তোমাকে তো হোটেলে কাটাতে হবে না! শিবেন তোমার জন্য এক বাড়ী ঠিক করে রেখেছে এই পাড়াতেই। রেণু দেখেছে সে বাড়ী, ভারী পছন্দ হয়েছে তার। বিয়ের পরই ও বাড়ী তোমার হবে। বিয়েতে যৌতুকস্বরূপ বাড়ীটা আমি তোমাদের দান করছি।

দিবাকর বলল,—আপনার আদেশ আমার শিরোধার্য্য। ব্যবসার খাতিরে সায়েবী পোষাক পরা না হয় চলতে পারে, কিন্তু অন্য সব ব্যাপারে দেশী পোষাকেই খাতির বেশী। বিলেত থাকতেও আমরা কয়েকটি ছাত্র মাঝে মাঝে ধুতি পাঞ্জাবী পরতাম, এবং আমাদের প্ল্যান ছিল, দেশে ফিরে অন্ততঃ একমাস করে গ্রামসেবা করব।

মালিনী বলল,—সে একমাস তো আপনার হয়ে গেছে। গ্রামের প্রতি ভালবাসায় মুগ্ধ হয়ে জাহাজ থেকে নেমেই ছুটেছিলেন শক্তিপুরের দিকে। সেখানে কি সেবা করলেন, আমাদের একটু নমুনা বলুন না?

দিবাকরের বুকের মধ্যে হঠাৎ ধক্ করে উঠল। মালিনী কি সব জানে! কিন্তু না, সন্দেহের কোন কারণ নেই। মালিনী সরল বিশ্বাসেই কথাটা জিজ্ঞাসা করেছে। এবারে কিন্তু শক্তিপুরের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করতে দিবাকর বিশেষ উৎসাহ বোধ করল না। পরেশবাবুদের কথা সংক্ষেপে বলে সে সন্তোষ মাষ্টারের প্রসঙ্গ উত্থাপন করল। সন্তোষ ইতিহাসের মাষ্টার, কিন্তু তার ছাত্রেরা মহাভারতের গল্প জানে না, অথচ মার্কসের বাপ-ঠাকুর্দ্দার নাম গড়গড় করে বলে যেতে পারে

মালিনী বলল,—সন্তোষবাবুর বিরুদ্ধে এ অভিযোগ অবশ্য খুব গুরুতর নয়। আচ্ছা মানলাম না হয় ভীষ্ম যুধিষ্ঠির ইত্যাদির সম্বন্ধে না জানা অন্যায়, কিন্তু যারা জানে তারা এদের অনুসরণ করে কি?

দিবাকর হঠাৎ অত্যন্ত লজ্জা অনুভব করল, শক্তিপুরে ভীষ্মের সংযমের পরিচয় সে নিশ্চয়ই দেয় নি।

উৎসাহিত হলেন মুকুন্দ রায়। বললেন,—শুধু ইস্কুলের সেক্রেটারী হতে দাও, তারপর সন্তোষ মাষ্টার কেন,.অনেক মাষ্টারকেই বিদায় নিতে হবে। গ্রামের ছেলেগুলো উৎসন্নে গেল। দোষ হেড্‌মাষ্টারের, সে কন্‌ট্রোল করতে পারে না।

মালিনী বলল,—আপনারা সেকেলে লোক, তাই ছেলেমেয়েদের একটু প্রোগ্রেসিভ হতে দেখলেই মাথা খারাপ করে বসেন। আপনার মহাভারতীয় যুগ কেটে গেছে মিঃ সেন, এটা মার্কসীয় যুগ।

মুকুন্দ রায় অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে বললেন,—এবং এই যুগের মহিমায় তোমার মার্কসের ধ্বজাধারী যদি ঘুষখোর ও মিথ্যাবাদী হয়, তাহলে এ যুগকে শতবার নমস্কার করে আমি সেই পুরাতন যুগেই ফিরে যেতে চাই।

—কিন্তু পিসেমশায়, ঘুষ নেওয়া ও মিথ্যাকথা বলাই জীবনে সব নয়। অনেক বড় কাজও এরা করতে পারে।

দিবাকর বলল,—আজ কাল আপনারাও দেখছি এ বিষয়ে পড়াশুনা করছেন!...

—শুধু আমি একা নয় মিঃ সেন, আপনার ভাবী পত্নীরও এ বিষয়েএ ঢের পড়াশুনা আছে। আজকাল শিক্ষিত মেয়েদের মধ্যে শতকরা নব্বই জন মার্কস-বাদী অর্থাৎ প্রোগ্রেসিভ। পুরুষদের চেয়ে মেয়েরা আজকাল অনেক দূর এগিয়েছে।

রায়গিন্নী এই সব অবোধ্য কথাবার্ত্তা হাঁ করে শুনছিলেন। এইবার বললেন,—তা মেয়েরা কি হিসেবে অনেকদূর এগিয়েছে?

—ওসব তুমি বুঝবে না পিসীমা। তোমার নাতনীই তার প্রমাণ। শক্তিপুরে থাকলে কি আর সে বাইরের জগতের সঙ্গে এরকম স্বচ্ছন্দে

মেলামেশা করতে পারত? তুমি এখনও লোকের সঙ্গে কথা বল ঘোমটা দিয়ে, আর আমাদের সঙ্গে কথা বলতে পুরুষরাই সঙ্কোচ বোধ করে।

মুকুন্দরায় হেসে বললেন,—হ্যাঁ, প্রোগ্রেসের এ একটা দিক বটে!

দিবাকর বলল,—অবশ্য মেয়েদের খানিকটা ফ্রি হওয়া দরকার, তবে মার্কসীয় মতে নয়। স্ত্রী-স্বাধীনতার দেশ থেকে ঘুরে এলাম তো, ওদেশে মেয়েরা এ ব্যাপার সম্পূর্ণ পৃথকভাবে গ্রহণ করেছে।

—কিন্তু, মিঃ সেন, আপনার কাছ থেকে এরকম মন্তব্য আশা করি নি! বলতে বলতে দ্বারপথে প্রবেশ করল্ রেণু্ সঙ্গে সুশান্ত ও সন্তোষ।

রেণু্ বলল,—সন্তোষদার কাছে আপনার অনেক খবর পেলাম মিঃ সেন, আপনি নাকি মার্কসিজমের বিরোধী?

রেণুর কথার সুরে ও ভঙ্গীতে একটু দূরত্বের আভাস পাওয়া গেল। সন্ত্রস্ত হয়ে দিবাকর বলল,—তা তোমরা সবাই যদি পক্ষে থাক, আমি একা আর বিপক্ষে যাই কি করে বল! তোমার যা মত, আমারও তাই।

সন্তোষের এই আকস্মিক আবির্ভাবে মুকুন্দরায় বিশেষ প্রীত হন নি, কিন্তু শক্তিপুর স্কুলের সেক্রেটারী নির্ব্বাচন স্মরণ করে সন্তোষকে অসন্তুষ্ট করতে সাহস করলেন না। বললেন, আমি আর তাহলে দলের বাইরে থাকি কেন? আমিও এই দলে। গিন্নী, তুমি? রায়গিন্নী কথা বললেন না, মাথায় কাপড় দিয়ে বাড়ীর ভিতর চলে গেলেন।

মালিনী বলল,—পিসীমা মহাভারতের দলে। যাক্, আপনি বুদ্ধিমানের মত কাজ করেছেন, মিঃ সেন। স্বামী-স্ত্রীর ভিন্ন মত হলে বিবাহিত জীবন সুখের হয় না। আজকাল হাজ্ব্যাণ্ড ওয়াইফ দুজনকেই হতে হবে হয় মার্কসীয় আর না হয় মহাভারতীয়।

মুকুন্দরায়ের ইচ্ছা করছিল, মালিনীর জিভটা টেনে ছিঁড়ে ফেলেন ; কিন্তু অনেক কষ্টে কাষ্ঠহাসি হেসে বললেন,—তাহলে তো তোমার পিসীমাকে ডিভোর্স করতে হয় আমার।

রেণু বলল,—তোমাদের এখন তিন কাল গিয়ে এক কাল ঠেকেছে। এসব কথা হচ্ছে একালের তরুণ তরুণীদের নিয়ে।

সুশান্ত একটা সোফায় বসেছিল একেবারে মালিনীর গা ঘেঁসে সে হঠাৎ গুন্‌গুন্ করে গান ধরল,—'হে তরুণ, হে তরুণ.... !'

রেণু বলল,—সুশান্তদার গলাটি ভারি মিষ্টি, অথচ আপনি শুধু আমার গানের প্রশংসা করেন !

দিবাকর বলল,—কিন্তু এ গানের অর্থ কি ?

তার দিকে বিরক্তির সঙ্গে তাকিয়ে রেণু বলল,—দেখ, যে বিষয়ে তোমার জ্ঞান নেই, তার মধ্যে মাথা গলিও না। আধুনিক গানের আবার অর্থের কি প্রয়োজন ? একটা সুর হলেই হল। সুশান্তদা কি সন্তোষদার রোগ হলে তুমি যখন চিকিৎসা করবে, সেখানে কেউ অনধিকার চর্চা করতে যাবে না।

একটু অসন্তোষের সঙ্গে মুকুন্দরায় বললেন,—এসব বাজে কথা এখন থাক্, কাজের কথা কিছু হোক্। তারপর, সন্তোষ, তুমি কবে এলে এখানে ? এদের সঙ্গে দেখা হল কোথায় ?

সন্তোষ উত্তর দেওয়ার পূর্ব্বেই সুশান্ত বলল,—সন্তোষ তো আমাদের বহুদিনের পরিচিত, রায়মশায়। জাগরণী ক্লাবের একজন লাইফমেম্বার। অবশ্য কিছুদিন ওকে বাইরে থাকতে হচ্ছে পার্টির কাজে। ওদের পার্টির ও হল বেশ একজন উৎসাহী অরগ্যানাইজার। ও এসেছে ক্লাবের সাম্প্রতিক উৎসব উপলক্ষে।

সন্তোষ বলল,—সুশান্তর কথার সঙ্গে আমি একটু যোগ করে দি। আর একটি কাজে এসেছি, স্কুলের পরীক্ষার্থী ছাত্রদের নিয়ে।

মুকুন্দরায় বললেন,—ছেলেরা সব আছে কোথায়? চেনাশুনা আছে নাকি কেউ?

তাচ্ছিল্যভরে সন্তোষ বলল,—যত সব ভ্যাগ্যাবণ্ডের দল। এক পয়সার মুরোদ নেই পরীক্ষা দিতে আসে কলকাতার মত শহরে! একটা ভাল জামা কাপড় পর্য্যন্ত কেউ পরে আসে নি।

—তাদের জায়গা দিলে কোথায়?

—তুললাম ঠেলে পার্টি আফিসে, এক কোণে রয়েছে সব গাদাগাদি হয়ে।

বিদ্রূপহাস্যে দিবাকর বলল,—আপনার ছাত্রপ্রীতি অসাধারণ সন্তোষবাবু। এদেরই না আপনি শক্তিপুরে নানারকম প্রশ্রয়দানে আপ্যায়িত করতেন?

হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে রেণু বলল,—সন্তোষদার কাজের সমালোচনা করবার মত যোগ্যতা আপনি এখনও অর্জন করেন নি, মিঃ সেন। নিজের গণ্ডীর বাইরে যাবেন না।

মুকুন্দরায়ও বললেন,—এ তোমার অন্যায় দিবু। সন্তোষ তার ছাত্রদের জন্য যা করেছে, খুব কম মাষ্টারই সেরকম করে। কার গরজ আছে বলতো কলকাতার মত জায়গায় ছাত্রদের নিখরচে থাকার ব্যবস্থা করে দেয়।

মরিয়া হয়ে দিবাকর বলল,—দেখুন মিস্ রায়, আপনার কথা শিষ্টতার মাত্রা ছাড়িয়ে যাচ্ছে। আপনাকে আমি মনে করিয়ে দিতে চাই যে, আপনার সঙ্গে এখনও আমার অনাত্মীয় সম্বন্ধই আছে। আর রায় মশায়, আপনাকে আর কি বলব, স্কুলের সেক্রেটারী হবার মোহে আপনি যাকে তাকে খোসামোদ করতে পারেন। আমি চললাম, আপনাদের এই আসরে থাকার মত যোগ্যতা সত্যিই আমার নেই।

দিবাকরের প্রস্থানের পরে সকলে স্তম্ভিত হয়ে বসে থাকল

খানিকক্ষণ। তার মত শান্তপ্রকৃতির লোক যে হঠাৎ এই মূর্ত্তি ধারণ করতে পারে, তা রেণু অথবা মুকুন্দ রায় কখনও কল্পনা করেন নি। নীরবতা ভঙ্গ করলে সন্তোষ। বলল,—মুকুন্দবাবুর নাত জামাইটি খাসা হবে। বিলেতফেরত বলে মনে হয় না।

সন্তোষের কথা শেষ হতেই পরদা সরিয়ে ঘরে পুনঃ প্রবেশ করলেন রায়গিন্নী। দৃঢ় স্বরে বললেন,—আমার নাত জামাই কি-রকম হবে, সে কথা আলোচনার স্থান এ বাড়ীর বাইরে। রায় মশায়ের দিকে তাকিয়ে বললেন,—তোমার লজ্জা করে না, এইসব গোঁপ কামানো ছোঁড়াদের সঙ্গে ইয়ার্কি দিতে! রেণু ও মালিনীর উদ্দেশে বললেন,—তোমরা এখানে কি করচো এতক্ষণ! মেয়েমানুষের পুরুষের সঙ্গে অত ঢলাঢলি ভাল নয়। আমি এই বলে দিলাম রেণু, বিয়ের আগে তুমি আর জাগরণী ক্লাবে যেতে পাবে না। দিবুকে তুমি আজ যে অপমান খামাকা করেচ, আগেকার দিন হলে তোমার হাড় আর আস্ত থাকত না।

সকলে নিঃশ্বাস বন্ধ করে শুনেছিল রায়গিন্নীর কথা। রায় গিন্নীর মাথার কাপড় ঈষৎ সরে গেছে, চোখে শাণিত ক্রুদ্ধ দৃষ্টি যেন ঘরের সকলকে যুদ্ধার্থ আহ্বান জানাচ্ছে। সুশান্ত ও সন্তোষ তাঁর মুখের দিকে একবার তাকিয়ে ঘর ছেড়ে সোজা রাস্তায় নেমে পড়ল। রায়মশায় স্ত্রীর ভৈরবী মূর্ত্তি দেখে হাত কচলাতে লাগলেন, আর রেণু কেঁদে ফেলল।

রায়গিন্নী বললেন,—পরদার আড়ালে দাঁড়িয়ে সব শুনছিলাম আমি। দিবু ঠিক বলেছে, ওই সন্তোষ ছোঁড়া লোক ভাল না। শক্তিপুর থাকতে ওর নামে অনেক কিছু শুনেছি।

মুকুন্দ রায় বললেন,—কাজটা কি ঠিক হল। হাজার হলেও ওরা বাড়ীতে এসেছে, এ একরকম অপমান করে তাড়িয়ে দেওয়া হল।

—থাম তুমি। ওদের অপমান বড়, না বাড়ীর জামাইয়ের অপমান বড়? ওরা কেন এখানে আসে তাকি আমি বুঝিনে? এই দুই ছুঁড়ি

থাকে সেজেগুজে, তাই ওরা আসে। ওদের কি বলে, মার্কসের নিকুচি করেচি!

মালিনী ও রেণু এই মহাভারতীয় প্রতাপের কাছে পরাজিত হয়ে বাড়ীর ভিতরে প্রস্থান করল। মুকুন্দরায় বললে,—দিবুর ওপর ভারী অন্যায় হয়ে গেছে।

—এতক্ষণে বুঝি হুঁস হল! বিয়ের আর মোটে পনের দিন দেরী সে খেয়াল তোমাদের আছে! চল এখন তাকে খোসামোদ করিগে তাকে। তার এই নতুন হোটেলের ঠিকানা রেখেছ তো?

—তাই তো! মস্ত ভুল হয়ে গেছে গিন্নী।

—সব্বোনাশ হয়েছে! সে যদি আর না আসে। এ কলকাতা শহরে তাকে খুঁজে বের করবে কে?

—তুমি পাগল হয়েছ গিন্নী! তার বিয়ে ঠিক, নেমন্তন্ন পর্য্যন্ত ছাপান হয়েছে, আর সে আসবে না?

—না বাপু, এসব বিয়েশিয়ের ব্যাপার, তুহাত এক না হলে বিশ্বাস নেই। আর দিবু বিলেতফেরত হলে হবে কি! সংসারের জ্ঞান ওর এতটুকুও নেই। ওর যে রকম অপমান হয়েছে, ও নিজে থেকে এ বাড়ীতে আর আসবে না' আর যে রকম খেয়ালী মানুষ, হয়তো শক্তিপুরের পরেশ মাষ্টারের মেয়েকে বিয়ে করে বসবে।

—এ তোমার অন্যায় ধারণা গিন্নী। আমি বলে দিলাম, ঠিকানা যখন দিয়ে যায় নি, দিবু যে কোন উপায়ে হোক ঠিকানা আমাদের জানাবে! হয় সে কাল নিজে আসবে, নয় তো চিঠি লিখবে। পরেশ মাষ্টার ফাষ্টার বাদ দাও, ওদের সামাজিক স্থান দিবুর চেয়ে কত নীচে!

—একেবারে বাদ দেওয়া চলতে পারে না। দেখ না, দিবু সময়ে অসময়ে ওদের কি রকম সুখ্যাতি করে এখনও। সুখ্যাতিটা ঠিক মাষ্টার আর তার বউ এর নয়, ওটা হল ওদের বড় মেয়ে শিবানীর।

একজন যুবক অকারণে কোন পরিবারের সুখ্যাতি করে না, যদি না তাদের বাড়ীতে বয়স্থা মেয়ে থাকে। দিবু ওই যে একমাস শক্তিপুরে থেকে এল, সে কার জন্য? আমার তো মনে হয় পরেশের মেয়ের উপর ওর খানিকটা টান আছে।

মুকুন্দ রায় গৃহিনীর এই বক্তৃতার তোড়ে তাঁর বক্তব্য প্রকাশ করতে আর সাহস করলেন না। শুধু মনে মনে ঠিক করে রাখলেন, বিলেত ফেরত ডাক্তার দিবাকর কখনও এক পাড়াগাঁয়ের মেয়েকে বিবাহ করবে না। কিন্তু এ অবস্থায় একজন পরামর্শদাতা দরকার। গৃহস্বামী শিবেনবাবু অনুপস্থিত, সেদিন সকালে রঁাচী গেছেন মোটরে। ফিরবেন দিন দশেক পরে। বলে গেলেন, বিয়ের আগে একটু চাঙ্গা হয়ে আসা দরকার। সুতরাং পরামর্শদাত্রী হিসাবে গৃহিণীর আজ্ঞাই শিরোধার্য্য করতে হবে।

গৃহিণীকে কি একটা বলতে গিয়ে রায়মশায় দেখেন তিনি প্রস্থান করেছেন। রায়মশায় একটু ক্ষুণ্ণ হলেন। গৃহিণীর অন্ততঃ বলে যাওয়া উচিত ছিল। এতদিন শহরে বাস করেও তিনি আদব কায়দা ঠিক কায়দা করতে পারেন নি। রায়মশায়ও বাড়ীর ভিতরে যাওয়ার উদ্যোগ করছেন, এমন সময় বেয়ারা এসে খবর দিল একটি ছেলে দেখা করতে চায়। একটু বিস্মিত হলেন তিনি, তাঁর সঙ্গে এই বিদেশে দেখা করতে চায় কে? শক্তিপুরে অবশ্য তাঁর বৈঠকখানায় জন সমাগম এক রকম প্রাত্যহিক ব্যাপার ছিল। রায়মশায় বেয়ারাকে সম্মতিসূচক ইসারা করে একটু ভব্যযুক্ত হয়ে বসলেন।

বেয়ারা একটি কিশোর বালককে ঘরে পৌছে দিয়ে প্রস্থান করল। রায়মশায় একবার তাকালেন ছেলেটির দিকে, কিন্তু চিনতে পারলেন না। ছেলেটি তাঁর দিকে এগিয়ে এসে মৃদুকণ্ঠে বলল,—সেক্রেটারী বাবু!

রায়মশায়ের মুখ দিয়ে স্বগতোক্তির মত বেরিয়ে এল,—তুমি শক্তিপুর থেকে আসচ ?

ছেলেটি সোৎসাহে বলল,—আজ্ঞে হ্যাঁ, অশোকদা, এই চিঠি দিয়েছেন !

রায়মশায় চিঠি হস্তগত করে বললেন,—বস, বস, তুমি নিশ্চয় পরীক্ষা দিতে এখানে এসেছ ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—সন্তোষের পার্টির আপিসেই আছ তো ?

—আজ্ঞে না, আমি ওঁদের সঙ্গে আসি নি, আমি উঠেছি অন্য জায়গায়।

—তুমি হঠাৎ দলছাড়া হলে যে !

—সন্তোষবাবুর সঙ্গে যারা এসেছে, তাদের টাকা লেগেছে অনেক বেশী ! এক একটি ছেলে তিরিশ চল্লিশ টাকা করে সন্তোষবাবুকে দিয়েছে, কুড়ি টাকার কম কেউ নয় ! অবশ্য সন্তোষবাবু বলেছেন, ওদের থাকা খাওয়ার ভাল ব্যবস্থা করবেন। আমাকে অশোকদা দিলেন দশটি টাকা, আর টাকার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন আমাদের গ্রামের এক ভদ্রলোকের মেসে।

মুকুন্দরায় বললেন,—বাপু হে, তোমার কথায় মনে হচ্ছে, এ ব্যবস্থায় তুমি যেন একটু ক্ষুণ্ণ হয়েছে। কিন্তু আমি যতদূর জানি, মনে হয় তুমিই সব চেয়ে ভাল আছ। তা অশোকের তুমি কি আত্মীয় ?

—আজ্ঞে না, আমরা দোসাদ। অশোকদা আমাকে লেখাপড়া শেখাচ্ছেন ছেলেবেলা থেকে আমাদের ওই হাতীগাঁয়ে। আমার বাপ ঐ কলিয়ারীতে কাজ করে।

ছেলেটির কুল পরিচয় শুনে মুকুন্দরায় সঙ্কুচিত হলেন। আর একবার বিশেষজ্ঞের দৃষ্টিতে তাকালেন তার দিকে। দিব্যি শান্ত নম্র চেহারা,

অশিক্ষার ছাপ কোথাও নেই, তবুও সংস্কারের মোহ রায় মশায় কাটিয়ে উঠতে পারলেন না। তিনি শুধু বললেন,—আচ্ছা, তুমি এখন এস। একবার ইচ্ছা হল বলেন, পরীক্ষার পর একবার এসে দেখা করে যেও, কিন্তু কথাটা যেন মুখে আটকে গেল।

ছেলেটি বলল,—অশোকদা বলেছেন চিঠির উত্তর নিয়ে যেতে। আর একদিন—

—না, না, তুমি আর কষ্ট করে কেন আসবে! উত্তর আমি তাকে পাঠাব।

ছেলেটি যাওয়ার পর রায় মশায়ের মনে বড় অস্বস্তি বোধ করতে লাগলেন। দেশের ছেলে, তার সঙ্গে আরও খানিকটা গল্প করা তাঁর উচিত ছিল। অনেক খবর তিনি সংগ্রহ করতে পারতেন। কিন্তু ওই দোসাদ শুনেই তাঁর মন যেন বিদ্রোহী হয়ে উঠেছিল। ছেলেটি অশোকের আশ্রিত, অশোক নিশ্চয়ই তাকে ঘৃণা করেনা। পরম সমাদরে ছেলেটিকে সে আপন করে নিয়েছে। একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করে মুকুন্দরায় অশোকের চিঠি খুললেন। ছোট চিঠি, কিন্তু এর মধ্যেই অশোক তাঁর প্রয়োজনীয় সংবাদ জানিয়েছে।—শ্রীচরণেষু, আমার পরম স্নেহাস্পদ শ্রীমান গৌরহরি দাসের মারফত এই চিঠি পাঠালাম! এবার স্কুলের সেক্রেটারী হওয়া আপনার পক্ষে দুরূহ। বিরাজবাবুর পক্ষ থেকে প্রবল প্রচার কার্য্য চালান হচ্ছে। বিবাহ ব্যাপার সমাধা করে যথা সম্ভব শীঘ্র আপনার শক্তিপুরে চলে আসাই মঙ্গল। হাতীগাঁয়ের ভোট সম্বন্ধে আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। কিন্তু অভিভাবকদের সংখ্যা এখানে কম, শক্তিপুরেই বেশী। বিরাজবাবু নির্ভর করছেন শক্তিপুরের উপর। ইতি।

মুকুন্দরায় তখনি অশোকের চিঠির উত্তর দিতে বসলেন। সন্তোষকে পাঁচশো টাকা দেওয়া নিষ্ফল হয়েছে। অশোক অবশ্য লেখেনি বিরাজ

বাবুর পক্ষে প্রচার কার্য্য চালনা করছে কে ! কিন্তু এই নাটকের প্রধান অভিনেতা যে সন্তোষ, এ বিষয়ে তাঁর আর বিন্দুমাত্র সন্দেহ থাকল না।

দিবাকর তার হোটেলের ঘরে একাকী বসেছিল। আজ দুদিন হল সে রেণুদের বাড়ী যায় নি। নানা কারণে তার মন অতি চঞ্চল। সে শিবানীর কথা অনেক চিন্তা করেছে, এবং তার অনেকবার ইচ্ছা হয়েছে শক্তিপুরে গিয়ে শিবানাকে বিয়ে করে আসতে। রেণুর উপর তাহলে উপযুক্ত প্রতিশোধ নেওয়া হয়। কিন্তু ইচ্ছাকে কাজে পরিণত করতে সে পারেনি। কোথায় যেন একটা বিরাট বাধা ব্যবধান সৃষ্টি করছে। শিবানীর সঙ্গে মেলামেশা চলতে পারে, কিন্তু তাকে মিসেস রায়ের মর্য্যাদা দেওয়া সম্ভব নয়। মিসেস রায় হওয়ার যোগ্যতা একমাত্র রেণুরই আছে, কিন্তু তাদের মতবাদে ঐক্যের বন্ধন নেই। তার চিন্তাধারার সঙ্গে রেণুর চিন্তাধারার কোন মিল নেই। অবশ্য দুজনের মধ্যে বাহ্যিক ঐক্য যথেষ্ট আছে। বিলেত ফেরতের স্ত্রী হতে গেলে যে গুণ থাকা দরকার, রেণুর সেগুলি আছে পূর্ণমাত্রায়। শক্তিপুরের মেয়ে হলে হবে কি, অনেক অতি আধুনিক শহুরে মেয়েও রেণুর কাছে হার মানে! রেণুর কথাই বারবার মনে হতে লাগল দিবাকরের, শিবানী কোথায় চাপা পড়ে গেল।

দুদিন চিন্তার পর দিবাকর স্থির করল সে রেণুদের বাড়ী আবার যাবে। প্রথমে তার আশা ছিল যে তারা তার হোটেলে নিশ্চয় হানা দেবে, কিন্তু সে ভেবে দেখল তা সম্ভব নয়, কারণ তার ঠিকানা রায়দের অজ্ঞাত—। আজ সে ধুতি পাঞ্জাবী ত্যাগ করে গায়ে চড়াল সায়েবী পোষাক। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চুলে ব্যাকব্রাশ করছে, এমন সময় হোটেলের চাকর তার চিঠি দিয়ে গেল। অন্যমনস্ক ভাবে চিঠিগুলি দেখতে দেখতে একখানির প্রতি সে আকৃষ্ট হল। চিঠিখানি এসেছে বিলেত থেকে, হস্তাক্ষর অপরিচিত। কি এক অজানা আশঙ্কায় চঞ্চল

হয়ে উঠল সে, চিঠিখানি আগাগোড়া পড়ে কম্পিত কলেবরে সে চেয়ারে বসে পড়ল। চিঠিখানি এসেছে এক এটর্নীর কাছে থেকে। তাঁর মক্কেল মিসেস্ ক্লার্ক (পূর্ব্ব নাম মিস কেলী) মিঃ দিবাকর সেনের কাছে তাঁর তৃতীয় পুত্রের ভরণ পোষণের জন্য মাসিক কুড়ি পাউণ্ড দাবী করেছেন, যেহেতু এরূপ মনে করিবার কারণ আছে যে, উক্ত মিঃ দিবাকর সেন মিসেস্ ক্লার্ক (পূর্ব্বনাম মিস্ কেলী) এর কুমারী অবস্থায় তাঁর তৃতীয় পুত্রের জন্মদাতা, ইত্যাদি।

কী সাংঘাতিক এই ইংরেজের মেয়েগুলো! কোথায় এই মহালজ্জার কথা চেপে যাবে, তা নয় তো এই নিয়ে আন্দোলন করছে! দিবাকর হঠাৎ ঘোর ইংরাজ বিদ্বেষী হয়ে উঠিল। ওদের সঙ্গে দেশের সকল বন্ধন ছিন্ন করা উচিত। মিস্ কেলীর সঙ্গে সে দিন কয়েক স্ফূর্ত্তি করেছিল মাত্র। বিলেতে পড়তে গিয়ে অনেক ছাত্রই ও রকম করে থাকে। কিন্তু তার ফল যে এই রকম দাঁড়াবে সে ভাবেনি। শিবানীর তরফ থেকেও যদি এই রকম উকিলের চিঠি আসে! আশ্চর্য্য কিছুই নয়, এদেশের মেয়েরা আজকাল বিলেতের উপর দিয়ে যাচ্ছে। প্রমাণ রেণু, ভাবী স্বামীকে সে গ্রাহ্যই করে না। কিন্তু এই আড়াইশো টাকা মিস্ কেলীকে মাসে মাসে না পাঠালেই মুস্কিল। সব লোক জানতে পারবে, একটা মস্ত কলঙ্ক। রোজগার এখনও কিছুই হয়নি তার। সবেমাত্র এক হাসপাতালে চাকরী পেয়েছে, মাহিনার দিক দিয়ে বিশেষ সুবিধার নয়। তার সবটাই যাবে মিস্ কেলীর কাছে! ডাক্তারী ঠাট বজায় রাখতে হবে বাপের ব্যাঙ্কব্যাল্যান্স ভেঙ্গে। তারপর আছে শিবানী ঝান্নু ষ্টেশন মাষ্টারের মেয়ে, ওরা কি সহজে ছাড়বে! হঠাৎ পরেশবাবুর বাড়ীর সকলের উপরই দিবাকর বিষম বিরক্ত হয়ে উঠিল।

দরজা খোলার শব্দে চিন্তামগ্ন দিবাকর চমকে উঠল। চিঠিগুলো তাড়াতাড়ি লুকিয়ে ফেলতেই ঘরে প্রবেশ করলে মুকুন্দরায় স্বয়ং।

—বিলিতী কায়দা আর মানলাম না দিবু। চাকরের মুখে শুনলাম তুমি ঘরে আছ, অনুমতি না নিয়েই একেবারে ঘরে ঢুকলাম। একী! তোমাকে কি অসুখ করেছে? মুখচোখ শুকনো,—

দিবাকর তাড়াতাড়ি বলল,—ওকিছু নয়। আমার এখানকার ঠিকানা পেলেন কি করে?

—সে এক মস্ত ইতিহাস দিবু। ওরাও এখুনি এল বলে। কথাটা বুঝতে পারলে না বুঝি? ওরা অর্থাৎ তোমার দিদিমা, রেণু আর শিবেনের মেয়ে। ওরা আসার আগেই আমি শেষ করে নি। তুমি তো সেদিন সেই চলে গেলে, তারপর রেণুর কি কান্না! বোকা মেয়ে, তুমি উঠে যাওয়ার পর বুঝতে পারল কি অন্যায়টা করেছে। আমরা সকলে মিলে তার কান্না থামাতে পারিনে। শেষে তোমার হোটেলে যাওয়ার উদ্যোগ করছি, এমন সময় খেয়াল হল তোমার নতুন ঠিকানা জানিনে। ওঃ, এতদিন যা কেটেছে, কী এক দারুণ অশান্তিতে! রেণু খাওয়া দাওয়া ছেড়ে দিল, ক্লাবে, পার্টিতে যাওয়া তার সব বন্ধ। শেষে বিপদ থেকে উদ্ধার করল সন্তোষ। এর মধ্যে সে একদিন আমাদের এখানে গিছল ইস্কুলের কাজে, পেলাম তোমার হোটেলের ঠিকানা। সে নাকি এদিক দিয়ে যাওয়ার সময় একদিন দেখেছে তোমাকে এই হোটেলে।

দিবাকর বলল,—হ্যাঁ, একদিন তাঁকে দেখেছি বটে এই হোটেলেই; আমার আর আলাপ করবার প্রবৃত্তি হয়নি।

—আলাপ করবার মত লোকও সে নয়। সেদিন আমাদের সত্যি অন্যায় হয়েছে দিবু। সন্তোষ সম্বন্ধে তোমার ধারণাই ঠিক। তবে আমার কথা কি জান? তুমি ঘরের লোক, তোমাকে বলতে আপত্তি নেই।

—ব্যাপারটা আমিও কিছু কিছু জানি। শক্তিপুরে শুনে এসেছি। স্কুলের সেক্রেটারী ইলেকশন তো?

—হ্যাঁ, কিন্তু ইলেকশনের কলকাঠি ঐ সন্তোষের হাতে। ও যে কি করে এ ব্যাপারে এত সক্রিয় হয়ে উঠল, আমি কিছুতেই বুঝে উঠতে পারি নি। পাঁচশো টাকা আমি ওকে দিয়েছি। যাক্ এ ব্যাপার তোমার সঙ্গে পরে আলোচনা করব, ওরা এসে পড়ল।

সিঁড়িতে অনেকগুলি পায়ের শব্দ শোনা গেল। ঘরে প্রবেশ করল রেণু, মালিনী, রায়গিন্নী। রেণু আজ চমৎকার সেজেগুজে এসেছে। সে দিবাকরের পাশে সে দাঁড়াল, বলল, আমাকে মাপ কর, সেদিন আমার মাথা ঠিক ছিল না।

মালিনী বলল,—ওর মাথা মাঝে মাঝে এ রকম বিগড়ে যায় মিঃ সেন, তখন আমাকে পর্য্যন্ত বলতে ছাড়ে না।

রায়গিন্নী বললেন,—তুমি ওকে ক্ষমা কর দিবু। ওর যার উপর টান বেশী, ও তাকেই বিরক্ত করতে ভালবাসে। কিন্তু তোমাকে যেন অসুস্থ দেখাচ্ছে! এ কদিন তোমারও বড় দুশ্চিন্তা গেছে।

দিবাকর বলল,—শরীরটা একটু খারাপই লাগছে। আপনাদের ওখানে যাব যাব করেও যেতে পারছি না।

রেণু বলল,—কিন্তু তুমি তো বাইরে যাবার পোষাক পরে রয়েছে।

—হ্যাঁ, এই তোমাদের ওখানেই যাব ভেবেছিলাম, কিন্তু হঠাৎ বড় খারাপ লাগছে।

রায়মশায় ও রায়গিন্নী পরস্পর দৃষ্টিবিনিময় করলেন। তারপর রায়গিন্নী বললেন, এ হোটেল তুমি ছাড় দেবু, আমাদের ওখানেই চল। বিয়ে হয়ে গেলে নিজের বাড়ীতে যেও।

দিবাকরের অন্তরাত্মা বোধ হয় এই রকম একটা কিছু কামনা করছিল। তার পক্ষে এখন গৃহের শান্তি একান্ত প্রয়োজন। সে মনে মনে ঠিক করল, এবার হোটেল ছেড়ে যাবার সময় তার ঠিকানা আর প্রকাশ করে যাবে না।

মালিনী বলল,—সে ভালই হবে, মিঃ সেন। বিয়ের আগে দুজনে এক সঙ্গে কিছুদিন বাস করা দরকার। মার্কস বলেন,—

দিবাকর হাত যোড় করে বলল,—দোহাই আপনার, এখন আর মার্কস নয়, অন্য কিছু থাকে তো বলুন।

রায়গিন্নী মালিনীর দিকে জ্বলন্ত দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বললেন,—আজই চল দিবু, এখনই।

—এত তাড়াতাড়ি হয়ে উঠবে না। আপনারা নিশ্চিন্ত থাকুন, কাল সকালে ব্রেকফাষ্ট অর্থাৎ চা খাওয়ার আগে আমি ঠিক হাজির হবো। কিন্তু বিয়ের আগে আপনাদের ওখানে বাস করা কি উচিত হবে?

মুকুন্দরায় কৃত্রিম কোপে বললেন,—এই বুঝি তুমি বিলেতফেরত? তুমি এসব লোকাচার মান শুনতে পেলে লোকে বিলেত যাওয়া বন্ধ করে দেবে।

রায়মশায়ের কথায় সকলের মুখেই হাসি দেখা দিল, দিবাকরের মনও অনেকটা হাল্কা হয়ে গেল।

দিবাকরের হোটেল থেকে সকলে যখন বেরিয়ে মোটরে উঠল, বেলা তখন এগারোটা বেজে গেছে। সকালের কুয়াসাচ্ছন্ন ভাব কেটে গিয়ে মাঘশেষের রৌদ্রে চারিদিকে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। রেণু ও মালিনী বসল ড্রাইভারের পাশে, তাদের মতে এখানে বসাটা পুরুষেরই একচেটে নয়। ড্রাইভার রফিক মিঞারও তাতে আপত্তি করবার বিশেষ কিছু ছিল না। এ বিষয়ে মালিনীর মতটাই অধিক উগ্র ছিল। সে বলত,—হিন্দু মুসলমানে এইরকম ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশা না হলে দেশের কল্যাণ নেই। মালিনী মোটরে উঠে ইচ্ছে করেই রফিক মিঞার গা ঘেঁসে বসত, এবং একান্তভাবে কামনা করত, এই অবস্থায় সে যেন কোন বন্ধুর নজরে পড়ে। রেণু অতটা অগ্রসর না হলেও তার মতবাদ মালিনীর চেয়ে কম উদার ছিল না।

ভিতরের মোটরে বসে রায়গিন্নী পার্শ্বে উপবিষ্ট রায়মশায়কে বললেন,—মেয়েদের কাণ্ড দেখ। ভেতরে এত জায়গা থাকতে বসল পর পুরুষের গা ঘেঁষে। মেয়েকে আবদার দিয়ে মাথায় তুলেছে, শিবেনের কপালে ভোগান্তি আছে!

রায়মশায় বললেন,—তোমার নাতনীটীও কম যায় না। তবে আজ আমাদের মান রেখেছে। যে রকম শিখিয়ে পড়িয়ে এনেছিলে, ঠিক সেইরকম ব্যবহার করেছে।

—করবে না! না করলে ওর বিয়ে হওয়া মুস্কিল। যে মেয়ে পুরুষের কাছে নতি স্বীকার করতে চায় না, ছেলেরা সহজে তাকে বিয়ে করতে রাজী হয় না। ও হয়ত ভেবেছিল, দিবাকরের সঙ্গে এই কাণ্ডের পর ওই সুশান্ত কিম্বা ওদের ক্লাবের অন্য কোন্ ছেলে আসবে ওকে বিয়ে করতে। কেউ এল!

রায়মশায় মনে মনে গিন্নীর বুদ্ধির তারিফ করে বললেন,—দিবাকরকে হোটেল ছেড়ে আসতে বলে খুব ভাল করেছে, এ সময় কাছে কাছে থাকা ভাল। ওর শরীরটাও মনে হল এই কদিনে বেশ খারাপ হয়েছে।

—শরীর খারাপ তো হবেই। ওর মনেও তো শান্তি নেই। যাকে নিয়ে সংসার পাতবে, সে আগে থেকেই অপমান করে বসচে।

গাড়ী জোরে ছুটে চলেছে। ড্রাইভারের মনের আগুন ছড়িয়ে পড়েছে গাড়ীর স্পীডের মধ্যে! পাশে সুসজ্জিতা তরুণী, ড্রাইভার বোধহয় ভিন্ন জগতের স্বপ্ন দেখচেন।

রেণু ও মালিনী নিম্নস্বরে কথা বলচে, কিন্তু পিছনের সীটে রায়মশায় ও গিন্নী তাদের কথাবার্ত্তা বেশ শুনতে পাচ্ছেন।

—পিসীমার যা কাণ্ড! আমি তখনই জানি শ্রীমান দিবাকর সশরীরে ফিরে আসবে। ওর ভাগ্য ভাল, তাই এরকম বউ পাবে। তার সঙ্গে পাবে কলকাতার মত জায়গায় একখানা বাড়ী আর শক্তিপুরের

সম্পত্তি। এ লোভ দিবাকর কেন, তার চেয়ে বড় কেউ হলেও সামলাতে পারত না।

—কিন্তু মালি, আমাকে বড় অপদস্থ হতে হল। দিবাকরের কাছে ক্ষমা চাইতে হল দিদিমার তাড়ায়। বিয়ের পরে এর শোধ আমি তুলে ছাড়ব। বিয়েটা শীগগীর হয়ে গেলে বাঁচি। জাগরণী ক্লাবের নেক্‌স্‌ট ফাংকশন হল ফাল্গুনের মাঝামাঝি। বেয়ারার হাতে সুশান্তদা সেদিন এক লম্বা চিঠি পাঠিয়েছে।

—দিবাকরের সঙ্গে বিয়ে কিন্তু তোর হওয়া দরকার। সোসাইটিতে একটা পোজিশন পাবি। বিয়ে হয়ে গেলে তোকে আর পায় কে! তখন সুশান্ত কেন, দেখবি সব ক্লাবেই তোর পেছনে লোক ঘুরছে।

—তোর বিয়েটা এই সঙ্গে হয়ে গেলে ভাল হত, মালি।

—বিয়ে আমি করতে রাজী আছি, কিন্তু এক সর্ত্তে। আমি যাকে বিয়ে করব তার পরিচয় হবে শুধু মানুষ। তার জাতি নেই, কুল নেই, গোত্র নেই। সে শুধু মানুষ, আন্‌কোরা তাজা মানুষ! আমাদের বিয়েতে ধর্ম্মের নামগন্ধ থাকবে না, ওসব ভণ্ডামী আমার সহ্য হয় না। আমরা সৃষ্টি করব নতুন এক শ্রেণীর মানুষ যারা হবে এই পৃথিবীর সর্ব্বহারাদের প্রতীক!

—শিবেনদাদু জানে তো তোর প্ল্যান?

—না, বাবাকে বলিনি এখনও! বলব সেদিন, যেদিন মনের মানুষ খুঁজে পাব।

—ওই সন্তোষকে বিয়ে কর না? আমার তো মনে হয়, ও সব দিক দিয়ে তোর আইডিয়্যাল মানুষ।

—হাঁ, সন্তোষের মধ্যে খানিকটা আসল মানুষের রূপ আছে বটে, তবে আরও কিছুদিন যাচাই করতে হবে! ও থাকে না আজকাল এখানে; সেই হল মুস্কিলের কথা। তবে লোকটার মধ্যে একটা এমন

কিছু আছে, সাধারণ লোকের মধ্যে যা নেই। পার্টির আদেশ একেবারে অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলে।

রায়মশায় ও গিন্নী স্তম্ভিত হয়ে শুনছিলেন, কথা বলবার ক্ষমতা তাঁদের যেন চলে গেছে।

যথাসময়ে দিবাকর ও রেণুর বিয়ে হয়ে গেল। বিবাহ উপলক্ষ্যে শিবেনবাবু বিরাট এক ভোজ দিলেন এবং পরদিন খবরের কাগজে অতিথিঅভ্যাগতদের নামের তালিকা পাওয়া গেল। জাগরণী ক্লাবের সভ্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিল সুশান্ত, সন্তোষ ও সুন্দরলাল। ক্লাবের পক্ষ থেকে সুন্দরলাল রেণুকে উপহার দিল মূল্যবান একটি অলঙ্কার। উপহার বিতরণের সময় সন্তোষ একটি নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা দিল, এবং জাগরণী ক্লাব মার্কস লেনিনের প্রদর্শিত পথ কিভাবে অনুসরণ করছে, তার উল্লেখ করল। সন্তোষের বক্তৃতায় নিমন্ত্রিতেরা বিশেষ বিরক্ত বোধ করলেন, এবং শিবেনবাবু চাপা গলায় মন্তব্য করলেন, এ সময় মার্কস্ কেন বাপু!

পাশে দাঁড়িয়েছিল মালিনী! সে বলল, কেন বাবা, মার্কস্ কি অপরাধ করল? এ সময় এই মহাপুরুষের নাম উল্লেখ করে উনি সমস্ত আবহাওয়াকে পবিত্র করে দিলেন! জীবনের কোন ব্যাপারে মার্কস্—লেনিনকে বাদ দেওয়া চলে না।

সুন্দরলাল বলল,—শিবেনবাবু আপোনার সঙ্গে পরিচয় হোয়াতে বোড়ো খুসী হোলাম। আপোনার ভাগ্নী তো আমাদের কলাবের একজন বোড়ো মুরুব্বী আছে।

শিবেনবাবু মনে মনে সুন্দরলালের মুণ্ডপাত করে বললেন,—এখন ওকথা থাক সুন্দরবাবু। তারপর, আপনার ব্যবসা কেমন চলছে?

—সে বোড়ো দুঃখের কথা শিবেনবাবু। এ গবিরমেণ্ট না গেলে আর ব্যবসার সুবিধে হোবে না। বোড়ো ধরপাকড় সুরু হয়েছে।

সন্তোষ বলল,— এ গবর্মেন্টের পতন অনিবার্য্য। আপনি আমাদের দলে আসুন সুন্দরবাবু। সকলে মিলে একটা জয়েন্ট ফ্রন্ট গড়ে তুলি। তারপর চালাব আন্দোলন। সে আন্দোলনে হিমালয় থেকে কুমারিকা পর্য্যন্ত কেঁপে উঠবে। দেশময় জ্বলবে বিপ্লবের আগুন, সাইবিরিয়ার মরুভূমি নেমে আসবে ভারতের বুকে।

কয়েকজন নিমন্ত্রিত উঠে গেলেন। শিবেনবাবু সুশান্তকে ডেকে চুপি চুপি বললেন,—সন্তোষকে থামাও, ওরকম বক্তৃতা দিলে একটি লোকও থাকবে না। ওকে বেশ করে বুঝিয়ে দাও, এটা একটা প্রীতিসম্মেলন, ময়দানের জনসভা নয়।

দিবাকর ও রেণু পাশাপাশি বসেছিল। তাদের দুপাশে কয়েকখানি চেয়ার খালি হওয়াতে সুন্দরলাল রেণুর ঠিক পাশে একখানি চেয়ার অধিকার করে বসল। দিবাকর সন্তোষকে ডাক দিল, আসুন সন্তোষবাবু। দিবাকর আজ রেণুকে দেখিয়ে দেবে যে, সন্তোষের প্রতি তার একটুও বিরুদ্ধভাব নেই। সন্তোষের মতলব ছিল রেণুর পাশে চেয়ারখানি দখল করা, কিন্তু সেখানি বেদখল হয়েছে দেখে সে দিবাকরের পাশেই বসল।

দিবাকর আত্মীয়তার সুরে বলল,—ছেলেদের পরীক্ষা কেমন হল সন্তোষবাবু? ওরা সব শক্তিপুরে ফিরে গেল?

সন্তোষ এই প্রশ্নে যেন তুবড়ার মত ফেটে পড়ল,—ওদের কথা আর আমাকে জিগ্যেস করবেন না মশায়। যত সব ভ্যাগ্যাবন্তের দল! শেষটায় আমার বদনাম করিয়ে ছাড়ল! পরশু দিন দিয়েছি সব বাড়ী পাঠিয়ে।

দিবাকর অতিমাত্রায় বিস্মিত হয়ে বলল,—আপনার বদনাম! ছাত্র হয়ে মাষ্টারের অসম্মান!

আরো মশায়, আপনি যা মনে করছেন তা নয়। আমি ওদের

ইতিহাস পড়াই জানেন তো? ইতিহাসের পরীক্ষার দিন ওরা সকলে নকল করতে গিয়ে পরীক্ষার হলে ধরা পড়েছে! এতে আমার বদনাম হবে না? লোকে মনে করবে আমি কিছুই পড়াইনে।

দিবাকর মনে মনে বলল,—সে কথা ঠিক। ভারতবর্ষের ইতিহাস পড়াতে গিয়ে মার্কস্, লেনিন ও রাশিয়ার ইতিহাস আওড়ালে পরীক্ষার সময় ছেলেদের নকল করা ছাড়া অন্য উপায় থাকবে না। প্রকাশ্যে বলল,—আপনার মত নামকরা শিক্ষকের পক্ষে বাস্তবিকই এ ব্যাপার বিশেষ লজ্জাকর।

এই সময় সেখানে আবির্ভূত হলেন মুকুন্দরায়। দিবাকর ও রেণুকে অন্তঃপুরের নিয়ে যাওয়ার জন্য তিনি প্রস্তুত হয়ে এসেছেন, কারণ নিমন্ত্রিতা মহিলারা তাঁদের দেখবার জন্য ব্যাকুল হয়েছেন। রায়মশায় দেখলেন, রেণু মহোল্লাসে পার্শ্বস্থিত অপরিচিত এক ভদ্রলোকের সঙ্গে গল্প জুড়ে দিয়েছে। তিনি দিবাকরের দিকে অগ্রসর হতেই তার কথার শেষাংশ তাঁর কাণে গেল। তিনি বললেন,—লজ্জার কথা কি হল দিবু? তোমাদের এই বিয়ে নাকি?

দিবাকর বলল,—আসুন দাদু। আজকালকার বিয়েতে লজ্জার উল্লেখ করে আর লজ্জা দেবেন না। বলছিলাম যে, সন্তোষবাবুর মত শিক্ষকের বদনাম হওয়া অত্যন্ত লজ্জাকর ব্যাপার। ম্যাট্রিক পরীক্ষায় ইতিহাসের পেপারে টুকতে গিয়ে ওঁর সবকটি ছাত্র ধরা পড়েছে।

মনে মনে অত্যন্ত উল্লসিত হয়ে মুকুন্দরায় বললেন,—ইতিহাস তো সন্তোষই পড়ায় না?

বিরক্ত হয়ে সন্তোষ বলল,—আপনি বোধ হয় অনুমান করছেন আমার পড়ানো খারাপ বলেই ছেলেরা পরীক্ষায় টুকতে আরম্ভ করেছে! আমি আপনাকে চ্যালেঞ্জ করছি মুকুন্দবাবু, আমার মত ইতিহাসের শিক্ষক আপনি এই বাংলা দেশে পাবেন না। আমার ইতিহাস রাজা

মহারাজা যুদ্ধ বিগ্রহের ইতিহাস নয়। এ হল সাম্রাজ্যবাদের শোষণে নিষ্পীড়িত প্রপীড়িত উৎপীড়িত জনসাধারণের ইতিহাস।

দিবাকর বলল,—কিন্তু যুদ্ধবিগ্রহ ও রাজামহারাজাদের তো আপনি বাদ দিতে পারেন না। এরাও তো ইতিহাসের অঙ্গ। রোম্যানদের কাহিনী রোমক সম্রাটদের বাদ দিলে সম্পূর্ণ হয় কি?

সন্তোষের মুখের দিকে তাকিয়ে মুকুন্দরায় আশঙ্কিত হলেন, এবং সে কোন উত্তর দেওয়ার পূর্ব্বেই বললেন,—গৌরহরি দাসকে চেন নিশ্চয়ই, তার খবর কি?

সন্তোষ বলল,—সে একটি অতি বাজেমার্কা ছেলে, আমার কেয়ারে আসেনি। পরীক্ষার হলে শুধু তাকে আইডেন্টিফাই করেছি, আর কোন খবর তার রাখি না। অবশ্য আমার এই ছাত্রেরা টুকেছে বলে আমি তাদের দোষ দিচ্ছি না। দেশে বিপ্লব আনতে গেলে যেন তেন উপায়ে আনতে হবে।

মুকুন্দরায় সন্তোষকে আর বেশী ঘাঁটাতে সাহস করলেন না। পাশে তাকিয়ে দেখলেন রেণু ও সুন্দরলাল অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে আলাপ করছে। তিনি দিবাকরকে বললেন, রেণুকে নিয়ে বাড়ীর ভিতরে একবার যাও দিবু, ওঁরা সব অপেক্ষা করছেন।

রায়মশায়ের ইঙ্গিতে শিবেনবাবু অনেক কষ্টে সুন্দরলালকে কায়দা করলে পর দিবাকর ও রেণু অন্দরে প্রস্থান করল। সুশান্ত ও সন্তোষ অত্যন্ত অবহেলাভরে সেদিকে একবার তাকিয়ে উঠে দাঁড়াল। শিবেনবাবু বললেন,—তোমরা একটু অপেক্ষা কর, রাত বেশী হয়নি, মোটে সাড়ে দশটা। সুন্দরবাবুও আছেন, ক্লাবসম্পর্কীয় কয়েকটি বিষয়ের মীমাংসা এখানেই হয়ে যাক্।

সন্তোষ বলল,—আমার বসার উপায় নেই শিবেনবাবু। ছেলেগুলোকে আজ রাতই চালান করে দিতে হবে। তাছাড়া রাত একটায় পার্টির

একটা জরুরী মিটিং আছে। ক্লাব সম্বন্ধে আমার কথা বলে যাচ্ছি। সব ব্যাপারে সুন্দরবাবুর যে মত, আমারও সেই মত।

প্রস্থানোদ্যত সন্তোষকে মুকুন্দরায় আটকালেন। বললেন,—শক্তিপুরের আর সব খবর কি সন্তোষ?

রায়মশায়ের মনের কথা বুঝতে সন্তোষের দেরী হল না। বলল, আপনার চিন্তার আর কোন কারণ নেই মুকুন্দবাবু। ভোটাররা সব আপনার পক্ষে, শুধু হাতীগাঁ সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হতে পারছিনা। আমার কথা এই যে, ওখানে ভোটারের সংখ্যা কম। বন্ধুর মনে হয় বিরাজবাবুর পক্ষ আমি ত্যাগ করার পর হাতীগাঁয়ের অশোক তাকে সমর্থন করছে। আজ চললাম মুকুন্দবাবু, শক্তিপুরে দেখা হবে!

সন্তোষের প্রস্থানের পর মুকুন্দরায় জানালার ধারে সরে গিয়ে অনেকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে রইলেন। অশোক সম্বন্ধে সন্তোষ যা বলে গেল, সব যদি সত্যি হয়! কিন্তু সন্তোষকে বিশ্বাস করা চলে কি? মুকুন্দরায় মনে মনে বিচার করলেন, পাঁচশো টাকা সন্তোষ যখন তাঁর কাছ থেকে নিয়েছে, একেবারে বেইমানি সে করবে না। কিন্তু অশোক! বিরাজ-বাবুকে সমর্থন করবার তার কারণ কি? হয়ত নাইট স্কুলের জন্য বিরাজবাবু একে খানিকটা জমি দিয়েছেন। মুকুন্দরায় স্থির করলেন। অশোকের চিঠির উত্তরে বেশ কড়া জবাব দিতে হবে।

মুকুন্দরায় জানালা দিয়ে তাকালেন বাইরের দিকে। নগরীর কল কোলাহল হয়েছে শান্ত, নির্জ্জন পথে আলোকস্তম্ভের সারি সারি পাহারা আর কচিৎ দুএকখানি মোটরের আর্ত্তনাদ। ওই সন্তোষ যাচ্ছে, আলোর নীচে দাঁড়িয়ে একটা সিগারেট ধরাল। এতক্ষণ কোথায় ছিল, কি করছিল সে? মুকুন্দরায় ঘরের দিকে চোখ ফেরালেন। শিবেনবাবুরা গভীর আলোচনায় মত্ত। সুন্দরলালের হীরে বসান আংটি আলোয়

ঝক্‌ঝক্ করছে, সুশান্তর হাতে একটা মোটা চুরুট। বাড়ীর ভিতর থেকে উৎসব মত্ত মেয়েদের হুঙ্কার ভেসে আসছে।

হঠাৎ নিজেকে বড় অসহায় মনে করলেন মুকুন্দরায়। তাঁর কেবলি মনে হতে লাগল, রমেন বেঁচে থাকলে ব্যাপরটা আগাগোড়া অন্যরকম হত। রেণুর বিয়ে হত অশোকের সঙ্গে, গ্রামের মেয়ে গ্রামেই থাকত। শহরে রেণুকে বেঁচে থাকতে হবে একটা কৃত্রিম আবহাওয়া সৃষ্টি করে এবং স্ত্রীলোকের মর্য্যাদাহানিকর অনেক উপসর্গের ভিতর দিয়ে। এর পরিণাম কি! মুকুন্দরায় আতঙ্কে শিউরে উঠলেন। এর চেয়ে রেণুকে যদি গ্রামের অন্যান্য মেয়েদের মত মানুষ করে তুলতেন, তাহলে তার বিলেতফেরত স্বামী পাওয়া দুষ্কর হত বটে, কিন্তু জীবন অনেকাংশে সুখের হত। মুকুন্দরায়ের আজ মনে হল, তিনি এই প্রথম জীবনে ঠকে গেলেন।

শ্যালক শিবেনবাবুর উপর রাগ হল তাঁর। রমেনের মৃত্যুর পর সেই তাঁদের গ্রাম ছাড়তে প্রলুব্ধ করে, এবং রেণুকে আধুনিক কায়দায় শিক্ষাদীক্ষা দেওয়ার মূলেও তারই উৎসাহ ছিল বেশী। দিবাকরের সঙ্গে বিয়ে দেওয়ার কথাও শিবেনবাবুই প্রথম উত্থাপন করেন। অবশ্য শিবেন নিজের মতামত অনুযায়ী ভাগ্নীর সম্বন্ধে চিন্তা করেছেন, এবং তার ধারণা এযুগে মেয়েদের শিক্ষার ধারা ও রীতি এই প্রকার হওয়া বাঞ্ছনীয়। উচ্ছৃঙ্খলতা শিবেন পছন্দ করে না, সেকেলে ভাবও সে সম্পূর্ণ কাটিয়ে উঠতে পারে নি। তার প্রমাণ মুকুন্দরায় হাতে হাতে পেলেন। শিবেনের ইচ্ছা অনুযায়ী মেয়েদের অভর্থনার ব্যবস্থা অন্তঃপুরে হয়েছে। রেণু ও মালিনীর অবশ্য ইচ্ছা ছিল অন্যপ্রকার।

কিন্তু রেণু এরকম হল কেন? একি শুধু কালের প্রভাব না আর কিছু? কালের প্রভাব যদি হয়, শহরের সব মেয়েরই রেণু অথবা মালিনীর মত হওয়া উচিত। এই তো কয়েকদিন আগে মুকুন্দরায়

তাঁর বন্ধুর মেয়ের বিয়েতে উপস্থিত ছিলেন। মেয়ে গ্র্যাজুয়েট, কিন্তু বিয়ের সময় মনে হল বাঙ্গলীর ঘরের সরম জড়িতা গৃহলক্ষ্মী! আর রেণু বিবাহের পরমুহূর্ত্তেই বেহায়াপনার চূড়ান্ত করেছে সুন্দরলালের সঙ্গে। নিজের উপর রাগ হল মুকুন্দরায়ের, আর রাগ হল মৃতপুত্র রমেনের উপর। সে তো এই ভার চাপিয়ে গেছে তাঁর উপর।

ঘরে তখন জাগরণী ক্লাবের সভ্যবৃন্দ ছাড়া আর কেউ উপস্থিত নেই। আলোচনার ঢেউ দেখে রায়মশায়ের মনে হল বিষয়টি অতি জটিল। হঠাৎ শিবেনবাবু চীৎকার করে বললেন,—রেণুর সম্বন্ধে মতামত প্রকাশ করতে পারে এখন একমাত্র দিবাকর। কাজেই কোন ফাংশনে তাকে ডাকতে হলে দিবাকরকে কনসাল্ট করা দরকার।

সুন্দরলাল বলল,—উনি না হলে সোব ফাংকসন মাটি হবে। সেবার ওনার জন্যে হাজার টাকার টিকিট বেশী বিক্রী হোল।

সুশান্ত বলল,—না না, আপনি কি বলেন শিবেনদা! রেণুকে বাদ দিয়ে আমাদের ক্লাব চলবে না।

মুকুন্দরায় আর সহ্য করতে পারলেন না। সভার নিকটবর্ত্তী হয়ে বললেন,—কেন চলবে না শুনি! তোমাদের ক্লাবের সঙ্গে রেণু আর সংস্রব রাখতে পারবে না।

সুশান্ত বলল,—কিন্তু মুকুন্দবাবু, আপনি ভুলে যাচ্ছেন যে, রেণু নাবালিকা নয়, এবং আপনি এখন তার লীগ্যাল গার্জ্জেন নন।

সুন্দরলাল বলল—সে তো ঠিক। মুকুন্দবাবু, আপনি এখন আর রেণুর কর্ত্তা বোলে দাবী কোরতে পারেন না।

মুকুন্দরায়ের মাথায় আগুন জ্বলে উঠল, কিন্তু তিনি কিছু বলবার অথবা করবার পুর্ব্বেই শিবেনবাবু বললেন,—সুশান্ত, সুন্দরবাবু, আপনারা এখন যান। এ বিষয়ে আর কোন কথা আমার এখানে চলবে না।

আপনাদের কথাবার্ত্তা শুনে মনে হচ্ছে, রেণু যেন ভদ্রঘরের মেয়ে ও ভদ্রঘরের বৌ নয়, তাকে আপনারা অন্য পর্য্যায়ে ফেলেছেন।

শিবেনবাবু উঠে দাঁড়ালেন। সুশান্ত তাঁর মূর্ত্তি দেখে বিস্মিত হল, রাগে তাঁর সারা শরীর ফুলে উঠেছে মিহি পাঞ্জাবীর ভিতর সুগঠিত পেশীসমূহ স্পষ্ট দৃষ্টিগোচর হচ্ছে। শিবেনবাবু সুন্দরলালকে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে বললেন,—আমার বাড়ীতে আর কখনও যেন আপনাকে না দেখি। সুশান্তকে বললেন,—বড় বেশী তুমি নেমে গেছ সুশান্ত। জাগরণী ক্লাব তুমি প্রতিষ্ঠা করেছ দেশের ছেলেমেয়েদের নৈতিক ও মানসিক উন্নতি-সাধনের জন্য, কিন্তু ক্লাবের উদ্দেশ্য এখন অন্য পর্য্যায়ে গিয়ে ঠেকেচে। আমি তোমাদের—

শিবেনবাবুর কথা আর শেষ হল না। ঘরের মধ্যে দ্রুত প্রবেশ করল রেণু, এবং সকলের উপস্থিতি উপেক্ষা করে সুন্দরলালের সম্মুখে দাঁড়িয়ে বলল,—ভাবছিলাম আপনি চলে গেছেন। ভিতর থেকে আপনাদের কণ্ঠস্বর শুনে ছুটে এসেছি। আপনাকে আর সুশান্তদাকে আমাদের অজস্র ধন্যবাদ আপনাদের সুন্দর উপহারের জন্য।

মুকুন্দরায় ও শিবেনবাবু যুগপৎ বললেন,—তুমি এখন ভিতরে যাও রেণু, আমরা ব্যস্ত আছি।

মামাবাবুর এই চেহারার সঙ্গে রেণু পরিচিত নয়। সে প্রতিবাদ করতে সাহস না করে ভিতরে চলে গেল, সুশান্ত ও সুন্দরবাবু একান্ত নিরুৎসাহের সঙ্গে প্রস্থান করলেন।

শিবেনবাবু বললেন,—রায়মশায়, এর জন্য আমিই দায়ী।

রায়মশায় সহসা উত্তর দিতে পারলেন না, শিবেনর ভাবান্তর তাঁকে অতি মাত্রায় অভিভূত করল। নিজেকে একটু সামলে নিয়ে বললেন,—দায়ী এর জন্য আমরাই শিবেন, আমি আর তোমার দিদি। তুমি নিমিত্তমাত্র। এবার অন্য কথা বিবেচনা করা যাক্। দিবাকরকে কে

বাড়ী খানা দান করলাম. সে বাড়ীর সম্মান রক্ষার ভার আমি তোমার হাতে দিয়ে যেতে চাই। আর তিন চার দিন পরেই আমরা শক্তিপুর ফিরে যাচ্ছি, শেষ বয়সে ওখানেই পাকাভাবে বাস করার ইচ্ছা আছে। রেণুদের বাড়ী থেকে বিশেষ দূর নয়. কাজেই ওরা তোমার প্রতিবেশী মতই হল। বয়স হলেও, সাংসারিক ব্যাপারে ওরা দুজনেই কাঁচা, অভিভাবক দরকার। তুমি যদি সেই ভার নাও, আমি অনেকটা নিশ্চিন্ত থাকতে পারি।

শিবেনবাবু বলেলন,—এখন তো কর্ত্তব্য দিবাকরের, ভর্ত্তা রক্ষতি যৌবনে।

—আজকাল আর ও নিয়ম চলে না ন্যায়া। দিবুর সঙ্গে আলাপ করে আমি যা দেখেছি, রেণুকে সামলান ওর পক্ষে কঠিন হবে।

—তবে কি জানেন রায়মশায়, বিলেতফেরত সমাজে স্ত্রীর বাহিরটান নিয়ে লোকে বিশেষ মাথা ঘামায় না। বরং স্ত্রী ঘরমুখী হলেই নিন্দা-ভাজন হয়। অবশ্য তাই বলে স্বামীর প্রতি কর্ত্তব্যে স্ত্রী যে বিশেষ অবহেলা করে তা নয়। স্বামী নিজেও জানে বাহিরমুখী স্ত্রীর মারফত তার অনেক কাজ হাসিল হয়।

—যাই হোক শিবেন, অন্ততঃ তোমার ঐ জাগরণী ক্লাবের হাত থেকে রেণুকে সরিয়ে রেখো।

—এবিষয়ে দিবাকরের সঙ্গেও একটু আলাপ করে যাবেন, রায়মশায়। কিন্তু শক্তিপুরে আর এবয়সে ফিরে যাবেন কেন? অত বড় বাড়ীতে গ্রামের মধ্যে মাত্র দুটি প্রাণী থাকবেন, আপনি আর দিদি। তার চাইতে ওখানকার সম্পত্তি বিক্রী করে কলকাতায় চলে আসুন। বৃদ্ধ বয়সে একটু আরাম তো দরকার!

—না শিবেন, তুমি আর আমাকে শক্তিপুর ছাড়তে অনুরোধ করো না। আরাম জীবনে যথেষ্ট করেছি। দায়মুক্ত হলাম. এবার জন্মভূমির

দিকে একটু নজর দেওয়া দরকার। তোমাকে অনেকবার বলেছি আমাদের গ্রামের একটি ছেলের কথা। অশোক চমৎকার কাজ করেছে ওখানে। শহরে সেও কাটিয়েছে অনেকদিন, তারপর মনপ্রাণ দিয়ে লেগেছে গ্রামের সংস্কারের দিকে।

—আপনার আর অশোকের বয়সের পার্থক্য চিন্তা করুন। সে যুবক, আপনি বৃদ্ধ। আপনি চিরকাল কাটিয়ে এলেন আরামের মধ্যে, আর অশোক সম্ভবতঃ জমিদার পুত্র নয়।

—তুমি ভুল বুঝচ শিবেন। আমি কি আর অশোকের মত হৈচৈ করে বেড়াব? আমি থাকব ঐ গ্রামের ইস্কুল ইউনিয়ন বোর্ড এই সব নিয়ে।

শিবেন বলল, আজ বিশ্রাম করা যাক্ রায়মশায়, পরে এসম্বন্ধে আলোচনা করা যাবে।

—হ্যাঁ, রাত হয়েছে অনেক, পাড়া একেবারে নিস্তব্ধ।

সহসা বাড়ীর মধ্যে একটা চীৎকার শব্দে দুজনেই চমকে উঠলেন। তাঁরা দ্রুতপদে অন্তঃপুরের দিকে অগ্রসর হতেই রায়গিন্নী একরকম ছুটে এসে বললেন,—সর্ব্বোনাশ হয়েছে, মালিনীকে পাওয়া যাচ্ছে না!

এই অপ্রত্যাশিত সংবাদ শ্রবণে শিবেনবাবু ও মুকুন্দরায় আর দাঁড়াতে পারলেন না, দুজনেই মেঝের উপর বসে পড়লেন।

রায়গিন্নী বললেন,—খোঁজা হয়েছে সব জায়গায়, শোবার ঘর থেকে আরম্ভ করে রান্না ঘর পর্য্যন্ত। শেষবারের মত তাকে দেখা যায় সন্তোষের সঙ্গে গাড়ীবারান্দায় গল্প করছে।

এই সংবাদে শিবেনবাবু উঠে দাঁড়ালেন। বললেন,—তাহলে সন্তোষের সঙ্গেই গেছে সে, ওদের পার্টি আফিসে!

রায়মশায় বললেন,—এবিষয়ে সন্দেহ আছে। সন্তোষকে আমি দেখেছি পথে, একা একা ফিরে যাচ্ছে।

—ওখানেই একবার খোঁজ করা যাক্ রায়মশায়। অনেক রাত হয়ে গেল। ওদের পার্টি অফিস আমি চিনি।

শিবেনবাবু আর অপেক্ষা করলেন না। নিজেই ড্রাইভার রফিক মিঞার ঘরের দিকে অগ্রসর হলেন, রায়মশায় হলেন শ্যালকের অনুগামী। প্রথমে তাঁরা গেলেন রফিকের ঘরে, দেখলেন ঘর খালি। তারপর গ্যারেজে প্রবেশ করলেন, দেখেন গ্যারেজ শূণ্য।

শিবেনবাবু কাঁপতে কাঁপতে সেখানেই বসে পড়েলেন।

শৈশবকাল থেকে সন্তোষ সমাজ ও ধর্ম্মের প্রতি বীতশ্রদ্ধ। এর একটা সঙ্গত কারণও ছিল। সন্তোষের বাবা তার দিদি বিধবা হলে আবার বিয়ে দেন, এবং তার ফলে তাঁকে সপরিবারে গ্রাম ছেড়ে শহরে চলে আসতে হয়। সন্তোষ তখন ছোট হলেও গ্রামে তাদের প্রতি সমাজের অত্যাচার তার অক্ষরে অক্ষরে মনে আছে। তার মা রুগ্ন শরীরে সব কাজ করে যাচ্ছেন, ঝি চাকর তাদের বাড়ী কাজ করবে না। তার বাবা নাপিতের অভাবে ক্ষৌরী হতে পারছেন না। গ্রামের ইস্কুল থেকে সে হল বিতাড়িত। তারপর একদিন রাত্রিশেষে তারা চিরকালের মত গ্রাম ত্যাগ করে চলে এল।

শহরে এসেও দেখা দিল নানাবিধ সমস্যা। তার—দিদি পুনরায় বিধবা হয়ে বাপের ঘরে ফিরে এল, আর বাপ-মা ভবিতব্যের ওপর মানুষের হাত নেই দেখে ক্ষান্ত হলেন। কিন্তু শহরের আবহাওয়া তাঁদের সহ্য হল না, গ্রাম থেকে চলে আসার পাঁচ বৎসরের মধ্যেই তাঁদের মৃত্যু হল। সন্তোষের বয়স তখন সাতের, ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করে সবে সে কলেজে ভর্ত্তি হয়েছে। দিদি ছাড়া সংসারে অন্য অবলম্বন তার নেই। একদিন বৈকালে কলেজ থেকে ফিরে সে দেখল দিদি কোথায় চলে গেছে, তাকে একখানি চিঠি পর্য্যন্ত দিয়ে যায় নি। কয়েকদিন পরে

দিদিকে হঠাৎ দেখল ময়দানে বেড়াতে গিয়ে। দিদিকে আর চেনা যায় না। সর্ব্বাঙ্গে অলঙ্কার, দিদি মাঠে বেড়াচ্ছে এক জমকালো পোষাকপরা লোকের হাত ধরে।

হিন্দু সমাজের প্রতি বিষম বিরক্ত হয়ে উঠল সন্তোষ, এবং সেই পরিমাণে মুসলমান সমাজের প্রতি তার প্রীতি বেড়ে গেল। মুস্‌লিম লীগের প্রত্যক্ষ সংগ্রামের ঠেলায় সারা দেশ যখন অন্ধকারের আবর্ত্তে নিমজ্জিত হতে চলেছে, তখন সন্তোষ একে মুক্তি সংগ্রাম আখ্যা দিয়ে আনন্দে অধীর হয়ে উঠেছিল। আবার যখন ভারতের অর্দ্ধনগ্ন ফকির নোয়াখালীতে নিপীড়িত নরনারীকে অভয়দান করছিলেন, সন্তোষ পাগলের খেয়াল বলে এ ব্যাপারকে অতি লঘু করে দিল।

পার্টি অফিসে কিন্তু সন্তোষের সুনাম আছে।• পার্টির প্রতি বিশ্বস্ততা তার বুলডগের গোঁ এর মত, এবং তার মনের গোপন কোণে একটা বাসনা আছে যে, পার্টির সাহায্যে দেশের প্রত্যেকটি গ্রামের সর্ব্বনাশ করে ছাড়বে। সে এক্সপেরিমেণ্ট আরম্ভ করল শক্তিপুরকে নিয়ে। সেখানকার ইস্কুলে মাষ্টারি যোগাড় করতে তাকে বিশেষ বেগ পেতে হল না। তারপর আরম্ভ হল কাজ তার পূর্ব্বপরিকল্পিত প্রোগ্রাম অনুযায়ী।

সন্তোষের ধারণা ছিল তার পথ সম্পূর্ণ মসৃণ হবে, গ্রামের অল্পবুদ্ধি লোক সহজেই তার ফাঁদে ধরা দেবে। কিন্তু সে আশা করে নি যে, ইস্কুলের শিক্ষকেরা তার পথে বাধা সৃষ্টি করবেন না; এইদিক থেকেই সে গোলমাল আশা করেছিল। অন্তরায় উপস্থিত হলো অশোকের পল্লী প্রতিষ্ঠান থেকে ও শক্তিপুরে রেণুর উপস্থিতির জন্য। অশোকের জন্য যে বাধা, সে হল পরোক্ষ। কিন্তু রেণুর দেখার পর থেকে বিরাজ-বাবুকে ইস্কুলের সেক্রেটারী করার চিন্তা সন্তোষের মন থেকে ক্রমশঃ সরে যেতে আরম্ভ করল। সন্তোষ ঠিক করল, মুকুন্দরায়কে সেক্রেটারী

করে দিয়ে পুরস্কার-স্বরূপ সে নেবে রেণুকে। শাস্ত্রমতে বিয়ে অবশ্য সে করতে পারবে না, রেণু থাকবে তার কাছে পুরুষের সঙ্গিনীরূপে। বিবাহপ্রথা, নিছক বুর্জোয়া সংস্কার, সে সংস্কারে মাথা গলাতে সন্তোষ প্রস্তুত নয়। ইতিমধ্যে রেণুর বিবাহ· সব ওলটপালট করে দিল। মুকুন্দরায় নিজের ইষ্টের মূলে নিজেই কুঠারাঘাত করলেন। এইবার অশোক সম্বন্ধে একটা ব্যবস্থা করতে হবে।

সন্তোষ হিসেব করে দেখল, তার অর্থসামর্থ্য পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক বৃদ্ধি হয়েছে। মুকুন্দরায় পাঁচশো, বিরাজবাবু হাজার, স্কুলের পরীক্ষার্থী ছাত্রদের তহবিল থেকে একশো। স্কুলের মাহিনা ছাড়া বিরাজবাবু তাকে প্রতি মাসে একশো টাকা দেন, তাঁর কলিয়ারার শ্রমিক ইউনিয়ন থেকেও সম্প্রতি তার একটা মোটারকম আয় হচ্ছে। সন্তোষ চিন্তা করে দেখল, শক্তিপুরে তাড়াতাড়ি ফিরে যাওয়াই এখন তারপক্ষে সবচেয়ে মঙ্গল।

কলকাতা ত্যাগ করলে রেণুকে পাওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই। দিবাকরের কথা একবারও তার মনে হল না। তাছাড়া মালিনী আছে, শিবেনবাবুর মেয়ে। মালিনীকেও মন্দ লাগেনি সন্তোষের, মুখের গঠন তার অনেকটা ছবিতে দেখা শ্রান্ত মেয়ের মত। মালিনী যেন প্রস্তুত হয়েই আছে, সন্তোষ একবার মুখ ফুটে বললেই হয়। সে রাত্রে তার গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে কতক্ষণ গল্প করল মালিনী, সন্তোষ ঠিক করল শক্তিপুর যাওয়ার আগে সে মালিনীর সঙ্গে দেখা করবে। কিন্তু রেণু যেন অন্য ধাতুতে গড়া। চোখ দুটি তার স্বপ্নময়, দিনরাত সে যেন খালি স্বপ্নই দেখছে। মালিনী বাস্তববাদী, পুরুষালিভাব তার মধ্যে বেশ খানিকটা আছে। সন্তোষ নিজে বাস্তববাদী হলেও এই ধরণের মেয়েদের খুব একটা পছন্দ করে না। তাই রেণু তার কাছে মালিনীর চেয়ে বেশী লোভনীয় মনে হল। সন্তোষের ইচ্ছা হল, শুধু রেণু জন্য সে দেশে

বিপ্লবের তাণ্ডবলীলার স্থচনা করবে। শিবেনবাবুর বাড়ী ভেঙ্গে চূর্ণ করে রেণুকে সে তার সঙ্গিনীরূপে প্রতিষ্ঠিত করবে।

উত্তেজিত অবস্থায় সন্তোষ পথে বেরিয়ে পড়ল। শক্তিপুরে যাওয়ার আর দুদিন দেরী, এর মধ্যে একটা মীমাংসা করে ফেলতে হবে।

পথে দেখা স্থশান্তর সঙ্গে। সন্তোষ প্রথমে লক্ষ্য করে নি, স্থশান্ত ডাকল,—দাঁড়াও হে, তোমার ওখানেই যাচ্ছিলাম। কথা আছে অনেক।

তিন ডাকে সন্তোষ সাড়া দিল। স্থশান্ত বলল,—অত মসগুল হয়ে পথ চলছ কেন হে! এদিকে খবর রাখ? অনেক কাণ্ড হয়ে গেছে।

সন্তোষ সংক্ষেপে বলল,—শরীর ভাল নেই। এবার বল তোমার অনেক কাণ্ড কি। মুখ দেখে মনে হচ্ছে ব্যাপার একটু গুরুতর।

স্থশান্ত বলল,—বুর্জোয়া সমাজে যা হয় তাই আর কি। জাগরণী ক্লাবকে রেণুর আশা ছাড়তে হবে। স্থশান্ত সংক্ষেপে শিবেনবাবুর বাড়ীর ঘটনা বিবৃত করল।

সন্তোষ ব্যাপারটায় বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করল না। সে তাচ্ছিল্য-ভরে বলল,—রেণুর গার্জেন তো এখন সেই বিলেতফেরত ডাক্তারটা? ও ভার তোমরা আমার হাতে ছেড়ে দাও।

—তুমি তো ফিরে যাবে শক্তিপুরে!

একটু চিন্তা করে সন্তোষ বলল,—কয়েকটা দিন অপেক্ষা কর তোমরা। এর মধ্যে শক্তিপুরের কাজ আমার একরকম হয়ে যাবে। মুকুন্দরায়ের দফাটি সেরে ওখানকার পাততাড়ি গুটিয়ে আমি চলে আসব। তুমি এদিকে শিবেনকে জব্দ করবার ভার নাও।

—শিবেনদাকে সহজে কায়দা করা যাবে না। ওরা হল গিয়ে শহরের অ্যারিষ্টোক্র্যাট, জাগরণী ক্লাবের অর্দ্ধেক সভ্য ওঁর পরিচিত।

—তুমি আস্ত বোকা, কেন ওর মেয়ে নেই ?

সন্তোষকে আর বলতে হল না। সুশান্ত সোৎসাহে বলল,—এইবার বুঝেচি। কিন্তু দেখ, মেয়েলি ভাবটা ওর যেন একটু কম। ওরকম মেয়ে এসব ব্যাপারে একটু কোল্ড হয় হে! রেণু একেবারে ষোলআনা মেয়ে, পুরুষ যা চায় তাই।

সন্তোষ মনে মনে হাসল। রেণুর দিকে তার একার নয়, আরও অনেকের লক্ষ্য আছে। প্রকাশ্যে সে বলল,—সব মেয়েই সমান, বন্ধু। বিশেষ আমাদের এই বয়সে।

এবার সুশান্ত মনে মনে নিজের চেহারার তারিফ করল। সন্তোষ সুশান্তর চল্লিশ বৎসরকে ভুল করেছে। সুশান্ত বলল,—এদিকে ক্লাবের আর একটি ফাংকশনের দিন এগিয়ে আসছে। যাক্ সুন্দরবাবুর সঙ্গে একবার দেখা করে যাবে না ?

সুন্দরবাবুর বাড়ীতে আর তাদের যেতে হল না। একখানা মোটর তাদের অনতিদূরে থেমে গেল, এবং গাড়ী থেকে নামলেন সুন্দরলাল স্বয়ং। তাদের দিকে অগ্রসর হয়ে সুন্দরলাল বললেন,—সুশান্তবাবুর বাসাতে যাচ্ছিলাম, পথে দেখি দুইজনেই আছেন, তাই থেমে গেলাম।

সন্তোষ বলল,—সেদিন আপনাদের বড় অপমান হয়েছে সুন্দরবাবু!

—আরে আমি ওসোব গায়ে মাখি না। বেবসা করে গায়ের চামোড়া পুরু হয়ে গিয়েছে। যেখানে কাজ অদায় কোরতে হোবে, সেখানে চোটলে চলবে কেন ?

সুশান্ত বলল,—গায়ে আমরাও মাখিনে সুন্দরবাবু, কিন্তু ক্লাবের ফাংকশনে রেণু যদি সত্যিই যোগদান না করে!

—আলবোৎ কোরবে। টাকায় সৌব হোয়। রেণুকে জানিয়ে দিন আপোনারা, প্রত্যেক ফাংকশনে পাঁচশো টাকা পাবে। আর আপোনারা

তাকে বাগিয়ে আনুন। কিছু খরোচ পত্তোর হোবে, আপোনারাও রাখুন পাঁচশো মেরে। আমি চোল্লাম এখন, বহুৎ কাজ আছে।

সুন্দরলালের মোটর অদৃশ্য হলে সুশান্ত বলল,—এই ভূতটারও নজর আছে রেণুর উপর। আমাকে কতদিন বলেছে,—রেণুকে বাগিয়ে দিতে পার তো পাঁচ হাজার টাকা বকশিস পাবে।

সন্তোষ চমকে উঠল, বলল,—পাঁচ হাজার টাকা! লোকটার টাকার ও খেয়ালের দেখছি আর অবধি নেই। একটা মেয়ের জন্য এত টাকা খরচ করবে!

—আমি কি তাতে রাজী হই বন্ধু! আমার কাছে সুন্দরলালের টাকার চেয়ে রেণুর দাম অনেক বেশী। অবশ্য রেণুকে আমি নিজের বিবাহিত স্ত্রীর মত পেতে চাই নে। সে থাকবে দিবাকরের কাছে, আর আমি শুধু একটু বন্ধুত্বের সম্পর্ক রেখে বুঝলে কিনা—

সুশান্ত চোখ টিপে মৃদু হাসলে।

সন্তোষও হেসে বলল,—অর্থাৎ যত ঝুক্কি বহন করবে দিবাকর, আর লাভের দিক্‌টায় তুমি!

সুশান্ত বলল,—আমি আজ চললাম। চাঁপাতলায় নির্য্যাতিত কর্ম্মীসঙ্ঘের মিটিং আছে।

সুশান্তর প্রস্থানের পর সন্তোষ লক্ষ্যহীন ভাবে পথ চলতে লাগল। কোন গুরুতর সমস্যার সমাধানের সময় এরূপ ভাবে চলাফেরা করা তার বরাবর অভ্যাস। ব্যাপার বড় সহজ নয়, দুজন প্রতিদ্বন্দ্বী, এবং দুজনেই শক্তিশালী। জাগরণী ক্লাবের প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে সুশান্তর সমাজে নাম ডাক খুব, রেণুর তার প্রতি আকৃষ্ট হওয়ার পথে কোন অন্তরায় নেই, বিশেষতঃ সুশান্তকে আশ্রয় করলে, যখন তার আত্মবিকাশের সুবিধা হবে। মেয়েরা একবার খ্যাতিলাভ করলে বিখ্যাত হওয়ার উচ্চাশা তাদের অনেকদূর নিয়ে যেতে পারে। তারপর আছে বিশিষ্ট ধনী

সুন্দরলাল। রেণুর মত বিলাসী ও কৃষ্টিসম্পন্ন মেয়ের অর্থের প্রতি লোভ স্বাভাবিক। টাকায় মেয়েরা চরম প্রলুব্ধ হয়, কাজেই সুন্দরলালেরও একটা চান্স আছে। আচ্ছা, রেণু যদি দিবাকরকে আশ্রয় করেই সারা জীবন কাটিয়ে দেয়! না, সে তা পারবে না। স্বামীর সঙ্গে যে সব মেয়ে জীবনকে গ্রথিত করে, রেণু তাদের দলে পড়ে না।

সন্তোষের মাথা গরম হয়ে উঠল। এই প্রথম সে জীবন-সমস্যার সহজ সমাধানে অসমর্থ হল। হঠাৎ তার মনে হল সুন্দরলালের প্রতিশ্রুত পাঁচ হাজার টাকার কথা। রেণুকে সুন্দরলালের জালে ফেলে দিতে পারলেই এই টাকা তার হাতে আসে। কিন্তু তাহলে রেণুকে পাওয়ার আশা পরিত্যাগ করতে হয়। তা কি সম্ভব? তার তরুণ জীবনে জয়ধ্বনি বেজে উঠেছে রেণুর মহিমায়। মেয়েদের প্রতি তার সহজাত বিরাগ' অন্তর্হিত হয়েছে শুধু রেণুর জন্য। তাকে সুন্দরলালের হাতে তুলে দেওয়া যায় কি করে। অনেক চিন্তার পরও সন্তোষ কর্ত্তব্য স্থির করতে পারল না।

অনেক পথ অতিক্রম করে পথভ্রান্ত সন্তোষ এসে দাঁড়াল এক হোটেলের সামনে। এই হোটেলেই দিবাকর বিবাহের ঠিক পূর্ব্বে কিছুদিন বাস করে গেছে। হোটেলের ম্যানেজার সন্তোষের পূর্ব্বপরিচিত ও সমব্যবসায়ী। সন্তোষ হোটেলে প্রবেশ করতেই ম্যানেজার তাকে অভ্যর্থনা করল।

—এস হে, কয়েকদিন থেকে তোমাকেই খুঁজছিলাম।

সন্তোষ বলল,—হঠাৎ। কি এমন জরুরী ব্যাপার।

—জরুরী ব্যাপার বলেই তো খুঁজছি। পার্টি অফিসে দুদিন গেলাম, তোমার দেখা নেই, সবাই বললে তুমি নাকি জাগরণী ক্লাব নিয়ে ভয়ানক ব্যস্ত আছে।

—তা কলকাতায় যখন এসেছি, ক্লাবের ব্যাপার একটু আধটু

দেখাশুনা করতে হবে তো! ক্লাবের প্রতিষ্ঠাতা সুশান্ত হলে হবে কি, আমাদের ইনটারেষ্টই ওখানে ষোল আনা! ক্লাবের সেক্রেটারী আর প্রসিডেন্ট বাদ গেলে আর সবই তো আমাদের লোক। শুধু জাগরণী ক্লাব কেন,-শহরের অনেক ক্লাবেই আমাদের লোক ঢুকেছে। তবে তারা আছে গুপ্ত ভাবে, সুযোগ মত আত্মপ্রকাশ করবে।

ম্যানেজার বলল,—তোমার বক্তৃতা এখন থামাও। যে জন্য তোমায় খোঁজ করচি শোন। মিঃ সেন নামে বিলেফেরত এক ডাক্তার কিছুদিন এখানে ছিলেন জান। হোটেল থেকে চলে যাওয়ার সময় তিনি ঠিকানা দিয়ে যান নি। ডাক্তার তোমার পরিচিত। একগাদা চিঠি এসে জমেছে তাঁর নামে, তুমি সেগুলির ভার নাও।

মনে মনে অত্যন্ত উৎফুল্ল হয়ে সন্তোষ বলল,—তাঁর সঙ্গে আমার তো প্রায়ই দেখা হয় তাঁর বর্ত্তমান ঠিকানাও আমি জানি! চিঠির ব্যবস্থা আমি স্বচ্ছন্দে করতে পারব।

ম্যানেজারের কাছ থেকে দিবাকরের চিঠিপত্র নিয়ে সন্তোষ যখন পার্টি অফিসে ফিরে এল, বেলা তখন বারোটা বেজে গেছে। অফিস প্রায় জনশূন্য, শুধু দু একজন উৎসাহী সদস্য বিশ্বসংসার ভুলে গিয়ে লেনিন বড় না ষ্ট্যালিন বড় এই নিয়ে আলোচনা করছে। ক্ষুধা তৃষ্ণার স্পৃহা সন্তোষেরও ছিল না সে নিজের ঘরে গিয়ে দিবাকরের চিঠির তাড়া দু-থাক্ করে সাজাল। স্থানীয় ডাক ও বিলাতী ডাক। বিন্দুমাত্র ইতস্ততঃ না করে সন্তোষ চিঠিগুলি একের পর এক দেখে যেতে লাগল।

স্থানীয় চিঠিতে প্রয়োজনীয় বিশেষ কিছু নেই। বেশীর ভাগ চিঠিই এসেছে হাসপাতাল অথবা ঔষধের কারখানা থেকে। তারপর সন্তোষ আরম্ভ করল বিলাতী ডাক। বিলাত থেকে দিবাকরের বন্ধুরা লিখেছে তার বিবাহের জন্য অভিনন্দন জানিয়ে। এসব চিঠি সন্তোষ বিরক্তির সঙ্গে আঠা দিয়ে আবার সেঁটে রাখল। শেষ চিঠিখানি নিতান্ত অনিচ্ছার

সঙ্গে খুলে ফেলল সে ! দু একছত্র পড়েই তার মুখের ভাব গেল বদলে তার দীর্ঘক্ষণ ব্যাপী শ্রম সার্থক হল।

বিলাতী এটর্ণীর চিঠি, এয়ারমেলে এসেছে। মহাশয়, মিসেস ক্লার্ক (পূর্ব্ব নাম মিস কেলী) এর তৃতীয় পুত্রের জন্মদাতা হিসাবে উক্ত পুত্রের ভরণ পোষণের নিমিত্ত আপনার নিকট পূর্ব্ব পত্রে মাসিক কুড়ি পাউণ্ড দাবী করা হইয়াছিল, এই দাবী এক্ষণে বর্দ্ধিত করিয়া পঁচিশ পাউণ্ড করা হইল।

উত্তেজনা ও আনন্দের আতিশয্যে সন্তোষ চিঠিখানি শেষ পর্যন্ত পড়ার মত ধৈর্য্য রাখতে পারল না। দিবাকরের অন্যান্য চিঠিগুলি বাইরে রেখে এই চিঠিখানি সে সযত্নে বুক পকেটে রক্ষা করল। একবার ভাবল, শক্তিপুরে যাওয়ার আগেই কাজ আরম্ভ করা যাক কিন্তু শিকারকে খেলিয়ে না তুললে শিকারীর আনন্দ হবে কেন ? সন্তোষ স্থির করল, শক্তিপুরের কাজ শেষ করে এদিককার কাজ সে আরম্ভ করবে। এই চিঠির মহিমায় দিবাকর ও রেণু তার হাতের মুঠোয় আসবে। তখন কোথায় থাকবে সুশান্ত আর কোথায় থাকবে সুন্দরলাল !

অনেকক্ষণ পরে একটু শান্ত হয়ে সন্তোষ লক্ষ্য করল তার নিজের নামেও একখানি চিঠি অপেক্ষা করছে টেবিলের উপর। খামের চিঠি, অপরিচিত হস্তাক্ষরে তার ঠিকানা লেখা। চিঠি খুলতেই নীচে তিন অক্ষরে একটি নাম দেখে সন্তোষ কৌতূহলে আবার ফেটে পড়ল। মালিনী চিঠি লিখেছে।

—সন্তোষদা, আমাদের মুসলমান ড্রাইভার রফিক মিঞা জোর করে ধরে নিয়ে এসেচে আমাকে তার বাড়ীতে। মজঃফরপুর টাউনে তার বাড়ী। আজ পাঁচ দিন আমি তার বাড়ীতে বন্দী অবস্থায় আছি! অনেক কষ্টে খামটাম যোগাড করে তোমাকে চিঠি লিখচি। বাবাকে চিঠি লিখে ফল হবে না। তাঁকে আমি ছেলেবেলা থেকে জানি ;

মাতৃহীনা কন্যার প্রতি যতই তাঁর স্নেহ থাক, মুসলমানের ঘর থেকে মেয়েকে তিনি কখনও ফিরে পেতে চাইবেন না। তাই তোমাকে লিখচি। তুমি আমাকে এই নরক থেকে উদ্ধার কর। ইতি, মালিনী।

চিঠির কাগজ অনেক জায়গায় চুপসে যাওয়ায় লেখা একটু অস্পস্ট হয়েছে। মালিনীর চোখের জল বোধ হয় কাগজের উপর ঝরে পড়েছে। সন্তোষ কি একটা বিজাতীয় আনন্দে লাফিয়ে উঠল। তাড়াতাড়ি ছুটল সে অফিসঘরের দিকে। উৎসাহী সদস্যরা তখনও তর্কের স্রোতে ভেসে চলেছে। সন্তোষ এক টুকরো কাগজে খস্‌খস্ করে খানিকটা লিখে তাদের হাতে দিয়ে বলল,—এই খবরটা কালকের কাগজে বার হওয়া চাইই। তারপর নিজের ঘরে এসে মালিনীকে চিঠি লিখতে বসল সে।

—প্রিয় সাথী, তোমার এই কাজে আমরা গৌরবান্বিত এবং নীতির দিক দিয়ে বিশেষ মঙ্গলজনক হয়েছে। নরনারীর সম্পর্কের ব্যাপারে হিন্দুমুসলমান সবই সমান। নতুন ঘর তোমার ভাল লাগা উচিত। তোমার সন্তানদের ধমনীতে উভয় জাতির রক্ত প্রবাহিত হবে, এবং তারাই হবে দেশের ভবিষ্যৎ সুসন্তান। ইতি, সন্তোষ।

শিবেনবাবুর আকস্মিক বিপদে শক্তিপুরে শীঘ্র ফিরে যাওয়া রায়মশায় সমীচীন মনে করলেন না। রায়গিন্নী ভাইকে শক্তিপুর নিয়ে যাওয়ার জন্য পীড়াপীড়ি করতে লাগলেন। শহরের হাওয়া শিবেনবাবুর কাছে বিষাক্ত হয়ে উঠেছিল, তিনি বিশেষ কোন আপত্তি না করে গ্রামে যেতে সম্মত হলেন। স্থির হল, আপাততঃ দিবাকর ও রেণু এই বাড়ীতেই থাকবে।

শিবেনবাবু বিশেষ মুষড়ে পড়েছেন। সংসারে এ পর্য্যন্ত তাঁর প্রধান অবলম্বন ছিল চারটি,—কন্যা মালিনী, সারমেয় টেবি. বন্ধুবান্ধবদের সহিত

মজলিস ও বায়ু পরিবর্ত্তন। তিনি মনে করতেন এই চারটি আমরণ তাঁকে আশ্রয় করে থাকবে। বর্ত্তমানে কিন্তু একটির অভাবে তিনি বিপর্য্যস্ত হয়ে পড়লেন! সন্তোষের পার্টির অফিসে গোপনে খোঁজ নিয়ে তিনি জেনেছেন মালিনীকে সন্তোষের সঙ্গে হৃদ্যতা করতে কেউ কোন দিন দেখে নি। মালিনী রেণুকে নিয়ে পার্টি অফিসে গেছে কয়েকবার মাত্র, বেশীর ভাগ সময়ই তার কাটত বন্ধুদের বাড়ীতে। রফিক ড্রাইভারের সঙ্গে ঘনিষ্টতাও তার ছিল না। রেণু অবশ্য আমাকে জানিয়ে দিল, মুসলমানের প্রতি মালিনীর কোন বিরাগ ছিল না। তার মতে মালিনী রফিকের সঙ্গে গেছে পার্টির কাজে। ও ব্যাপারে দিবাকরও বিশেষ নিন্দার কিছু দেখতে পায় নি। সে বলল, বিলেতে এ রকম হামেশাই হয়। কি মেয়ে, কি পুরুষ, সকলের জীবনেই সব রকম অভিজ্ঞতা থাকা দরকার।

শিবেনবাবু একদিন সকালবেলা শোবার ঘরে বসে এইসব চিন্তাই করছিলেন। রেণু ও দিবাকর কোথায় বেড়াতে গেছে। রায়গিন্নী রান্নাঘরে ঠাকুর-চাকর নিয়ে ব্যস্ত, আর মাঝে মাঝে উদ্গত অশ্রু সবার অলক্ষ্যে মুছে ফেলছেন। মালিনীর ভবিষ্যৎ তাঁকে অত্যন্ত বিচলিত করেছে। রায়মশায় নিঃশব্দে শিবেনবাবুর কক্ষে প্রবেশ করলেন একখানা কাগজ হাতে নিয়ে। তারপর কাগজখানা শিবেনবাবুর সামনে টেবিলের উপর রাখলেন। শিরোনামা দেখে চমকে উঠলেন শিবেনবাবু। যে ব্যাপার অতি যত্নে তিনি গুপ্ত রেখে এসেছেন, 'শ্বেতভল্লুক' পত্রিকায় তাই বেরিয়েছে একেবারে প্রথম পাতায়। সংবাদটি এইরূপ,—"হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের অপূর্ব্ব নিদর্শন। পার্টির বিশিষ্ট সদস্যা কর্ত্তৃক মুসলমানের পাণিপীড়ন। পার্টির নবীন সদস্যা মালিনী সম্প্রতি মজঃফরপুরে জনৈক সম্ভ্রান্ত মুসলমানকে স্বেচ্ছায় জীবনসঙ্গীরূপে বরণ করিয়াছেন। তিনি দক্ষিণ কলিকাতার বিখ্যাত ধনী শিবেন্দ্র মোহন সেনের একমাত্র

কন্যা। আমার দলের মূলনীতি অনুযায়ী কার্য্য করিবার জন্য মালিনীকে অভিনন্দন জানাইতেছি, এবং আশা করি শিবেন্দ্রবাবুও কন্যাকে অভিনন্দন জানাইবেন।”

সংবাদ পড়ে শিবেনবাবু মৃদু হাসলেন, কথা বলবার শক্তি যেন তাঁর অন্তর্হিত হয়েছে। মুকুন্দরায় বললেন,—এ কাজ সন্তোষের, কিন্তু সেই বা খবর পেল কি করে! বাড়ীর চাকরবাকর পর্য্যন্ত জানে না মালিনী কোথায়। আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না শিবেন।

শিবেনবাবু বললেন—যে কোন উপায়েই হোক খবরটা বেরিয়ে পড়েছে। এসব অধর্ম্ম বেশীদিন চাপা থাকে না রায়মশায়। কিন্তু এখন সবচেয়ে মর্ম্মান্তিক হবে বন্ধুদের আগমন ও তাদের সহানুভূতি জ্ঞাপন। প্রথমটিতে আমার আপত্তি নেই, কিন্তু দ্বিতীয়টি আমি সহ্য করতে পারব না। আমার স্ত্রীর মৃত্যুর পরে বাড়ী ছেড়ে পালিয়েছিলাম ঐ জন্যই। আজ এখনই বেরিয়ে পড়ি চলুন রায়মশায়। শক্তিপুরে কিছুদিন থাকা বিশেষ দরকার।

রায়মশায় বললেন,—একটু ধীরভাবে চিন্তা কর শিবেন। শক্তিপুরে তুমি তো যাবেই, কিন্তু তার আগে মেয়েটার উদ্ধার চিন্তা করা যাক। একটা হদিশ যখন পাওয়া গেছে!

—সে পরে হবে রায়মশায়। আপাততঃ পালাই চলুন।

কিন্তু ট্রেণের তো দেরী আছে, ট্রেণ হল সেই আড়াইটেয়।

—কোন প্রয়োজন নেই রায়মশায়, আমার মোটর ফিরে পাওয়া গেছে। ষ্টেশনে পড়ে ছিল, কাল বিকেলে পুলিশের লোক ফেরত দিয়ে গেল। মোটরে বেরিয়ে পড়ি এখুনি, এই মুহূর্ত্তেই। দিবাকররা বোধ হয় ফিরে এসেছে। দিদিকে বলুন সংসারের চার্জ্জ তাদের বুঝিয়ে দিতে, আমার এখানে প্রয়োজন ফুরিয়েছে।

শিবেনবাবু আরও কি বলতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু দুহাতে মুখ ঢেকে

চুপ করলেন। রায়মশায় খোঁজ নিয়ে জানলেন দিবাকররা ফিরে এসেছে। রেণু বলল, 'শ্বেতভল্লুক' এর সংবাদ তারাও লক্ষ্য করেছে। খবর শুনে রায়গিন্নী মন্তব্য প্রকাশ করলেন না, শুধু শান্তভাবে বললেন, ও রকম হবে আমি আগেই জানতাম।

বিরক্তির সুরে রেণু বলল,—তোমরা যে কি জান আর কি জান না, আমি এত দিনেও বুঝে উঠতে পারলাম না।

রায়গিন্নী ক্রুদ্ধস্বরে বললেন,—ত্যাখ রেণু, কখনো যা বলিনি আজ তাই বলব। সেদিন মোটরে তোরা ড্রাইভারের গা ঘেঁসে বসলি কোন্ সুবাদে? সোমত্ত মেয়ে তোরা, আর তোরা বসিস্ পরপুরুষের গায়ে গা লাগিয়ে। রফিককে একটুও দোষ দিইনে আমি। সেদিন ভাগ্যিস তোর বিয়ে ছিল, নইলে মালিনীর বদলে তোকেই সে নিয়ে যেত তার মজঃফরপুরের বাড়ীতে।

রায়গিন্নী কথাগুলি একটু চীৎকারের সুরেই বললেন, গোলমাল শুনে শিবেনবাবু এসে দাঁড়ালেন। দিবাকর বলল,—এতে আর দোষ কোথায় দিদিমা। মালিনীকে আমরা ফিরিয়ে আনব এবং তার বিয়েও আটকাবে না।

রায়গিন্নী বললেন,—তা হয় না দিবু, এ দেশ তোমার বিলেত নয়।

শিবেনবাবু বললেন,—দিদি ঠিকই বলেছো মালির ব্যাপারে আমার সমস্ত কর্ত্তব্য শেষ হয়েছে। যে মেয়ে বাপ, সমাজ সব তুচ্ছ করে চলে গেল, তাকে আমার কোন প্রয়োজন নেই। বাইশ বছরের মেয়ে, সে স্বেচ্ছায় না গেলে জোর করে তাকে কেউ ধরে নিয়ে যেতে পারে? ড্রাইভারকে আমিও দোষ দিইনি, দোষ আমার। আমি আমার মেয়েকে রক্ষা করতে পারিনি, পিতা রক্ষতি কৌমারে। মনু যথার্থই বলে গেছেন রায়মশায়।

রেণু বলল,—তোমরা সবাই ভুল বুঝেছ মালিকে। সে ফিরে আসবে

এবং ভালভাবে সমাজ তাকে গ্রহণ না করুক, পার্টি করবে। আর যদি 'শ্বেত-ভল্লুক' এর সংবাদ সত্যই হয়, তাই বা দোষের কি? বিয়ে তোমরা তার—

রেণু কথা শেষ করবার আর অবসর পেল না। সে লক্ষ্য করল, শিবেনবাবু রক্তনেত্রে তারই দিকে তাকিয়ে আছেন। রায়মশায় ঘুরে এসে বললেন,—গাড়ি রেডি শিবেন।

—চল, দিদি! ওদের সব বুঝিয়ে দিলে তো?

দিবাকর বলল,—এখন কোথায় চললেন আপনারা! স্নানাহার না করে!

—শক্তিপুর। এস, দিদি। রায়মশায়, চলুন। শিবেনবাবু যেন আর সকলের অস্তিত্ব ভুলে গেছেন।

কবে ফিরবেন?

—ফিরতে আর নাও পারি দিবু। তোমাদের ও বাড়ীটা ভাড়া দিয়ে দাও। আমার বাড়ীতে তোমরাই থাক। তোমরা সবাই যদি বাড়ী থেকে চলে যাও, আমার মানসিক অশান্তি আরও বাড়বে।

রেণু উৎসাহের সঙ্গে রায়গিন্নীর কাছ থেকে সব বুঝে নিল। সংসারের হিসাবনিকাশ, কোথায় কি আছে, খুঁটিনাটি ব্যাপার। তারপর বিদায়ের পালা সেরে তিনজন মোটরে উঠলেন। গাড়ী ষ্টার্ট দিল, এবং কয়েক মিনিটের মধ্যেই অদৃশ্য হয়ে গেল।

রেণু ও দিবাকর অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকল সেখানে, তারপর রেণু একটু ইতস্ততঃ করে মন্তব্য করল,—সেন্টিমেণ্ট্যাল ফুলস্!

দিবাকর হেসে বলল,—বহুবচন যখন, তখন তিনজনই।

—ওদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী হল তোমার মামাশ্বশুর। এই সামান্য ব্যাপারে উনি এত বিচলিত হবেন আশা করিনি। অথচ স্ত্রীস্বাধীনতা বলতে গিয়ে উনি এককালে গদগদ হতেন।

—একেই বলে কুসংস্কার। মুখে যতই বলুন, কাজে ওঁরা সেই সেকেলে মন নিয়েই চলেন। এই ব্যাপারে সত্যিই এতই ক্ষুব্ধ হয়েছেন কেন!

—মামাবাবু একলা থাকলে বোধহয় এতটা ব্যস্ত হতেন না, কিন্তু তোমার দাদাশ্বশুর আর দিদিশ্বাশুড়ী থেকে সব মাটি করে দিয়েছে। ওঁরা হলেন সেকেলে ঝানু।

—বিলেতে কিন্তু এরকম ব্যাপার নিন্দার নয়। মনে কর, কোন মেয়ের বিয়ের আগে ছেলেপিলে হল। তাই বলে সমাজ তাকে বর্জ্জন করবে না। । পরে আবার তার ভাল বিয়ে হতে পারে, আর তার সন্তানদেরও জারজ আখ্যা ঘুচে যাবে।

—ও দেশের সঙ্গে এ দেশের তুলনা হয় না। স্ত্রী স্বাধীনতার প্রকৃত মর্ম্ম ওরা বোঝে, আর সেই অনুযায়ী কাজও করে। তোমরা এদেশে বল এক, আর কাজের বেলায় পিছিয়ে যাও

রেণুর কথার ভাবে দিবাকর একটু আহত হল, বলল,—কিন্তু আমার মধ্যে সে রকম কিছু পেয়েছ তুমি? তোমার স্বাধীন গতিবিধিতে কোন রকম বাধা আমার কাছে পাবে না।

দিবাকরের কথা শেষ হতেই বেয়ারা এসে খবর দিল, এক বাবু অপেক্ষা করছে। দিবাকর ও রেণু ড্রইংরুমে প্রবেশ করে যে ব্যক্তিকে কুশনচেয়ারে সমাসীন দেখল, তাকে দেখে দিবাকর আনন্দিত না হলেও রেণুর মুখে হর্ষে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। নাটকীয় ভঙ্গীতে নমস্কার করে সন্তোষ বলল,—অনেকদিন পরে মিঃ ও মিসেস সেনের দর্শন হল। ভারী ব্যস্ত আছেন বোধহয় আজকাল আপনারা!

সন্তোষের কণ্ঠস্বরে প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপটুকু দিবাকর সহজেই ধরতে পারল। সে বলল,—আপনাদের কাগজ তো আর মানুষকে শান্তিতে থাকতে দেবে না।

কৃত্রিম বিস্ময়ে সন্তোষ বলল,—আমাদের কাগজ! 'শ্বেত-ভল্লুক!' কেন, কি বেরিয়েছে তাতে যে আপনারা অশান্তি ভোগ করছেন?

—সবই জানেন আপনি, অথচ ভাব দেখাচ্ছেন যেন কিছুই জানেন না!

রেণু বলল,—সন্তোষদার কথা অবিশ্বাস করবার কারণ কি? ওঁদের পার্টির লোক কখনও মিথ্যা কথা বলে না।

রেণুর স্বর গম্ভীর। দিবাকর তাড়াতাড়ি বলল,—সন্তোষবাবুকে অবিশ্বাস করছি না, এসব ঠাট্টা করে বলছি।

সন্তোষ বলল,—ভবিষ্যতে এরকম ঠাট্টা আর করবেন না, মিঃ সেন। হ্যাঁ, 'শ্বেত-ভল্লুক' এ কী এমন সাংঘাতিক খবর বেরিয়েছে রেণু?

—আমার স্ত্রীকে ভবিষ্যতে মিসেস সেন বলে সম্বোধন করলে সুখী হব।

—কেন, শুনি? তোমার সঙ্গে বিয়ে হওয়ার আগে থেকে এঁদের সঙ্গে আমার পরিচয়। তখন থেকে এঁদের দাদা বলে আসচি, এঁরাও আমাকে নাম ধরে ডেকে আসচেন,। আজ তোমার সঙ্গে বিয়ে হয়েছে বলে মনে করো না যে, আমার উপর এঁদের কোন অধিকার নেই। এই খানিক আগে বড়াই করছিলে আমার কাছে মেয়েদের স্বাধীনতা দেওয়ার ব্যাপারে তোমার কোন কুসংস্কার নেই। এখন দেখচি তোমার সঙ্গে মামাবাবুর বিশেষ তফাত নেই।

—স্বাধীনতা দেওয়ার কথা তোমাকে, সন্তোষবাবুকে নয়!

সন্তোষ বলল,—এ ব্যবহার আপনার সমর্থনের যোগ্য নয়, মিঃ সেন। বিলেত ঘুরে এলেও আপনার মানসিক উৎকর্ষ সাধিত হয়নি। যাক্, খবরটা কি বেরিয়েছে, রেণু?

নিষ্ফল ক্রোধে দিবাকর নির্ব্বাক হয়ে গেল। রেণু 'শ্বেত-ভল্লুক' এর প্রথম পৃষ্ঠা ধরল সন্তোষের চোখের সামনে। পড়বার ভান করে

সন্তোষ বলল,—খবর অবশ্য খুবই জবর, কিন্তু এতে অশান্তি সৃষ্টি করবার কি আছে! একটি পুরুষ আর একটি নারী,—সৃষ্টির গোড়ার কথা! আদম আর ইভ! এদের জাত নেই, সমাজ নেই। আছে শুধু উন্নত যৌবন আর অদম্য লালসা। এই রকম মানুষের স্বপ্নই মার্কস্ দেখে গেছেন।

—মার্কস্ এর লেখার মধ্যে এসবের উল্লেখ নেই তো' সন্তোষদা!

—তুমি আজকাল আমার কথায় বড় ভুল ধরতে আরম্ভ করেছ রেণু। শক্তিপুরে তোমাদের বাড়ীতে আমি অবশ্য আপত্তি করি নি। মার্কসীয় দর্শনে তোমার জ্ঞান অসম্পূর্ণ বলেই তুমি এরকম বলতে সাহস কর। মার্কস্ সম্বন্ধে নতুন বই খানকতক কাল তোমাকে দেব, পড়া শেষ হলে দৃষ্টিভঙ্গী তোমার সম্পূর্ণ পালটে যাবে।

লজ্জিতভাবে রেণু বলল,—প্রতিবাদ করা আমার একটা মুদ্রাদোষ সন্তোষদা, এসব সিরিয়াসলি নেবেন না। আপনি তাহলে মালিকে সমর্থন করচেন?

সম্মুখের টেবিলে ঘুঁসি মেরে সন্তোষ বলল,—করব না! মালিনী আমাদের মুখরক্ষা করেছে।

নিতান্ত দুর্ভাগ্যবশতঃ দিবাকর বলল,—মালিনীর কাজ আমিও নিন্দা করি না, কিন্তু এরকম মুখরক্ষা আপনারাও করতে পারতেন।

সন্তোষ একেবারে তেড়ে উঠল,—যে বিষয়ে আপনার বিন্দুমাত্র জ্ঞান নেই, তা নিয়ে বৃথা তর্ক করবেন না, মিঃ সেন। পলিটিক্স কোন কালে করেছেন? ইস্কুল কলেজে লেখাপড়ায় ভাল ছিলেন, তারপর গেলেন বাপের পয়সায় বিলেত। সেখানেও লেখাপড়া করলেন আর তার সঙ্গে আরও কিছু।

দিবাকরও ঝাঁঝিয়ে উঠল,—আরও কিছু! হোয়াটে ডু ইউ মীন্, সন্তোষবাবু?

—দেখবেন তাহলে ? প্রমাণ আমার হাতে। সন্তোষ এটর্ণীর চিঠি বার করে পড়তে স্থরু করে দিল।

দিবাকর নিথর, নিস্পন্দ। তার কথা বলার শেষ শক্তিটুকুও কে যেন কেড়ে নিয়েছে।

সন্তোষের পড়া শেষ হলে রেণু শাণিত কণ্ঠে চীৎকার করে উঠল, উঃ, কী ভয়ানক লোক তুমি! বিলেতে ছেলে রেখে এসেচ? তোমার উচিত ছিল তাকে বিয়ে করা। আর সে মাগীই বা কি রকম? কুমারী অবস্থায় এক গণ্ডা ছেলে হল, তারপর বিয়ে করল! মামাবাবুকে একটা টেলিগ্রাম করে দাও, সন্তোষদা তিনি আস্থন, এর একটা হেস্তনেস্ত হয়ে যাক্।

শিবেনবাবু অনুপস্থিত শুনে সন্তোষের আনন্দে যেন একটু ভাঁটা পড়ল। দুটি উদ্দেশ্য নিয়ে সে এখানে এসেছে। প্রথকটি, অর্থাৎ দিবাকরের স্বরূপ রেণুর কাছে প্রকাশ করা, সফল হয়েছে। দ্বিতীয় উদ্দেশ্য ছিল, মলিনীকে উদ্ধার করতে যাবে এই অজুহাতে শিবেনবাবুর নিকট কিছু টাকা আদায় করা। প্রকাশ্যে সে বলল, শিবেনবাবু কি চেঞ্জে গেলেন?

মামাবাবু গেছেন শক্তিপুর, দিদি ও ভগ্নীপতির সঙ্গে। গ্রামে গিয়ে মন শান্ত করবেন।

শক্তিপুর! সন্তোষ একটু চিন্তিত হল। বুড়ো মুকুন্দ রায় এর মধ্যে কাজ গুছিয়ে না ফেলে। তার ওপর সঙ্গে আছেন সৌখীন ভদ্রলোক শিবেনবাবু। তিনি যদি একবার বলেন গ্রামের লোকদের মুকুন্দরায়কে ভোট দিতে, তাহলেই চাকা ঘুরে যাবে। কলকাতার বাসিন্দাদের সম্বন্ধে অদ্ভুত একটা মোহ আছে গ্রামবাসীদের। সন্তোষ ঠিক করল, শক্তিপুর যেতে আর তার বিলম্ব করা উচিত নয়। রেণুকে বলল, আমি আজই শক্তিপুর চললাম। টেলিগ্রামে কাজ হবে না। নিজে গিয়ে শিবেনবাবুকে পাঠিয়ে দিচ্ছি। এটর্ণীর চিঠিখানা বুক পকেটে রেখে সন্তোষ বিদ্রূপের

সুরে বলল, নমস্কার মিঃ সেন, এবার আপনি রেণুর সঙ্গে বোঝাপড়া করুন। অবশ্য আমার মতে আপনি নির্দোষ। এভাবে সন্তান সৃষ্টি মার্কস্ অনুমোদন করেছে। মার্কসের নতুন বইতে এসব কথা আছে, রেণু। বইটা আমি তোমাকে শক্তিপুর গিয়েই পাঠিয়ে দেব।

সন্তোষ চলে গেল। দিবাকর আশা করছিল, রেণু এইবার চেঁচামেচি করে ও তাকে তিরস্কার করে একটা ভয়ানক কাণ্ড করে বসবে। কিন্তু রেণু সে ধার দিয়েও গেল না। সে দিবাকরকে আচমকা প্রশ্ন করল,—তোমার ব্যাঙ্কব্যালান্সের মাসিক সুদ আসে কত?

প্রশ্ন শুনে দিবাকর বিস্মিত হল। রেণু কোন্ দিকে অগ্রসর হচ্ছে বুঝতে না পেরে সে বলল, প্রায় ছশো টাকা। রেণুকে খুসী করবার জন্য সে একটু বাড়িয়েই বলল।

—ওটাকা তো যাবে তোমার বিলিতী ছেলেকে খাওয়াতে পরাতে: আমার সম্পত্তির আয় কত জান? প্রায় ছ হাজার টাকা। আমাকে নির্ভর করতে হবে তার উপর! অবশ্য আইন মত তোমার টাকায় আমি রীতি মত ভাগ বসাতে পারি, কিন্তু সে চেষ্টা আমি করব না। এটুকু উদারতা আমার আছে। স্বাধীনতার সেরা হল অর্থনৈতিক স্বাধীনতা। টাকাকড়ির ব্যাপারে আমরা উভয়েই স্বতন্ত্র থাকলাম। কিন্তু কাজটা তোমার মোটেই ভাল হয়নি। লোক জানাজানি হলে একটা কেলেঙ্কারি হবে।

উত্তেজিতভাবে দিবাকর বলল,—একাজে কেলেঙ্কারির কি পেলে তুমি? বিলেতে যারা যায়, সবারই ওরকম একটা কিছু থাকে। কেউ ফিরে আসে সঙ্গে মেম নিয়ে, কেউ আসে সেখানে ছেলে রেখে। অন্যায়টা কোথায় বল! অল্পবয়সে ওরকম একটু আধটু হয়েই থাকে। বিয়ের আগে অনেকেরই অনেক কিছু থাকে। তোমারও হয়ত ছিল, আমি খোঁজ নেওয়া আবশ্যক মনে করিনি।

রাগে লাল হয়ে রেণু বলল,—বিয়ের আগে আমার কি ছিল শুনি! যার নিজের অতীত কলুষতায় ভরা, সে অপরকে দেখে নিজের ষ্ট্যাণ্ডার্ড অনুযায়ী।

—কেন, তোমার কত বন্ধু! সুশান্ত, সন্তোষ, সুন্দরলাল,—বাড়ী বয়ে তোমার উপকার করতে আসে। বিয়ের পরও ওদের ক্লাবে তোমাকে টানবার জন্য ঝুলোঝুলি! এসবে অবশ্য আমি বাধা দেব না। কিন্তু এতে বোঝায় কি? ওদের সম্বন্ধে তোমার একটা দুর্ব্বলতা নিশ্চয় আছে।

তীব্র চীৎকারের সহিত রেণু বলল,---আলবৎ আছে! তুমি যাও তোমার বিলিতী মেমের কাছে, আমার পথ আমি বেছে নেব।

বাইরে অনেক লোকের কথাবার্ত্তা শোনা গেল, সেই সঙ্গে বেয়ারার কণ্ঠস্বর আগন্তুকদের জানিয়ে দিল শিবেনবাবুর আকস্মিক প্রস্থানের কথা। দিবাকর বলল,—দোহাই তোমার, একটু আস্তে কথা বল, ওঁরা সব এসে গেছেন।

—আস্তে কথা আমি বলতে পারব না। তোমরা হল্লা কর না? যত আস্তে মেয়েদের বেলায়! আমি ঐ লোকদের চীৎকার করে বলে দেব তোমার কীর্ত্তি।

—বলতে পার, কিন্তু তাতে তোমারই ক্ষতি। আমি এখনও তোমাদের সমাজে অপরিচিত, সুনাম দুর্নামের প্রশ্ন আমার বেলায় ওঠে না। লোকে তোমাকে আঙ্গুল দেখিয়ে বলবে, উনি মিসেস সেন যাঁর স্বামী বিলেতে এক কাণ্ড করে এসেছে। সহানুভূতি দেখাতে লোকে তোমার কাছে আসবে, আমার কাছে নয়।

—কী সুন্দর অভিনয় তুমি করতে পার। বিলেত থেকে ফিরেই চলে গেলে গ্রামে। সেখানে পরেশ মাষ্টারের বাড়ী কাটিয়ে দিলে পূরো একটি মাস। এতদিনে বুঝতে পারচি আমি, গ্রামের

মোহ তোমাকে দীর্ঘদিন আটকে রাখেনি, রেখেছিল মাষ্টারের মেয়ে শিবানী।

রেণুর অলক্ষ্যে দিবাকর চমকে উঠল, শিবানীর কথা সে একরকম ভুলেই গিয়েছে।

—তারপর গ্রামের স্কুলে মুরুব্বির মত ঝগড়া করে এলে সন্তোষদার সঙ্গে, ছেলেদের মহাভারত পড়ান হয় না বলে। তোমার নিজের জীবনে অবশ্য মহাভারতের প্রভাব খুব বেশী আছে! এখানে দেখলাম একবার সায়েবী হোটেল, একবার স্বদেশী হোটেল। হ্যাট-কোটও দেখলাম, ধুতি-পাঞ্জাবীও দেখলাম। বিলেত থেকে ফিরে আর কোনও মেয়ের সঙ্গে গোলমাল বাধাও নি তো?

রেণুর কথা শেষ হতেই ঘরে প্রবেশ করল সুশান্ত। সুশান্তর মুখ গম্ভীর, চেহারায় একটা বিশৃঙ্খলার ভাব, যেন সে হঠাৎ এবাড়ীর বিপদের কথা শুনে চলে এসেছে।

সুশান্ত পরমাত্মীয়ের মত চুপিচুপি বলল,—তোমরা আছ দেখচি। শিবেনদা কোথায়? খুব মর্ম্মাহত হয়েচেন নিশ্চয়।

সুশান্তকে দেখে রেণু স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বলল,—তুমি আসাতে বেঁচে গেলাম সুশান্তদা, কি যে একটা দারুণ অশান্তির মধ্যে সময় কাটছিল!

সুশান্ত বলল,—অশান্তি তো হবেই, যে দারুণ কাণ্ড হয়েচে! শিবেনদা বোধহয় ওপরে আছেন।

রেণু বলল,—এ অশান্তি আমার নিজের। মালিনীর জন্য আমি একটুও চিন্তা করচিনে।

—ও একই কথা। তোমার মনোবিকারের মূলে রয়েচে মালিনীর অন্তর্ধান। শিবেনদা কি নীচে নামবেন না?

এবার দিবাকর বলল,—তিনি এখানে নেই, শক্তিপুর গেছেন

—আমিও সেই রকম আশা করছিলাম। এখন মালিনীকে ফিরিয়ে আনার উপায় কি ?

—জাগরণী ক্লাবের প্রতিষ্ঠাতার কাছে এরকম কথা আশা করি নি সুশান্তদা। তোমার ক্লাব প্রশ্রয় দেয় সব রকম প্রোগ্রেসিভ আইডিয়াকে।

—এবিষয়ে আমি তোমার সঙ্গে একমত হতে পারলাম না, রেণু। অসামাজিক ব্যাপারকে প্রশ্রয় দিতে আমি রাজী নই। মালিনীর এভাবে চলে যাওয়া আমি একটুও সমর্থন করি নে। যাক্, শিবেনদা ফিরছেন কবে ?

দিবাকর বলল,—এ বিষয়ে আমরা আপনার মতই অজ্ঞ সুশান্তবাবু।

সুশান্ত একটু হতাশ হল। তার ক্লাবের আর একটি উৎসব এগিয়ে আসছে, এসময় টাকার বিশেষ প্রয়োজন। তার আশা ছিল, শিবেন বাবুর দুঃখে সহানুভূতি দেখিয়ে তাঁর কাছে কিছু আদায় করবে। সে দিবাকরকে বলল,—মিঃ সেন, অপনাকে আমাদের ক্লাবের সভ্য করে নিতে চাই। এককালীন পাঁচশো টাকা দিয়ে আপনি লাইফ মেম্বার হতে পারেন। আর আপনার স্ত্রী তো আমাদের উৎসবের পক্ষে অপরিহার্য্য, কাজেই আপনার কোন আপত্তি হবে না আশা করি।

দিবাকর উত্তর দেওয়ার পূর্ব্বেই রেণু বলল,—মিঃ সেনকে সভ্য করে তোমাদের লাভ হবে না সুশান্তদা। উনি বিশেষ কোথাও যেতে ভালবাসেন না। তাছাড়া উনি ডাক্তার, ডাক্তারের পক্ষে সামাজিক উৎসবে নিয়মমত যোগদান করা সহজ নয়।

—আমাদের একজন ডাক্তার সভ্য বিশেষ প্রয়োজন, রেণু। ক্লাবের সভ্যদের মধ্যে একজনও ডাক্তার নেই।

দিবাকর বলল,—আপনাদের ক্লাবের সভ্য হতে ও চাঁদা দিতে আমার বিশেষ অনিচ্ছা নাই। কিন্তু মিসেস সেনের উৎসবাদিতে যোগদান

সম্পর্কে আমার একটু বক্তব্য আছে। নাচগানে উনি অংশ গ্রহণ করতে পারেন শুধু আমার উপস্থিতিতে। অর্থাৎ জাগরণী ক্লাবের উৎসবে হয় আমরা দুজনে যোগদান করব, নয়ত দুজনে অনুপস্থিত থাকব।

সুশান্ত হেসে বলল,—মালিনীর কাণ্ড দেখে মিঃ সেন সাবধান হয়েছেন। তবে আপনার আশঙ্কা অমূলক, মিঃ সেন! রেণুকে আমি নিয়ে যাব ও নিজে দিয়ে যাব।

রেণু বলল,—তোমার বিলেত যাওয়া উচিত হয় নি। সুশান্ত আজীবন এই দেশে থেকে ও জেল খেটে মনটা যত উদার করতে পেরেছে, তুমি বিলাতে থেকে সেই পরিমাণ অনুদার হয়ে উঠেছ আমি এই তোমাদের দুজনের সামনেই বলছি, ক্লাবে আমি নিজের ইচ্ছামত যাব ও আসব। নিজেকে রক্ষা করবার ক্ষমতা আমার যথেষ্ট আছে, বাধা দিলে ফল খারাপ হবে।

অশোকের একনিষ্ঠ কর্ম্মজীবনে যেন একটা অবসান এসেছে। দীর্ঘ দশবৎসর কাল সে হাতীগাঁয়ে পল্লীসংস্কার কার্য্যে রত আছে। কত বাধা-বিপত্তি তার পথ রোধ করেছে, অশোক সুদৃঢ় ইচ্ছায় ও কর্ম্মপ্রেরণায় সে সব করেছে তুচ্ছ! শহরে থাকাকালীন—গ্রাম সম্বন্ধে তার একটা বিশেষ উচ্চ ধারণা ছিল। কবিতায় ও রচনায় গ্রামের মনোজ্ঞ বিবরণ পড়ে অশোকের মনে হত পৃথিবীতে স্বর্গরাজ্যের অধিষ্ঠান গ্রামেই সম্ভব। পরীক্ষায় গ্রাম সম্পর্কীয় রচনা থাকলে সে প্রশংসায় এরূপ মুখর হয়ে উঠত যে, স্বয়ং পরীক্ষকও বোধহয় চমৎকৃত হঁতেন! মোটের উপর অশোকের ধারণা ছিল যে, গ্রামের অধিবাসীরা সরল এবং গ্রাম্যজীবনে জটিলতার লেশমাত্র নেই।

বিশ্ববিদ্যালয়ের শেষ পরীক্ষায় পাশ করে কিছুদিন কাজের চেষ্টায়

ঘোরাফেরা করল অশোক। চাকুরীর জন্য অনেকের কাছে অনেকরকম উপদেশ ও অপমান হজম করল, এবং অবশেষে চাকুরী সম্বন্ধে হতাশ হয়ে সুন্দরবনের এক ইস্কুলে গেল মাষ্টারী করতে। সেখানে দেখল বাঘে মানুষে তফাত বিশেষ নেই। মাষ্টারিতে ইস্তফা দিয়ে সে ঘুরতে লাগল বাংলাদেশের গ্রামে গ্রামে রিক্ত হস্তে। কয়েকটি স্থান পরিদর্শনের পরই গ্রাম সম্বন্ধে তার ধারণার আমূল পরিবর্ত্তন হল। কোথায় সেই পূর্ব্বকল্পিত গ্রাম্য শোভা, শান্তির নীড়, ছোট ছেনে কুটির, বুকভরা মধু বঙ্গের বধু, গোচারণ মাঠ আর স্বচ্ছসলিলা স্রোতস্বিনী! পরিবর্ত্তে অশোক দেখল, ঘন জঙ্গলে ভরা পুরাতন গৃহ, শীর্ণ অধিবাসী আর বিশীর্ণ গাভী, রুদ্ধস্রোত তটিনী আর অপরিচ্ছন্ন পুষ্করিণী। গ্রামবাসীরা সংস্কারের বোঝায় কুব্জ, অজ্ঞতা ও দীনতা প্রবেশ করছে তাদের মনের রন্ধ্রে রন্ধ্রে। এক কঠিন ফুৎকারে অশোকের স্বপ্ন যেন বিলীন হয়ে গেল।

ঘুরে ঘুরে হাতীগাঁ গ্রামটি পছন্দ হল অশোকের। রেলষ্টেশন থেকে দূরে ও কলিয়ারীর সন্নিকট এই গ্রামটির দুঃখ ও দরিদ্র্য অশোককে বিশেষ অভিভূত করল। তার মনে হল জগতের দীনতা ও হীনতার সকল বোঝা যেন এসে পুঞ্জীভূত হয়েছে এই হাতীগাঁ গ্রামে। একখানিও গোটা বাড়ী তার চোখে পড়ল না,—চালের খড় ওঠা, বেড়া ভাঙ্গা, দাওয়ার মাটি ঝরে পড়ছে। সারা গ্রামে একমাত্র ভাল বাড়ী হল তাড়ীখানা; বেশীর ভাগ লোকই কাজ করে কলিয়ারীতে আর অবসর যাপন করে তাড়িখানায়। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা হাত-পা নাড়তে শিখলেই মা-বাপের সঙ্গে কাজে বেরোয়,—নেংটি পরা শীর্ণ দেহ। অল্পবয়স থেকে তারাও মদ খেতে শেখে আর উপার্জ্জিত অর্থ ব্যয় করে নানারকম খেয়ালে। উপার্জ্জন তাদের আজকাল মন্দ নয়, কিন্তু সঞ্চয় অভ্যাস নেই। কাজের শেষে দিনাবসানে উপার্জ্জিত অর্থ নিঃশেষিত

হয় শৌণ্ডিকালয়ে, আর তারপর রাত্রির অন্ধকারে জীর্ণ মলিন মানবদেহ অচৈতন্য অবস্থায় শায়িত থাকে কুটির প্রাঙ্গনে।

শহরবাসের প্রলোভন অশোক ত্যাগ করল। হাতীগাঁয়ে সে বড় রকম সাহায্য পেল মুকুন্দরায়ের ছেলে রমেনের কাছ থেকে। রমেনের সঙ্গে পরিচয় তার জীবনকে রঞ্জিত করল নূতনভাবে। কয়েক বৎসরের মধ্যেই অশোকের পল্লী-প্রতিষ্ঠান হাতীগাঁয়ের পল্লীজীবনে যোজনা করল নূতন সুর, এবং পল্লীবাসীদের মধ্যে অশোক বিশেষ প্রতিষ্ঠালাভ করল। রমেনের মৃত্যুর পর রায়বাড়ীর সঙ্গে তার সম্পর্কের বন্ধন শিথিল হয়ে এল. কারণ মুকুন্দরায় সপরিবারে এক রকম কলকাতায় বাস করতে আরম্ভ করলেন। দিবাকরের সঙ্গে রেণুর বিবাহ স্থির হওয়ার পূর্ব্বমুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত অশোকের বিশ্বাস ছিল মুকুন্দরায় মৃত পুত্রের ইচ্ছা পূর্ণ করবেন। রেণুকে বিবাহ করার আশা যখন ত্যাগ করতে হল, অশোক অধিকতর উদ্যমে কাজ আরম্ভ করল। এতদিন পর্য্যন্ত সে গ্রামের নানাবিধ উন্নতি সাধনে ব্যাপৃত ছিল, এইবাব আরম্ভ করল কলিয়ারীর শ্রমিকদের মধ্যে কাজ। সে তাদেয জন্য নৈশ বিদ্যালয় স্থাপন করল, নানাবিধ কু-অভ্যাস থেকে তাদের মুক্ত করবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করতে লাগল। কলিয়ারীর মালিক বিরাজবাবু প্রথম প্রথম তাকে উৎসাহ দিলেও, শেষ পর্য্যন্ত তার প্রতি বিরূপ হয়ে উঠলেন। অশোকের শিক্ষার ফলে শ্রমিকদের মধ্যে কয়েকজন নিজেদের অবস্থা সম্বন্ধে বেশ একটু সচেতন হয়ে উঠল, এবং সুদৃঢ় নম্রতার সহিত বিরাজবাবুর কাছে চাইল তাদের ন্যায্য পাওনা। বিরাজ বাবু তাদের দাবী মিটাতে বাধ্য হলেন বটে, কিন্তু মনে মনে অশোকের উপর খড়্গাহস্ত হয়ে থাকলেন। শক্তিপুরে সন্তোষের আগমন তাঁর কাছে মনে হল দৈবপ্রেরিত। অশোকের বিরুদ্ধে তাঁর প্রথম কাজ হল তার নাইট স্কুল তুলে দেওয়া ও সন্তোষের পরামর্শ অনুযায়ী শ্রমিকদের একটি ইউনিয়ন গঠন। বিরাজবাবু

সন্তোষকে অর্থ সাহায্য করতে কার্পণ্য করলেন না, এবং ইউনিয়ন থেকেও সন্তোষের অর্থাগমের একটি পথ হল।

শ্রমিকদের মধ্যে অশোকের অনুরক্ত লোকের অভাব ছিল না। তাদের সাহায্য ও তাদেরই প্রদত্ত জমিতে অশোক পুনরায় তার নাইট স্কুলের পত্তন করল। পুরাতন ছাত্রেরা প্রায় সকলেই ফিরে এল, অশোকের শিক্ষা একেবারে নিষ্ফল হয় নি। রুকন, রণবীর, নটবর,—ছাত্রেরা রাত্রে এসে আবার বসল নূতন নাইট স্কুলের দাওয়ায়। অশোক আবার আরম্ভ করল ইতিহাসের কাহিনী,—বুদ্ধ, অশোক, চন্দ্রগুপ্ত।

শত কর্ম্মের মধ্যে ডুবে থাকল অশোক। তবুও মানসিক একটা শূণ্যতা তাকে যেন পেয়ে বসল। গ্রামে বাসকালে দুটি নারী তার জীবনে এসেছে প্রত্যক্ষভাবে,—রেণু ও শিবানী। রেণু হয়ে গেল মিসেস সেন, বাকী থাকল আর একজন। কিন্তু শিবানীর ব্যাপারে অশোক নূতন এক অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হল।

সেদিন হাতীগাঁয়ে সকলেই এসেছিলেন,—পরেশবাবু, কাত্যায়নী, শিবানী আর তার ভাইবোনেরা। অশোক তাঁদের অভ্যর্থনা করল পরম আত্মীয়ের মত। তারপর পরেশবাবু ক্ষণিকের অবসরে তাকে জানিয়ে দিলেন শিবানীর বর্তমান অবস্থা। অশোক অনেক্ষণ কথা বলতে পারে নি, ব্যাপারটা তার এতই অদ্ভুত মনে হয়েছিল। সে শুধু ভাবছিল, এই লোকটাই রেণুর স্বামী হয়েছে! পরেশবাবু নিঃশব্দে অন্যদিকে তাকিয়ে ছিলেন। অবশেষে শিবানীকে এই অবস্থায় বিয়ে করতে ইচ্ছুক বলে অশোক সম্মতি জানাল। কাত্যায়নী শুনে আনন্দ প্রকাশ করলেন ও অশোকের মাথায় হাত রেখে আশীর্ব্বাদ করতে গিয়ে কেঁদে ফেললেন।

মুস্কিল বাধাল শিবানী। পরেশবাবু কোন অনুরোধ করলেন না বটে, কিন্তু কাত্যায়নীর শত অনুরোধ ও উপরোধেও সে রইল অটল।

সর্ব্বশেষে তাকে অনুরোধ করল অশোক স্বয়ং। শিবানী বলল,—বিয়ে আমি তোমাকে করতে পারব না অশোকদা, আমার এই অশুচি দেহমন নিয়ে তোমার মত সৎ লোকের স্ত্রী আমি হতে পারব না। তার চেয়ে আর এক কাজ করি। তোমাদের এখানে আমাদের মত মেয়েদের জন্য একটা আশ্রম আছে দেখছি, আমি সেইখানে থেকে তোমার অনেক সাহায্য করতে পারব। মাবাপের বোঝা হয়ে আর থাকতে পারব না। শিবানীর মুখের দিকে তাকাল, চোখেমুখে তার দৃঢ় সঙ্কল্পের ছাপ। অশোক বুঝতে পারল, অনুরোধে আর কোন ফল হবে না; অগত্যা শিবানীর প্রস্তাব মেনে নেওয়া ছাড়া তার আর উপায় থাকল না।

তারপর থেকে শিবানী আছে হাতীগাঁয়ের নারী-আশ্রমে। পরেশবাবু ও কাত্যায়নী সকল দিক বিবেচনা করে এ ব্যবস্থায় সম্মতি দিয়েছেন। নারী-আশ্রম অশোকের প্রতিষ্ঠিত হলেও, তত্ত্বাবধানের ভার প্রতিষ্ঠাতার উপর নয়। আশ্রমের সমস্ত ভার অশোকের ছাত্র গৌর দাসের মা মাতঙ্গিনীর উপর। পঞ্চাশ বৎসরের এই অনভিজ্ঞা গ্রাম্য নারী এরকম দুরূহ কাজ প্রতিদিন অসীম দক্ষতার সঙ্গে সম্পন্ন করে যাচ্ছে—শিবানী সত্যই বিস্মিত হয়ে গেল। আশ্রমের অন্তঃপুরিকার সংখ্যা নেহাত কম না, কুড়ি একুশ জন হবে। তার মধ্যে একমাত্র শিবানী একটু অন্য ধরণের। তার জন্য স্বতন্ত্র একটা কক্ষ নির্দ্দিষ্ট হয়েছে, তার আহারাদির ব্যবস্থাও হল পৃথক। মাতঙ্গিনী স্বয়ং মাতৃসুলভ স্নেহে তাকে অভিভূত করে ফেলল।

অশোকের সঙ্গে তার দেখা হত সপ্তাহে মাত্র একবার। অশোক আসত সাপ্তাহিক খরচের টাকা দিতে। শিবানী একদিন বলল,—বসে বসে সময় আর কাটতে চায় না অশোকদা, একটা চরকা কিন্তু তোমার দেবার কথা ছিল।

অশোক বলল,—চরকা তুমি একটা পেতে পার, কিন্তু তুলোর অভাব হয়েছে। কলকাতা গিয়ে তুলো আনতে হবে।

—কলকাতায় গেলে টুকুর একটা খবর নিয়ে এস। সেই যে পরীক্ষা দিতে গেল ছেলে, আর কোন খবর নেই।

টুকুর খবর অশোক জানে, নকল করতে গিয়ে পরীক্ষার হল থেকে সে বহিষ্কৃত হয়েছে। হাতীগাঁয়ের গৌরহরি ফিরে এসেছে, শক্তিপুরের কোন ছেলে এখনও বাড়ী ফেরেনি। এই দুঃসংবাদ সে পরেশবাবুদের বলতে সাহস করেনি। সে শিবানীকে বলল, সন্তোষবাবুর সঙ্গে সব ফিরবে বোধহয়, তিনিও এখনও ফিরে আসেন নি।

শিবানী পথের দিকে তাকিয়েছিল। কয়েকজন অপরিচিত ব্যক্তিকে সেদিকে আসতে দেখে সে অশোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করল। অনেকক্ষণ দেখে অশোক বলল, একজন রায়মশায়ের মত দেখাচ্ছে, শিবানী তুমি ঘরের ভিতর যাও। শিবানীকে এই অবস্থায় পরিচিত দৃষ্টির অন্তরালে রাখিতে তার আর চেষ্টার অন্ত ছিল না।

রায়মশায়কে অভ্যর্থনা করতে অশোক এগিয়ে গেল। মুকুন্দ রায় একা আসেননি, সঙ্গে একজন অপরিচিত ভদ্রলোক। অশোককে তিনি একেবারে আলিঙ্গন করে বসলেন। তার এরূপ আন্তরিকতার সহিত অশোক পরিচিত নয়। সম্ভাষণাদির পর রায়মশায় বললেন, এঁকে তোমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিই। ইনি হলেন গিয়ে শিবেন, রেণুর মামা। শক্তিপুরে কিছুদিন কাটিয়ে যাবেন। তোমার প্রতিষ্ঠান দেখাতে এনেছি।

অশোক পরম সমাদরে অতিথিদের তার কুটীরে নিয়ে গেল। পথচলার সময় শিবেনবাবু সপ্রশংস দৃষ্টিতে চারিদিকে তাকাচ্ছিলেন। শক্তিপুর থেকে হাতীগাঁয় এসে তিনি অনেকটা পরিবর্তন লক্ষ্য করলেন। পাতায় ছাওয়া ছোট ছোট কুটীর একটা পরিচ্ছন্ন পরিবেশে পূর্ণ, কয়েকটি

কুটীর থেকে তাঁত ও চরকার সম্মিলিত শব্দ শোনা যাচ্ছে। যে কয়েকটি লোকের সঙ্গে পল্লীপথে তাঁদের সাক্ষাৎ হল, সকলের অঙ্গেই হাতে বোনা কাপড়।

শিবেনবাবুরা লক্ষ্য করলেন, গ্রামের মধ্যে সবচেয়ে ছোট বাড়ী হল অশোকের। অশোক তাঁদের বসতে দিল পরিষ্কার করে নিকান একটি গাছতলায়। রায়মশায় বললেন,—ঘরে বসলেই হত, অনেক কথা আছে তোমার সঙ্গে। অশোকের পাশে একটি ছেলে দাঁড়িয়েছিল। সে বলল, মাষ্টারমশায়ের ঘরে একচুলও জায়গা নেই সেক্রেটারীবাবু। ওঁর বিছানাপত্তর, রান্নার জিনিষ, আরও কত কি টুকিটাকিতে বোঝাই।

পরিচিত কণ্ঠস্বর শুনে রায়মশায় তাকিয়ে দেখেন গৌরহরি। তাঁর মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল! তিনি বললেন, আমি ভাবছিলাম পরীক্ষার পর তুমি একবার আমার সঙ্গে দেখা করবে কলকাতায়।

গৌরহরি বলল,—আপনি তো বলেননি সেক্রেটারীবাবু, আপনি বললেই আমি দেখা করতাম।

এ ধরণের উত্তর সামান্য একটি গ্রাম্য বালকের কাছে পাওয়া রায়মশায়ের জীবনে নূতন। তাঁর কাছে লোক গেছে বরাবর বিনা অনুরোধে উপযাচক হয়ে। কিন্তু এখানে চুপ করে থাকাই বুদ্ধিমানের কাজ, কারণ গৌরহরির বাপও একজন ভোটার। তিনি শিবেনবাবুকে দেখিয়ে গৌরহরিকে বললেন,—তোমাদের গ্রামের আমার একরকম সব দেখা আছে, তুমি এঁকে একটু ঘুরিয়ে আন।

প্রথম দর্শনেই শিবেনবাবু এই গ্রামের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন, মুকুন্দরায়ের কথায় কোন রূপ মন্তব্য প্রকাশ না করে গৌরহরির সঙ্গে প্রস্থান করলেন। শিবেনবাবুকে এইভাবে বিদায় করায় অশোক বুঝতে পারল, রায় মশায়ের কোন বিশেষ কথাবার্ত্তা আছে তার সঙ্গে।

রায়মশায়ই প্রথমে আরম্ভ করলেন,—বেশ ছেলে তোমার এই গৌরহরি। দিব্যি চট্‌পটে। লেখাপড়ায় বোধহয় তেমন—

—না রায়মশায়, লেখাপড়ায় গৌর ওদের ক্লাসের ফার্ষ্ট বয়। পরীক্ষায় ওর স্কলারশিপ পাওয়ার কথা।

—বল কি হে! শক্তিপুর ইস্কুলের এমন সৌভাগ্য হবে! ও তাহলে সন্তোষের কাছে পড়েনি বোধহয়। খবর শুনেছ তো আর সব ছাত্রদের। নকল করতে গিয়ে সব ধরা পড়েছে পরীক্ষার হলে।

আশ্চর্য্য হবার কিছু নেই রায়মশায়। ইতিহাসের শিক্ষক ইতিহাস না পড়িয়ে ছাত্রদের যদি সমাজ জীবনে উচ্ছৃঙ্খলতা সৃষ্টি করবার শিক্ষা দেন, তাহলে ফল এইরকমই হবে।

—যাক্। এ সম্বন্ধে পরে চিন্তা করা যাবে।• এ দিকের খবর কি?

রায়মশায়ের কথার সুরে অশোক তাঁর মনের ভাব বুঝতে পারল। সে একটু উত্তেজিত ভাবে বলল,—সেক্রেটারী ইলেকশন ব্যাপারে আমি আপনাকে অন্যায়ভাবে কোন সাহায্য করতে পারব না। সব নির্ভর করছে অভিভাবকদের উপর। সেক্রেটারি হিসাবে আপনি যদি এ পর্য্যন্ত ভালভাবে কাজ করে থাকেন, আপনার পুনরায় নির্ব্বাচিত হওয়ার পথে কোন বাধা থাকবে না। বিরাজবাবুর টাকা ও সন্তোষবাবুর প্রোপাগ্যাণ্ডা আপনার কোন ক্ষতি করতে পারবে না। •

অশোকের এই স্পষ্ট উক্তিতে মুকুন্দরায় অত্যন্ত বিরক্তি বোধ করলেন। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, অশোকের তরফ থেকে অন্ততঃ কিছু সাহায্য তিনি পাবেন। তাঁর মুখে হতাশার চিহ্ন দেখে অশোক বলল,—আপনার উপর রাগ বা অভিমানবশে আমি এরূপ করছি না রায়মশায়। রেণুর সঙ্গে আমার বিয়ে হলে অথবা আমাদের নাইট ইস্কুলের জন্য আপনি জমি ছেড়ে দিলেও, আমি এর চেয়ে বেশী কিছু করতে পারতাম না। শক্তিপুর ইস্কুলের সম্বন্ধে ভাল রিপোর্ট আমাদের কাণে আসে না।

ইস্কুলের এই যে দুর্ণাম হল, এর জন্য শুধু সন্তোষবাবু নয়, আপনি ও হেড্ মাষ্টারমশায়ও দায়ী। আপনাকে এইটুকু বলতে পারি যে, হাতীগাঁর ভোট আপনি পাবেন। শক্তিপুর ও কলিয়ারীর ভোট নির্ভর করছে আপনার উপর।

বক্তব্য শেষ করে অশোক পথের দিকে তাকাল। মুকুন্দরায় বললেন,—শিবেন কোথায় গেল? আজ তবে চলি আমরা।

—তিনি গেলেন গৌরহরির সঙ্গে, আমাদের প্রতিষ্ঠান দেখতে! আপনিও তো সব দেখেন নি বোধ হয়। ইদানিং আরও কয়েকটি কাজের বিভাগ বাড়ান হয়েছে।

—আজ আর সময় হবেনা। আর একদিন না হয়—

অকস্মাৎ দ্রুত পথচলার শব্দে রায়মশায় চকিত হয়ে তাকালেন পথের দিকে। বললেন,—ব্যাপার কি হে, ষ্টেশনের কুলিটা ছুটতে ছুটতে আসছে!

তাঁর কথা শেষ হতেই পঞ্চু ও সীতারাম ঝড়ের বেগে এসে অশোকের পায়ের কাছে বসে পড়ল, বলল.—মাষ্টার মশায়, শীগগীর চলুন। ভারী বিপদ আমাদের!

অশোক কিছু বলবার পূর্ব্বেই রায়মশায় বললেন,—কাদের বিপদ রে!

—ইষ্টিশন মাষ্টার মশায়ের।

—এরা তোমার নাইট স্কুলের ছাত্র নিশ্চয়, অশোক। কথাবার্ত্তা বলতে শিখেছে।

অশোক বলল,—তোমরা শিবানীকে নিয়ে গরুর গাড়ীতে এস, আমি চললাম। রায়মশায়, আপনিও চলুন, শিবেন বাবুকে গৌরহরি পৌছে দেবে।

রায়মশায় বললেন,—শিবানী এখানে! পরেশ মাষ্টার তাহলে তোমাকে জামাই করেছে?

অশোক সংক্ষেপে বলল,—না, শিবানী এখানে নারী-আশ্রমে থাকে। আমি চললাম রায়মশায়, আপনি শিবেনবাবুর সঙ্গেই আসবেন!

বিস্ময়াহত রায়মশায়কে কথা বলার অবকাশ না দিয়ে অশোক দ্রুত-পদে শক্তিপুর ষ্টেশনের দিকে প্রস্থান করল!

পরেশবাবুর কোয়টার্সে অশোক যখন উপস্থিত হল, বেলা অনেকখানি অগ্রসর হয়েছে। শীতের শেষ, হাওয়ায় তখনও স্নিগ্ধতার আমেজ মিশানো। রোদের তেজ তেমন প্রখর হয়নি। অশোক কিন্তু পরেশ বাবুর শয়নগৃহে উপস্থিত হল ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে। উদ্বেগ ও পথশ্রমে তার অর্দ্ধমলিন, খদ্দরের ফতুয়া স্বেদজলে অভিষিক্ত, সে যেন সবে স্নান করে উঠেছে। অশোক মোহাবিষ্টের মত ঘরের মেঝেয় বসে পড়ল। মুহূর্ত্তে আত্মসংবরণ করে সে তাকাল চারিদিকে! বিছানায় পরেশবাবু শুয়ে আছেন, জীবিত কি মৃত ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। তাঁকে ঘিরে দাঁড়িয়ে আছেন ক্যাত্যায়নী ও ছেলেমেয়েরা। একটা অস্বস্তির ভারে সারা ঘরখানি যেন থমথম মকরেছে।

অশোকের দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থেকে কাত্যায়নী বললেন,—শিবু কই? তাকে কোথায় রেখে এলে?

—সে আসছে পিছনে,—গরুরগাড়ীতে পঞ্চুদের সঙ্গে। মাষ্টার মশায়ের কি হল মা!

কাত্যায়নী শুধু বললেন,—একবার নাড়ীটা দেখ তো অশোক! বড় রায়বাড়ীর কর্ত্তার কাছে কি একটা খবর পেয়ে সেই যে আটটার সময় চেয়ার থেকে ঘুরে পড়ে গেছেন, এখন পর্য্যন্ত জ্ঞান ফিরে আসেনি।

বড়রায়বাড়ী কর্ত্তার আনীত খবর· কাত্যায়নী গোপন করলেও অশোকের তা অজানা ছিল না। শিবানীর ব্যাপারেই পরেশবাবুর মানসিক আঘাত যথেষ্ট হয়েছিল, এইবার পরীক্ষার হলে জ্যেষ্ঠপুত্র টুকুর

কীর্ত্তি তাঁকে মরণের পথে ঠেলে দিল। অশোক মেঝের উপর থেকে উঠে পরেশবাবুর মুখের দিকে তাকাল। তাঁর সারা মুখে পরিস্ফুট হয়েছে সংসারের প্রতি বিরাগ ও ঘৃণা। বুকের স্পন্দন থেমে গেছে, নাড়ীতে প্রাণের চিহ্নমাত্র নেই। অশোকের মনে হল, মৃতের এরূপ মুখবিকৃতি সে পূর্ব্বে দেখে নি। সংসারের প্রতি যে পুঞ্জীভূত ঘৃণা পরেশবাবু মনের মধ্যে পোষণ করে এসেছিলেন, তারই অভিব্যক্তি হয়েছে পরে তাঁর মুখমণ্ডলে।

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে অশোক বলল,—মাষ্টার মশায় নাড়ী দেখার বাইরে চলে গেছেন।

কাত্যায়নী কথা বলতে চেষ্টা করলেন, কিন্তু ঠোঁট দুটো শুধু কাঁপতে লাগল। অশোক নিঃশব্দে ঘর থেকে বেরিয়ে বারান্দায় দাঁড়াল। সম্মুখে রেলের লাইন আর দূরে দেখা যাচ্ছে দিগনগর কলিয়ারী। রেললাইনের পাশে সিগন্যাল পোষ্ট, তারই কাছাকাছি পল্লবিত গাছটা আপন মহিমায় শাখাপ্রশাখা বিস্তার করে দণ্ডায়মান। এই গাছের নীচেই শিবানীর ক্রন্দনরতা মূর্ত্তি অশোকের দৃষ্টিগোচর হয়েছিল। বাহির বিশ্বে সবই যথাস্থানে বিদ্যমান, কারও স্থানচ্যুতি ঘটেনি। শুধু এই দরিদ্র পরিবারের মুহূর্ত্তকালের মধ্যে চরমতম সর্ব্বনাশ সংঘটিত হয়ে গেল। এর জন্য দায়ী কে? অশোক বিচার করে দেখল, এর জন্য দায়ী বেণোজলের মত শক্তিপুরে আগত দুটি লোক—দিবাকর ও সন্তোষ। কিন্তু পরক্ষণেই আত্মগ্লানিতে তার মন ভরে গেল। এই বিপর্য্যয়ের জন্য সেও কতকটা দায়ী। পরেশবাবু প্রথমে যখন তাকে শিবানীকে বিবাহ করতে অনুরোধ করেন, তখন তাঁর কাতর অনুরোধ রক্ষা করতে সে পারেনি। সে পরেশবাবু জামাই হলে, তাঁকে হয়ত এরূপ শোচনীয়ভাবে মৃত্যু বরণ করতে হত না।

অশোক হাতীগাঁর সড়কের দিকে তাকিয়েছিল; শিবাণীকে নিয়ে গরুর গাড়ীতে আসতে পঞ্চুদের এত দেরী হচ্ছে কেন? অশোক একবার

ঘরের ভিতর তাকাল। পরেশবাবু মৃত দেহ একটা সাদা কাপড় দিয়ে আগাগোড়া ঢাকা। কাত্যায়নী হাতবাক্স খুলে বিড়্‌বিড়্‌ করছেন, বোধহয় টাকাকড়ির হিসেব করছেন। ছেলেমেয়েরা মৌন, নিস্তব্ধ। হাতবাক্স বন্ধ করে কাত্যায়নী ডাকলেন,—অশোক।

অশোক সাড়া দিলে তিনি বললেন,—এই নাও, কুড়িয়ে বাড়িয়ে এই পনেরটি টাকা হল। এই নিয়ে ওঁর শেষ কাজটি করে দাও।

কাত্যায়নীর চোখ লাল, চোখের জল গালে শুকিয়ে গেছে। উদ্গত অশ্রু চাপতে গিয়ে বুক ফুলে উঠছে। আলুথালু চুল, কাত্যায়নী যেন স্বামীর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে সর্ব্বহারা বিধবার বেশ পরিগ্রহ করেছেন;

অশোক হাত পেতে টাকা নিল। কাত্যায়নীর ইচ্ছাকে অশ্রদ্ধা করতে তার প্রবৃত্তি হল না। ক্ষণকাল পরে গরুর গাড়ীর শব্দ শুনে সে বাইরে এল। পঞ্চু ও সীতারাম গাড়ীর সঙ্গে হেঁটে হেঁটে আসছে। অশোক শিবানীর জন্য অপেক্ষা করতে লাগল। গাড়ী থেকে নামলেন মুকুন্দরায় ও শিবেনবাবু। তাঁদের পরে নামল গৌরহরি। অশোকের দৃষ্টিতে গভীর বিস্ময় দেখে পঞ্চু বলল—শিবু দিদি এলনা মাষ্টারমশায়। গৌরহরি একটা চিঠি দিল। অশোকের হাতে। অশোক খুলে পড়ল,—"বাবার মৃতদেহের সম্মুখে আমি দাঁড়াতে পারবো না; দেহে ও মনে আমি এখনও অপবিত্র। শিবানী"। শিবানীর চিঠি পড়ে অশোক স্তম্ভিত হল। হাতীগাঁর নারী আশ্রমে এতদিন বাস করেও শিবানীর চিত্ত সংশোধিত হয় নি! এর চেয়ে বেশী সে কি প্রত্যাশা করে!

মুকুন্দরায় বললেন,—কাজটা ভাল হয়নি অশোক, অতবড় অবিবাহিত মেয়েকে তোমার কাছে রাখা।

অশোক উত্তর দেওয়ার পূর্ব্বে শিবেনবাবু বললেন,—কথাটা ঠিক হল না রায়মশায়। মেয়েটি আছে নারী আশ্রমে, অশোকবাবুর কাছে নয়।

সম্মানের পথ বেছে নিয়েছে সে, আমাদের ঘরের মেয়েদের মত কলঙ্কের পথে পা বাড়ায় নি।

মুকুন্দরায় ব্যস্ত হয়ে বললেন,—থাক্, থাক্ ওসব কথা পরে হবে। এখন এদিককার ব্যাপার কি? মাষ্টার তোমাকে হঠাৎ ডেকে পাঠাল যে!

অশোক বলল,—মাষ্টার মশায় মারা গেছেন।

শিবেনবাবু বললেন,—হঠাৎ! এই সেদিনও তাঁকে দেখলাম ষ্টেশনে। আমার সঙ্গে আলাপ করলেন।

মুকুন্দরায় বললেন,—লোকটা দোষেগুণে ছিল একরকম। যাক্, ওঁর সৎকারের ব্যবস্থা কি করলে?

ভিতর থেকে চাপাকান্নার শব্দ আসছে। কাত্যায়নী কাঁদছেন, ছেলেমেয়েরা মায়ের সঙ্গে যোগ দিয়েছে। পঞ্চুর কাছ থেকে কাত্যায়নী খবর পেয়েছেন, শিবানী আসবে না। এই খরব পেয়ে তিনি আর আত্মসংবরণ করতে পারেন নি। বড়ছেলে ও বড়মেয়ে, দুজনেই এ সময় অনুপস্থিত।

অশোক মাথা নীচু করে কি ভাবছিল। মুখ তুলে গৌরহরিকে বলল, ব্যবস্থা একটা করে ফেল। তারপর রায়মশায়কে বলল, লোকের অভাব হবে না; আমি, আপনি, শিবেনবাবু, গৌর—

বাধা দিয়ে রায়মশায় বললেন,—আমাকে আর শিবেনকে বাদ দাও হে, অশোক। বুড়ো হয়ে গেছি, তার উপর বাতটা আবার জেঁকে বসেছে।

শিবেনবাবু বললেন,—আমার কোন আপত্তি নেই। ছেলেবেলায় একাজ ঢের করেছি।

বিদ্রূপের সুরে মুকুন্দরায় বললেন,—তুমি! ঐ দেহ নিয়ে তুমি মড়া পুড়িয়েছ!

শিবেনবাবু হেসে বল্‌লেন,—দেহ আমার চিরকাল এরকম ছিল না রায়মশায়। বাপের সম্পত্তি পেয়ে হঠাৎ ফুলে গেল।

খোঁচাটুকু রায়মশায় নীরবে হজম করলেন, কেননা বাপের মৃত্যুর পর জমীদারী হাতে পেয়ে তাঁরও দেহের বিশেষ পরিবর্ত্তন সংঘটিত হয়েছিল।

অশোক বলল,—রায়মশায় না গেলেও লোকের অভাব হবে না। পঞ্চু সীতারাম আছে।

রায়মশায় বললেন,—তারপর অন্তা ম্যাথর আছে, ঘনা মুচি আছে। যার অত বড় মেয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়, তাকে শ্মশানে নেবার জন্য এরাই উপযুক্ত লোক!

কথাটা শিবেনবাবুকে মর্ম্মান্তিক আঘাত করল। তিনি বললেন,—মন্তব্যের প্রয়োজন নাই, রায়মশায়! স্থানকাল বিচার করুন! আপনি যখন যাবেন না ঠিক করেছেন, তখন আর কোন কথাই উঠতে পারে না।

অশোকের মুখচোখ লাল হয়ে উঠেছিল, কি একটা রূঢ় উত্তর তার মুখের কাছে এসে বেধে গেল। সে কোন কথা না বলে আস্তে আস্তে ঘরের ভিতর চলে গেল।

শিবেনবাবু বললেন,—কথাটা বলা ঠিক হয় নি, রায়মশায়, বিশেষ আমাদের ঘরেও যখন কলঙ্ক রয়েছে।

রায়মশায় উত্তেজিত হয়ে বললেন,—তোমার মেয়ে আর পরেশমাষ্টারের মেয়ে! তুলনাই হতে পারে না। বড়ঘরের ব্যাপার আলাদা, মাষ্টারের মেয়ের—

এই সময় অশোক ঘর থেকে বেরিয়ে বলল,—আমরা রেডি, শিবেনবাবু।

শিবেনবাবু তাড়াতাড়ি অশোকের সঙ্গে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করলেন। একটু পরে বিস্মিত রায়মশায়ের দৃষ্টির সম্মুখে পরেশবাবুর দেহ বহন করে

অশোক, শিবেনবাবু, গৌরহরি ও পঞ্চু প্রস্থান করল। সহগামী হলেন কাত্যায়নী, ছেলেমেয়েরা ও সীতারাম।

চারিদিক যেন খাঁ খাঁ করছে। রায়মশায়ের মনে হল, তিনি যেন সমাজ পরিত্যক্ত জীবের মত এক মহাশ্মশানে দাঁড়িয়ে আছেন। তিনি আর অপেক্ষা করলেন না, সভয়ে বাড়ীর দিকে পা বাড়ালেন।

শ্মশান থেকে হাতীগাঁ ফিরতে অশোকের সন্ধ্যা হয়ে গেল। প্রায় দশঘণ্টা তার শরীরের উপর দিয়ে যেন একটা ঝড় বয়ে গেছে। পরেশবাবুর শোচনীয় মৃত্যু, মুকুন্দরায়ের অশিষ্ট-মন্তব্য তার মনের উপর যথেষ্ট প্রতিক্রিয়া এনে দিল। শ্মশানের কার্য্য সমাধার পর কাত্যায়নী ও ছেলেমেয়েদের বাড়ী পৌঁছে দিয়ে সে শিবেনবাবুকেও খানিকটা পথ এগিয়ে দিল। সারা সময় সে কাটিয়েছে দুঃখী লোকের মধ্যে,—কাত্যায়নী তারপর শিবেনবাবু। শিবেনবাবু তাকে পরম নির্ভরতার সঙ্গে মালিনী-সংক্রান্ত সকল ঘটনাই খুলে বলেছেন। অশোক তাঁকে আশ্বাস দিয়েছে, সে স্বয়ং মালিনীকে উদ্ধার করে আনবে। পরেশবাবুর স্ত্রী ও ছেলেমেয়েদের সম্বন্ধেও অশোক মনে মনে একটা ব্যবস্থা করে ফেলেছে। তাঁদের সে হাতীগাঁর প্রতিষ্ঠানে আশ্রয় দেবে। অবশ্য শোকাতুরা কাত্যায়নীকে এ প্রসঙ্গে কিছু বলবার অবসর সে এখনও পায়নি।

হাতীগাঁয়ে নিজের কুটীরে পা দিতেই অশোকের শরীর যেন ভেঙ্গে পড়ল। তার শিরা উপশিরা দপ্ দপ্ করছে, পা যেন ভারে মাটিতে নত হয়ে পড়ছে। অশোক হাত পা এলিয়ে মেঝের উপর বসে পড়ল। ক্ষুধাতৃষ্ণা তার একেবারে চলে গেছে, সমস্ত শরীর একটা অস্তিত্বহীন অনুভূতির মধ্যে বিলীন হয়ে যাচ্ছে।

গৌরহরি কোথায় গিয়েছিল, এসে দেখল অশোক খালি মেঝের

উপর শুয়ে আছে? বোধহয় ঘুমিয়ে পড়েছে। সে চুপিচুপি ডাকল,—মাষ্টারমশায়!

অশোক চোখ মেলে দেখে গৌরহরি। সে ব্যস্ত হয়ে উঠে বসল,—এই অসময়ে গৌরহরি!

গৌরহরি উদ্বিগ্নমুখে বলল,—মা খবর পাঠিয়েছেন নারী আশ্রম থেকে, শিবানীদিদিকে আজ দুপুর থেকে পাওয়া যাচ্ছে না।

উঠে দাঁড়াল অশোক! তার চেহারা দেখে গৌরহরি শঙ্কিত হল। সে বলল, মাকে এখানে ডেকে আনি মাষ্টারমশায়, আপনি বসুন।

—তা হয় না গৌর। এখানকার নিয়ম অনুসারে তাঁর কাছে আমাকেই যেতে হবে, তিনি আসতে পারেন না।

অশোক ছুটে বেরিয়ে গেল, গৌরহরি তাকে অনুসরণ করল। সন্ধ্যার অন্ধকার তখন গাঢ় হয়ে উঠেছে। আকাশে অগুণতি নক্ষত্র আর বাতাসে বনফুলের গন্ধ। দিগ্‌নবার কলিয়ারীর ইঞ্জিনের ফার্নেস থেকে লাল আলো অনেক দূর ছড়িয়ে পড়েছে। লেবার কলোনী থেকে ভেসে আসছে একটা হল্লার সুর। অন্যান্য দিন অশোকের মন এদিকে আকৃষ্ট হয়, আজ সে কোন দিকে দৃক্‌পাত না করে সোজা নারী-আশ্রমে উপস্থিত হল। সেখানে গৌরহরির মা তাকে যা বললেন, তার মর্ম্ম এই।

পরেশবাবুর শারীরিক অবস্থা শুনে শিবানী অত্যন্ত মর্ম্মাহত হয়। সে পুনঃ পুনঃ বলে যে পরেশবাবু আর বাঁচবেন না। পঙ্কু ও সীতারামের প্রস্থানের পর সে নিজের ঘরে বসে থাকে দরজা বন্ধ করে এবং সকলের পুনঃ পুনঃ অনুরোধ সত্ত্বেও কোন রকম খাদ্য স্পর্শ করে না। দুপুরের দিকে শিবানীকে দেখা যায় আশ্রমের প্রাঙ্গণে পায়চারী করছে। তখন তার চেহারা দেখে সকলে ভীত হয়। অলঙ্কারশূন্য দেহ, মাথার চুল চোখেমুখে ছড়িয়ে পড়েছে, আধময়লা একখানা শাড়ীতে তার সারা দেহ আবৃত। একটু পরে সকলের অনুরোধে সে পুকুরে স্নান করতে যায়,

সীঙ্গ কাউকে নিতে সে রাজী হয়নি। একঘণ্টা কেটে গেলে পর সকলের খেয়াল হয়, শিবানী পুকুর থেকে ফেরেনি! আশ্রমের অধিবাসীরা দল বেঁধে ভেঙ্গে পড়ে পুকুরের ধারে, কিন্তু পুকুরের ধারে শিবানীর দেখা নেই। অনেকক্ষণ খোঁজাখুঁজির পর তারা আশ্রমে ফিরে আসে।

গৌরহরির মা কাঁদতে লাগলেন। বললেন, সে যে আত্মহত্যা করেছে এ বিষয়ে আমার কোন সন্দেহ নেই অশোক। পেটে তার ছেলে, এই পাঁচ মাস। জীবনভোর অসুখী থেকে গেল মেয়েটা।

শ্রান্ত অশোকের সমস্ত শরীর যেন ইলেক্‌ট্রিক শকের আঘাতে চঞ্চল হয়ে উঠল্। অশোক নারী-আশ্রম থেকে ছুটে বেরিয়ে গেল।

চারিদিকে অন্ধকারের জটলা, বাতাসে কি যেন ফিস্ ফিস্ শব্দ। সুষুপ্ত পল্লী পথ, যাত্রী শুধু অশোক। সে চলেছে দিক্‌হারার মত; হাতীগাঁর সীমা ছাড়িয়ে এক অনির্দ্দিষ্ট লক্ষ্যের পানে। কত কঙ্করাকীর্ণ মাঠ সে পার হয়ে গেল, কলিয়ারীর লেবার কলোনির আলো আর দেখা যাচ্ছে না, শক্তিপুর ষ্টেশনের আলো দেখা যাচ্ছে। অশোকের মোহ ধীরে ধীরে কেটে গেল। পারিপার্শ্বিক অবস্থা সম্বন্ধে যখন সে সচেতন হল, সে তখন শক্তিপুর ষ্টেশনের প্রাঙ্গণে একটা আলোর নীচে দাঁড়িয়ে।

পঞ্চু ও সীতারাম সেখানে বসে গল্প করছিল, অশোককে দেখে বিস্ময়ে ভেঙ্গে পড়ল তারা।

—এঃ, মাষ্টারমশায় যে! এত রাতে?

অশোক বলল,—এই বেড়াতে এলাম একটু। মাষ্টারমশায়ের বাড়ী সব শুয়ে পড়েছেন তো?

পঞ্চু বললে,—দেখে আসি মাষ্টারমশায়। আর একটা রাত বৈত নয়, নতুন মাষ্টারমশায় কালই আসচেন। চল গো সীতেরাম, দেখে আসি একবার কোয়ার্টারটা।

অশোক দাঁড়িয়ে থাকল ল্যাম্পপোষ্টের নীচে। একবার চারিদিকে

তাকাল। ষ্টেশনঘরে ডবলতালা লাগান ও একটা লোকের অভাবে চারিদিক যেন খাঁ খাঁ করছে। সিগ্ন্যালের দিকে চোখ ফেরাল অশোক। লাল আলোটা দপ্ দপ্ করছে। নিকটে ঝাঁকাল গাছটার তলায় শিবানী হয়ত আজিও কেঁদে কেঁদে বেড়াচ্ছে। অশোকের ক্লান্তি মন্ত্রবলে যেন অন্তর্হিত হয়েছে, শুক্লা পঞ্চমীর চাঁদ কখন অস্ত গেছে।

পায়ের শব্দে অশোক চমকে উঠল। পঞ্চু ও সীতারাম ফিরে এসেছে। দুজনে সমস্বরে বলল,—গিন্নীমা একবার ডেকে পাঠালেন, মাষ্টারমশায়।

দ্রুত পা চালিয়ে অশোক কোয়ার্টার্সে হাজির হল। কাত্যায়নী জেগে বসেছিলেন। ঘরের একদিকে ছেঁড়া চটের উপর ছেলেমেয়েরা নিদ্রিত, আর একদিকে একটা মাটির প্রদীপ জ্বলছে। অশোককে দেখে কাত্যায়নী বললেন,—তোমার কথাই বসে বসে ভাবছিলাম অশোক; এত রাতে তুমি এখানে আসবে, কল্পনাও করতে পারিনি। কিন্তু তোমার চেহারা কিরকম খারাপ দেখাচ্ছে, এ সময় বিশ্রাম না করে ঘুরে বেড়াচ্ছ কেন ?

অশোক মৃদু হেসে বলল,—বিশ্রাম আমার হয়ে গেছে মা, ভাবলাম আপনাদের দেখে আসি।

—তোমাকে আমি নিজের ছেলের মতন মনে করি অশোক। তুমি যেন কিছু চেপে যাচ্ছ। আমার কাছে বলতে কোন সঙ্কোচ তুমি করো না।

অশোক বলল,—পঞ্চুর কাছে সব শুনলাম, আপনারা কাল সকালেই চলুন আমার ওখানে।

কাত্যায়নী হঠাৎ কেঁদে ফেললেন। বললেন,—মস্ত একটা দুশ্চিন্তা থেকে আমাকে বাঁচালে, অশোক। আজ শ্মশান থেকে ফিরে আশ্রয়চিন্তাই আমার সব থেকে বড়চিন্তা হয়ে দাঁড়িয়েছে। মনে মনে ঠিক ছিল, নতুন লোক আসার আগেই ছেলেমেয়ে নিয়ে তোমার ওখানে

হাজির হব। একবার ভাবছিলাম দেশে যাব, কিন্তু সেখানে ঘর আছে লোক নেই। একেবারে অচেনা জায়গা, ভরসা হয় না যেতে।

—আমি থাকতে আপনাদের কোথায়ও যেতে দেব না, মা। আপনাদের আশ্রয় দেবার মত স্থান আমাদের প্রতিষ্ঠানে আছে।

—তোমার উপরে কেবলই বোঝা ছাপাচ্ছি। শিবুকে আশ্রয় দিয়েছ তুমি, তার উপর আমরা। শিবু খুব কান্নাকাটি করছে নাকি অশোক ?

অশোক সংক্ষেপে বলল,—হ্যাঁ। টুকুর কোন খবর পেলেন কি ?

—পরীক্ষা দিতে যাওয়ার সময় আর ঠিকানা আমাদের দিয়ে গেল না! বলে গেল, দু'চারদিনের জন্য আবার ঠিকানা কেন ? মিনু বলছিল, শ্মশান থেকে ফেরার সময় সন্তোষ মাষ্টারকে সে আজ দেখেছে। তা'র কাছে খবর পাওয়া যেতে পারে।

অশোক কাত্যায়নীর কথার উত্তর না দিয়ে প্রদীপের আলোর দিকে তাকিয়ে থাকল। কাত্যায়নী অনেকক্ষণ তার মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে বললেন,—তোমার মুখ দেখে মনে হচ্ছে আরও কি একটা দুঃসংবাদ তুমি নিয়ে এসেছ।

অশোক একথারও উত্তর দিল না। প্রদীপের আলো নিভনিভ হয়ে এসেছে। জানালার ফাঁক দিয়ে ভোরের আলো ঘরের মধ্যে প্রবেশ করছে। কাত্যায়নী সেদিকে একদৃষ্টি তাকিয়ে থাকলেন।

দিন কয়েক পরে নাইট স্কুলের প্রাঙ্গণে অশোক একাকী বসেছিল সবে সন্ধ্যা হয়েছে, ছাত্রের দল পৌছাতে এখনও দেরী আছে। অশোক মনে মনে গত কয়েকদিনের ঘটনাবলী আলোচনা করছিল। সদ্যস্বামী-হারা কাত্যায়ণীর কন্যার আত্মহত্যার সংবাদে মর্ম্মভেদী বিলাপ, পরেশবাবুর শ্রাদ্ধ, শ্রাদ্ধের পূর্ব্বদিন হাতীগাঁয়ে টুকুর আবির্ভাব, পিতার শ্রাদ্ধ ও মস্তক মুণ্ডনাদি করতে তার অস্বীকৃতি (যেহেতু মার্কস্‌এর মতে এসব কুসংস্কার

ছাড়া আর কিছু নয়), শক্তিপুর স্কুলের সেক্রেটারী নির্ব্বাচনে মুকুন্দরায়ের পরাজয় ও বিরাজবাবুর জয়লাভ, বিরাজবাবুর সেক্রেটারী পদপ্রাপ্তির পর হেড্‌মাষ্টারের পদত্যাগ ও সন্তোষের উক্তপদে নিয়োগ,—ঘটনাগুলি একের পর এক তার মনকে নাড়া দিয়ে গেছে। কিন্তু শিবানীর সম্বন্ধে অশোক এখনও নিশ্চিন্ত হতে পারে নি। সে যদি পুকুরের জলে ডুবে গিয়ে থাকে, তার দেহ গেল কোথায় ? এ প্রশ্নের উত্তর অশোক আজও পায় নি। শিবেনবাবু তার কাছে প্রায়ই বেড়াতে আসেন, অশোকের সঙ্গে এ বিষয়ে তিনিও একমত। আর সকলে বলাবলি করে, গলায় পাথর বেঁধে শিবানী ডুবে মরেছে। শক্তিপুরে এসে শিবেনবাবু অনেকটা শান্ত হয়েছেন, অশোকের সঙ্গে আলোচনার পর ঠিক হয়েছে তাঁরা দুজনে পরেশবাবুর স্ত্রী একটু শান্ত হলেই একবার মজঃফরপুর যাবেন।

একসঙ্গে অনেকগুলি পায়ের শব্দে অশোকের চিন্তার সূত্র ছিন্ন হয়ে গেল। ছাত্রের দল আসছে। সর্ব্বাগ্রে প্রবেশ করল রুকন। অশোকের কাণের কাছে মুখ এনে বলল,— আজ সব ছুটি দিন মাষ্টার মশায়, জরুরি কথা আছে আপনার সঙ্গে। সেদিন অশোকও অত্যন্ত ক্লান্ত বোধ করছিল, সে রুকনের কথায় সহজেই রাজী হল।

ছাত্রেরা চলে গেলে পর রুকন চুপি চুপি বলল,—খুব জরুরি কথা, মাষ্টার মশায়।

রুকনের কথার সুরে অশোক বিস্মিত হল। এভাবে কথা বলতে সে রুকনকে কখনও দেখে নি।

রুকন একটু ইতস্ততঃ করে বলল,—তিনি বেঁচে আছেন,—মাষ্টার মশায়।

অশোক চমকে উঠল,—কে !

—তিনি। যিনি এখানে ছিলেন।

—কে! শিবানী! অশোক উঠে দাঁড়াল।

তাঁকে আজ দেখলাম মাষ্টার মশায়, বিরাজবাবুর বাঙ্গালায়। রুকনও উঠে দাঁড়াল।

স্তম্ভিত অশোকের মুখ দিয়ে অনেকক্ষণ কোন কথা বেরুল না। তার মনে হল, এত বড় আঘাত সহ্য করবার মত শক্তি যেন তার নেই। খানিক পরে তার খেয়াল হল রুকন অপেক্ষা করছে। সে ভাঙ্গা গলায় বলল,—ঠিক বলছ তুমি! তুমি তাকে চেন?

ক্ষুণ্নস্বরে রুকন বলল,—আপনার কাছে আজ পর্য্যন্ত মিছে কথা বলিনি। তাঁকে আমি বেশ চিনি। অনেকবার দেখেচি ইস্টিশনের পথে যেতে। আমাদের মাষ্টারবাবুর বড় মেয়ে।

অশোক বলল,—বিরাজবাবুর বাংলায় আমাকে একবার নিয়ে যেতে পার?

রাত হয়ে গেল যে, মাষ্টার মশায়। তাছাড়া বিরাজবাবুকে এখন পাবেন না। এ সময়টা তিনি আর সন্তোষবাবু কলিয়ারীর আফিসে বসে কি সব পরামর্শ করেন।

—আমার দরকার বিরাজবাবুর সঙ্গে নয় রুকন। চল।

সন্ধ্যার অন্ধকার চারিদিকে গাঢ় হয়ে এসেছে। সারা আকাশ মেঘে ঢাকা থাকায় অন্ধকার আরও গভীর আকার ধারণ করেছে। অশোকের মনে হল, এই অন্ধকার কোনদিন নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে না, এ যেন প্রলয়ের অন্ধকার। আলোর প্রয়োজন নেই পৃথিবীতে, শাশ্বত অন্ধকারে ঢাকা থাকুক এই পৃথিবী। কঙ্করাকীর্ণ মাঠ দিয়ে চলেছে সে আর রুকন। এ পথে চলার অভ্যাস থাকলেও, আজ অশোকের পা ক্ষতবিক্ষত হয়ে গেল। কতবার সে হোঁচট খেল, কতবার তাকে রুকন ধরে তুলল, তার আর ইয়ত্তা নেই। পথ প্রায় শেষ হয়ে এসেছে, তারা চলেছে কলিয়ারীর পাশের রাস্তা দিয়ে। দিগ্‌নগর কলিয়ারীতে রাতের শিফ্‌ট্

হয়েছে সুরু। নিঃশব্দে ছায়ার মত কুলী কামিনের দল পিটের মধ্যে প্রবেশ করছে। অন্ধকার পাতালপুরী তাদের গ্রাস করবে কিনা কে জানে।

কলিয়ারী থেকে দুশো গজ দূরে বিরাজবাবুর বাঙ্গলো। কর্ম্মস্থল থেকে অধিক দূরে থাকা তিনি পছন্দ করেন না। যাই হোক্, স্থানটি তিনি যথাসম্ভব মনোরম করবার চেষ্টা করেছেন। বাঙ্গলোর চারিদিকে অনেকখানি ঘেরা কম্পাউণ্ড। কম্পাউণ্ডে সুদৃশ্য ফুলের বাগান ও লাল কাঁকর বিছানো পথ। একদিক মোটরের গ্যারেজ ও ভৃত্যদের বাসস্থান। গৃহ সজ্জায় সায়েবী কায়দার নিদর্শন থাকলেও, ভারতীয় রুচির অভাব নেই।

রুকনকে বাইরে রেখে অশোক কম্পাউণ্ডে প্রবেশ করল। গাড়ী বারান্দার সম্মুখে হলঘর। অশোক গাড়ী বারান্দার নীচে দাঁড়িয়ে লক্ষ্য করল, হলঘরে উজ্জ্বল আলোর নীচে একটি মেয়ে চেয়ারে বসে কি যেন লিখছে। অশোক চিনতে পারল; সে মৃদু কণ্ঠে ডাকল,—শিবানী!

কণ্ঠস্বরে মেয়েটি চমকে উঠল, তারপর গাড়ী বারান্দায় এসে বলল,—অশোকদা!

—হ্যাঁ, আমি। তুমি এখানে কেন শিবানী?

—এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার সামর্থ্য আমার নেই অশোকদা। সকলেই জানে, আমি আত্মহত্যা করেছি। লোকের সেই জ্ঞান থাকাই ভাল, আপনিও তাই জেনে রাখুন। এখানে আসার অর্থ আত্মহত্যারই সামিল।

—এ আত্মহত্যা তবে করলে কেন, শিবানী!

—এ প্রশ্নের উত্তরও আমি দিতে পারব না। আমি নিজেই জানি না। কেন এখানে এসেছি।

—তুমি তাহলে ফিরে চল, শিবানী।

—ফিরতে পারব না অশোকদা, এখানে আমি পরম সুখে আছি। আমি রক্ত-মাংসের মানুষ, ব্রহ্মচর্য্য আমার সহ্য হবে না। বিরাজবাবুর ওপরে তুমি রাগ করো না, আমার এখানে আসার ব্যাপারে তাঁর বিশেষ হাত নেই। ষ্টেশনে থাকতে প্রায়ই তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হত, তারপর হঠাৎ একদিন দেখা হাতীগাঁর পথে। সেদিন কথাবার্ত্তা বিশেষ হল না, কিন্তু তাঁর চোখের চাহনি দেখে বুঝতে পারলাম তাঁর কাছে গেলে আমি অসুখী হব না। তোমার আশ্রমে আমি শান্তিতে ছিলাম না অশোকদা, তোমার কাছে ছুটে যাওয়ার জন্য আমার মন ক্ষণে ক্ষণে ব্যাকুল হয়ে উঠত। কিন্তু তোমার পবিত্র চরিত্রে আমার কলুষতার স্পর্শ আরোপ করার ইচ্ছা আমার ছিল না।

শিবানী চুপ করল। একটু পরে ভাঙ্গাভাঙ্গা স্বরে বলল,—একটা অনুরোধ তোমার কাছে আছে। আমার অস্তিত্ব যেন অজানাই থাকে। অন্ততঃ মা ও ভাইবোনদের কানে যেন না উঠে।

অশোক দৃঢ়স্বরে বলল,—তোমার এ অনুরোধ আমি কি উপায়ে রক্ষা করব, শিবানী? এত কাছে তুমি আছ, আজ না হোক, দুদিন পরে সকলেই জানতে পারবে।

বিচিত্র হেসে শিবানী বলল,—তাইত! তবে তোমাকে একটু সাবধান করে দি। বিরাজবাবুর সঙ্গে সন্তোষমাষ্টারের পরামর্শ চলছে। কলিয়ারীর শ্রমিকদের তোমার বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তোলার চেষ্টা হচ্ছে, একটু সাবধানে থেকো। আমি এখন চিঠি লিখছিলাম বসে তোমাকে, এই সব উল্লেখ করে। চিঠির আর প্রয়োজন নেই!

অশোক বলল,—তোমার দরদের আর অন্ত নেই। সকলের জন্যই চিন্তা করছ, মা, ভাইবোন, আমি। যাক্ আমি চললাম।

অশোকের প্রস্থানের পর শিবানী একটু হেসে টেবিলের উপর লেখা চিঠিখানা ছিঁড়ে আগুন ধরিয়ে দিল।

রুকনের সঙ্গে অশোক নিঃশব্দে হাতীগাঁয়ে ফিরে চলল। কলিয়ারীর অফিসে তখনও আলো জ্বলছে ও সুউচ্চ কণ্ঠে কারা আলাপ করছে। রুকন বলল,—সন্তোষবাবু আজ অনেকক্ষণ আছেন। বিরাজবাবুর বেয়ারা আমার দলের লোক, সে বলে দুজনে খালি আপনার কথাই বলে।

অশোকের মুখের দিকে তাকাল রুকন। অন্ধকারে বিশেষ কিছু বোধগম্য হল না তার, কিন্তু তার মনে হল মাষ্টার মশায় মনোযোগ দিয়ে তার কথা শোনেন নি। একটু ইতস্ততঃ করে সে বলল,—ও বলে, মাষ্টার মশায়কে একটু সাবধানে থাকতে বলে দিও রুকনদা।

এবার অশোক বলল,—আজকের ব্যাপার কারুর কাছে প্রকাশ করো না রুকন।

—আমি ছাড়া দ্বিতীয় প্রাণী জানবে না, মাষ্টার মশায়।

দুজনে নিঃশব্দে আবার পথ চলতে লাগল। অশোকের চিন্তা করবার সমস্ত ক্ষমতা যেন অন্তর্হিত হয়েছে, কখন কি ভাবে সে যে হাতীগাঁয়ের কুটীরে উপস্থিত হল সে বুঝতেও পারল না। অশোকের কুটীর আজকাল আর শান্ত নিস্তব্ধ থাকে না। পরেশবাবুর ছেলেমেয়েরা সকাল সন্ধ্যা এসে মহা হৈ চৈ করে। সেদিনেও সন্ধ্যাবেলা এসে তারা অন্ধকার কুটীর প্রাঙ্গণে লুকোচুরি খেলছিল। রেফারী ছিল গৌরহরি। অশোক কুটিরে প্রবেশ করতেই গৌরহরি সংবাদ দিল, শিবেনবাবু এসে অনেকক্ষণ বসে আছেন।

শিবেনবাবুকে পেয়ে অশোক একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল। একা থাকার কথা চিন্তা করতেও তার ভয় হচ্ছিল।

শিবেনবাবু বললেন,—নাইট স্কুল নিয়ে বড্ড বেশী খাটছেন অশোক বাবু। ভয়ানক ক্লান্ত দেখাচ্ছে আপনাকে!

—সত্যিই বড় বেশী ক্লান্ত হয়েছি আজ, একটু বেড়ান যাক্। আপনি রাজী তো?

—অমি প্রস্তুত অশোকবাবু। বেড়াতে বেড়াতে গল্প করা যাবে।

আশোক ও শিবেনবাবু প্রস্থানোদ্যত হলে, মিনু বলল—আজ বড়দা এসেছিল অশোকদা, মা তোমাকে বলতে বলেছে।

—কে? টুকু!

—হ্যাঁ,। বড়দাকে আর চেনা যায় না, অশোকদা। মাথায় লম্বা লম্বা চুল, চোখে চশমা।

পথে বেরিয়ে শিবেনবাবু বললেন,—পরেশবাবুর বড় ছেলে? এতদিন ছিল কোথায়?

—তার গতিবিধি আমার অজ্ঞাত শিবেনবাবু। বোধহয় সন্তোষবাবু বলতে পারবেন।

—আপনার এদিকের কাজ সব মিটে গেল তো? এবার বোধহয় আমরা মজঃফরপুরের দিকে বেরিয়ে পড়তে পারব। আমি অবশ্য নেহাত স্বার্থপরের মত কথা বলছি, অশোকবাবু। কিন্তু মেয়েটার কথা মনে হলে একটুও শান্তি পাই না। কলকাতা ছেড়ে এখানে এসে অনেক ভাল আছি বটে, তবে মাহারা মেয়েটার মুখ আমাকে দিনরাত হণ্ট্ করে। বাহ্যিক শান্ত থাকলেও মনের ভেতর একটা অসহ্য জ্বালা সর্ব্বক্ষণ অনুভব করি।

সমবেদনার সুরে অশোক বলল,—আপনার কোন চিন্তা নেই শিবেনবাবু। কালই আমরা বেরিয়ে পড়তে পারব।

—এর জন্য দোষ আমি কাউকে দিই নে, দোষ দিই নিজেকে। ঐশ্বর্য্য ও বিলাসের মধ্যে আমরা মানুষ হয়েছি, মেয়েকেও যত রকম আবদার দিতে হয় দিয়েছি। এর পরিণাম যে শুভ হয় না, এতদিনে বুঝতে পেরেছি। নিজের মেয়ের ব্যাপার প্রত্যক্ষ দেখলাম, ভাগ্নী রেণুর অদৃষ্টে কি আছে, কে জানে। কলকাতা থেকে তার সম্বন্ধেও ভাল রিপোর্ট পাচ্ছি না। এদের চেয়ে ভাল পথ বেছে নিয়েছে গ্রামের

মেয়ে শিবানী। আমার এতদিনে চোখ খুলে গেছে অশোকবাবু! ঐ যে জাগরণী ক্লাবের পাণ্ডা সুশান্ত, ও আমার বাড়ী যাতায়াত করত কেন জানেন? ঘরে দুটি মেয়ে ছিল বলে। ওরা সব আসত বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে নয়, মেয়েদের সর্ব্বনাশ করবার মতলব নিয়ে। বোকা মেয়েদের কানে ঢোকাত প্রগতির বাঁধাবুলি, ওরা একেবারে মুগ্ধ হয়ে যেত। আইন করে এসব বন্ধ করা যায় না অশোকবাবু?

কথা বলতে বলতে শিবেনবাবু উত্তেজিত হয়ে উঠলেন। অশোকের অন্ধকারের মধ্যেও মনে হল, তাঁর চোখে জল এসে গেছে। সে কথার মোড় ঘুরিয়ে বলল,—রায়মশায়কে দেখিনা অনেকদিন।

—ইলেকশনে হেরে গিয়ে বাড়ীর বাইরে যাওয়া তিনি একরকম ছেড়ে দিয়েছেন। গ্রামশুদ্ধ লোকের উপর চটে আছেন। তাঁর ধারণা সকলের ষড়যন্ত্রের ফলে তাঁর হয়েছে পরাজয়। আপনার উপরেই রাগ তাঁর বেশী। আর আমার উপর রাগ করছেন আপনার কাছে আসি বলে।

অশোক হেসে ফেলল। বলল,—চলুন, দেখা করে আসি রায়মশায়ের সঙ্গে। আপনাকে এগিয়ে দেওয়াও হবে।

শিবেনবাবু বললেন,—তোমাদের গ্রামের সব ভাল, কিন্তু এই অন্ধকারকে আমার বড় ভয় করে। কোথায় দিল কিসে কামড়ে, কে দিল গলায় ছুরি বসিয়ে—

বাধা দিয়ে অশোক বলল,—ছুরির ভয় আপনাদের সহরেই বেশী শিবেনবাবু, পথে-ঘাটে অত আলো থাকা সত্ত্বেও।

শিবেনবাবু দুই চোখের সম্পূর্ণ সদ্ব্যবহার করে পথ চলছিলেন। অশোকের কথার উত্তর না দিয়ে বললেন, একবার আলোটা দেখান তো, ডানদিকে ওটা কি গাছের নীচে?

অশোক তাড়াতাড়ি লণ্ঠন নিয়ে গাছতলায় দাঁড়িয়েই ডাক দিল,—শিবেনবাবু, আসুন একবার এদিকে।

শিবেনবাবু অশোকের প্রায় সঙ্গে সঙ্গে সেখানে উপস্থিত হয়েছিলেন। লণ্ঠনের আলোয় তাঁরা দেখলেন, একটি মেয়ে গাছতলায় পড়ে আছে, বোধহয় মূর্চ্ছা গেছে। শিবেনবাবু হঠাৎ ব্যস্তভাবে বললেন,—অশোকবাবু, মুখের উপর আলোটা ধরুন একবার। অশোক আলো ধরতেই তিনি কাঁপতে কাঁপতে বসে পড়লেন মাটির উপর। একবার শুধু বললেন,—মালিনী! সে এসেছে, বাপের কাছে ফিরে এসেছে।

শিবেনবাবুকে নাড়া দিয়ে অশোক বলল,—অত উতলা হবেন না। আপনি এখানে অপেক্ষা করুন, আলো থাকল। আমি ওঁকে আমাদের ওখানে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করি।

দশ মিনিটের মধ্যে অশোক ষ্ট্রেচার ও লোকজন নিয়ে ফিরে এল, দু এক ফোঁটা ওষুধও মূর্চ্ছিতাকে সেবন করান হল। তারপর আরও দশ মিনিটের মধ্যে মালিনীকে হাতীগাঁর নারী আশ্রমে কাত্যায়নী ও গৌরহরির মায়ের শুশ্রূষাধীনে প্রতিষ্ঠিত করা হল। পথেই তার জ্ঞান ফিরে এসেছিল, এবং মনে হল শিবেনবাবুকে সে চিনতে পেরেছে। স্থির হল, রাত্রে আর তাকে বিরক্ত করা হবে না। শিবেনবাবুও এই প্রস্তাবে সায় দিলেন, এবং সে রাত্রি অশোকের কুটীরে কাটিয়ে দিলেন।

সকালবেলা অশোক বলে গেল, মালিনী সম্পূর্ণ সুস্থ হয়েছে এবং শিবেনবাবুর কাছে একটু পরে আসবে। সংবাদে শিবেনবাবু বিশেষ ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। মালিনীর কাছে মুখ দেখাতে তাঁর নিজেরই যেন লজ্জা করছিল। খানিক পরে গৌরহরির সঙ্গে মালিনী এসে হাজির! বিদায় কালে গৌরহরি বলল,—মাষ্টারমশায় বলে দিলেন আপনি আজ এখানেই থাবেন, রায়মশায়ের ওখানে তিনি খবর পাঠিয়েছেন।

শিবেনবাবু মেয়ের সঙ্গে চোখোচোখি হওয়ামাত্র কেঁদে ফেললেন। মালিনী বলল,—কেঁদে লাভ নেই বাবা, আমাদের জীবনে এই ব্যাপারটা

একটা দুঃস্বপ্ন বলে ধরে নেওয়া ছাড়া উপায় নেই। আমি যা করেছি, তাকে সাধারণভাবে পাপ আখ্যা দিলে পাপের উপর অবিচার করা হবে। কাজেই ওসব ভুলতে চেষ্টা করা এখন দরকার। এখানে থাকলে আমি সব ভুলতে পারব, বাবা! হাতীগাঁর এই আশ্রমেই আমি থেকে যাব।

—তাই ভাল মালি। আমিও ওই রকম একটা মনে করছিলাম কলকাতায় আমিও আর ফিরে যাব না। বাপ বেটীতে এখানেই থাকব। কিন্তু অশোকবাবু কি রাজী হবেন?

—তাঁর অনুমতি লোকমারফত সকালেই পেয়ে গেছি। অদ্ভুত লোক, বাবা!

—সত্যিই অদ্ভুত রে! শুধু অদ্ভুত নয়, মহাপ্রাণ। অশোকবাবু না থাকলে কাল তোকে বাচাতে পারতাম না। কিন্তু তোকে এখানে ফিরে পাব স্বপ্নেও ভাবিনি।

—কি কষ্টে যে পালিয়ে এসেছি বাবা, তার আর সীমা নেই। সুযোগ পেয়ে একদিন পালিয়ে এলাম কলকাতায়। একটু রাত হলে বাড়ী মুখো হলাম। ভিতরে ঢুকতে সাহস হল না, বাইরে থেকে দেখি বিরাট ব্যাপার চলেছে বাড়ীতে। গেটে পাহারা দিচ্ছে নতুন এক দারোয়ান, আমাদের সেই পুরাণো দারোয়ানের চাকরী বোধহয় গেছে। তাকে শুধোতেই সে বলল, মেম সায়েব পার্টি দিচ্চেন। আমি বললাম, সায়েব কোথায়? উত্তরে লোকটা বলল, সায়েব গেছেন রুগী দেখতে। বুঝতে পারলাম, তুমি ওখানে নেই। কোথায় যেতে পার! প্রথমেই মনে হল শক্তিপুরের কথা। কেন মনে হল তা আমি জানি না। ষ্টেশন থেকে বেরিয়ে পথ চলছি বড়রায় বাড়ীর দিকে; পথ আর ফুরোয় না। দুদিন কিছু খাওয়া হয় নি, একটা গাছতলায় বসলাম একটু বিশ্রামের জন্য। তারপর কি হল মনে নেই।

শিবেনবাবু বললেন,—এ নিয়ে আলোচনা করতে চাইনে মালি। তোকে যে ফিরে পেয়েছি এই ঢের।

মালিনী ঘরের চারিদিকে তাকিয়ে দেখছিল। বলল,—অশোকবাবু এত সামান্যভাবে থাকেন!

শিবেনবাবু বললেন,—হ্যাঁ, মানুষ কত সামান্যভাবে সুস্থদেহে বেঁচে থাকতে পারে, অশোকবাবু তার জাজ্জল্য প্রমাণ। ওঁর মত সকলে যদি থাকত, তাহলে পৃথিবীতে আর এত অশান্তি সৃষ্টি হত না।

শিবেনবাবুর কথায় মালিনী মাথা নীচু করল।

সকালবেলা মালিনীর খবর শিবেনবাবুকে দিয়েই অশোক বেরিয়ে গেল প্রতিষ্ঠানের কাজকর্ম অনেকদিন দেখা হয় নি, তার উপর মুকুন্দ রায়দের খবর পাঠাতে হবে। পথে গ্রামের পোষ্টাপিস। পোষ্টমাষ্টার অশোককে ডেকে প্রতিষ্ঠানের চিঠিপত্র দিলেন। অশোক চিঠি নিয়ে চলে গেল, মাষ্টার মশায়ের মুখে কুঞ্চিত হাসি লক্ষ্য করল না। চিঠি পত্রের মধ্যে বুকপোষ্টই বেশী। নানারকম ক্যাটালগ, কৃষিবিষয়ক মাসিক পত্রিকা আর একখানা খবরের কাগজ। বুকপোষ্টে খবরের কাগজ দেখে বিস্মিত হল, শক্তিপুরে দৈনিক সংবাদপত্র আসে কলকাতা থেকে। তার মনে হল বুকপোষ্ট কেউ যেন খুলে দেখেছে। খবরের কাগজখানার শিরোনামা দেখে সে চমকে উঠল,—'আশ্রমিকা শিবানীর অদ্ভুত কীর্ত্তি। পল্লীসেবকের (?) কবল হইতে পলায়ন।' তার নীচে ঘটনার বিবরণ,—অশোক কু-মতলবে শিবানীকে তার আশ্রমে বন্দী করে রেখেছিল, কিন্তু পার্টির যে সকল কর্মী ঐ অঞ্চলে কাজ করছে, তারা তাকে মুক্ত করেছে নিপীড়িতা শিবানী বর্ত্তমানে কমরেড বিরাজের আশ্রয়ে আছেন। পার্টির জয় হোক।

অশোক বুঝতে পারল, পোষ্টমাষ্টার এই বিবরণটি পড়েছেন এবং

শক্তিপুর হাতীগাঁ অঞ্চলে এই অতি মুখরোচক সংবাদটি অতি শীঘ্রই সুপ্রচারিত হবে। মুকুন্দরায়কে শিবেনবাবুর খবর পাঠিয়ে অশোক দ্রুত হাতীগাঁয় ফিরে চলল।

কাত্যায়নী শান্তমুখে সব শুনলেন। বললেন,—সংসারে অনেক ঘা খেয়ে মন অসাড় হয়ে গেছে অশোক। এইবার আমি একটুও বিচলিত হইনি। শিবানীকে মৃত বলেই আমি ধরে নিয়েছি। সে যেখানেই থাকুক আর যাই করুক, আমার চোখে সে মৃত। তবে আমার বিশ্বাস, একদিন তাকে সত্যের পথে আসতে হবে, যেমন এসেছে মালিনী। সেদিন টুকু এসেছিল, বলে গেল বিরাজবাবুর কালিয়ারীতে চাকরী করছে। কে জানে, হয়ত বোনের বিনিময়ে তাকে বিরাজবাবু চাকরী দিয়েছে।

অদূরে কাত্যায়নীর ছেলেমেয়েরা খেলা করছিল। সেদিকে তাকিয়ে অশোক বলল, ওরা বেশ আনন্দে আছে।

—এখানে এসে তো আর অভাবের মুখ দেখতে পাচ্ছে না। আমাদের জন্য তোমাকে বড় দুঃখ পেতে হল, অশোক।

—এ দুঃখ নতুন নয় মা। সংসারে প্রকৃত জনসেবার ভার যারা নেয় না, তারা কর্ম্মীদের শুধু দুঃখ দিয়েই যায়। তারা শুধু চায় জগতে অশান্তি চিরকাল বজায় থাকুক, শান্তির শেষ চিহ্নটুকু জগত থেকে যেন মুছে যায়। আপনাদের সঙ্গে পরিচয় না হলেও এ দুঃখ আমাকে ভোগ করতে হত।

—ছেলেমেয়ের কী শোচনীয় পরিণতি, অশোক! কাত্যায়নী একটা সুদীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেললেন।

অশোক বুঝতে পারল কতখানি মর্ম্মবেদনা এই দীর্ঘ নিঃশ্বাসের সঙ্গে জড়িত। কাত্যায়নীর কাছে বিদায় নিয়ে সে নিজের কুটীরে ফিরে চলল। পথে দেখা গৌরহরির সঙ্গে। অশোক বলল, তোমার চিঠি আছে গৌর। চিঠি পড়ে গৌরের মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। অশোককে

প্রণাম করে বলল,—খবর ভাল মাষ্টারমশায়, ফার্ষ্ট ডিভিশনে পাশ করেছি। সস্নেহে গৌরকে আলিঙ্গন করে অশোক বলল—এবার ছাড়াছাড়ি হবে গৌর? কলেজে পড়তে হবে শহরে গিয়ে।

ইস্কুলের রেজাল্ট এবার বড় খারাপ মাষ্টারমশায়, আর কেউ পাশ করতে পারেনি। আমার বন্ধু এই চিঠিতে লিখেছে।

—এ ব্যাপার নিয়ে আমাদের আলোচনা না করাই ভাল, গৌর। যাদের স্কুল তারা বুঝবে।

—ইস্কুলের অবস্থা আরও খারাপ হবে, স্যার। সে হেড্মাষ্টারমশায় চলে গেছেন। সন্তোষবাবু হেড্মাষ্টার হয়েছেন।

—এ সম্বন্ধেও মন্তব্য প্রকাশ করা আমাদের অনুচিত। কে জানে হয়ত স্কুলের ভবিষ্যত ভালই হবে।

কথা বলতে বলতে তারা অশোকের কুটীরের কাছাকাছি এসে পড়েছে। শিবেনবাবু মেয়েকে আশ্রমে পৌছে দিতে যাচ্ছিলেন। অশোকের একেবারে সামনে তাঁরা পড়লেন। অশোক আশা করছিল, মালিনী তাকে দেখে লজ্জিত হবে ও শিবেনবাবুর সঙ্গে দ্রুত প্রস্থান করবে। সেরকম কিছু না করে সে বেশ সহজ ভঙ্গীতে বলল,—আপনি বেশ লোক কিন্তু অশোকবাবু। আমরা আপনার ঘরে অনেকক্ষণ কাটিয়ে দিলাম, আর গৃহস্বামীর দেখা নেই!

গৌরীকে বিদায় দিয়ে অশোক বলল,—দোষ কিন্তু আমার নয়, দোষ শিবেন বাবুর। আমার অনুপস্থিতিতে ঘরের মালিক তিনি। তিনি আমাকে ডেকে না পাঠালে আমার আশা উচিত নয়।

শিবেনবাবু হেসে বললেন,—অশোকবাবু মাথা খাটিয়ে যুক্তি দেখালেন চমৎকার। যাক্ আপনাকে যখন সামনাসামনি পাওয়া গেল, আমাদের বাপবেটীর মতলব এবার প্রকাশ করি। আমরা ঠিক করেছি, শহরে আর ফিরে যাব না। আপনার আশ্রমেই বাস করব।

—অতি সুন্দর প্রস্তাব শিবেনবাবু, আমার কোন আপত্তি নেই। কিন্তু বেশ ভেবেচিন্তে দেখুন, আপনারা এখানে বাস করতে পারবেন কি না। কলকাতায় আপনাদের বাড়ী আছে, শহরের আবহাওয়ায় আপনারা পুষ্ট। গ্রাম আপনাদের সন্তুষ্ট করতে পারবে কি ?

মালিনী বলল,—শহরের পুষ্টি লাভ করে জীবনে ক্ষতির পরিমাণই বেশী হয়েছে, অশোকবাবু। গ্রামে থাকলে তার বোঝা আর বাড়বে না। তবে আমাদের মত লোককে আশ্রয় দিতে আপনি যদি নারাজ হন তো, কোন উপায় নেই।

অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে অশোক বলল,—না, না, সেকথা আমার মনে স্থান পায়নি। আপনাদের অতি সমাদরে আমি গ্রহণ করব। আমার বলার উদ্দেশ্য এই যে, এতদিনের নাগরি সংস্কার থেকে সহসা মুক্ত হওয়া সহজ ব্যাপার নয়।

শিবেনবাবু বললেন,—আমাদের সিদ্ধান্তে কোন গলদ নেই. অশোকবাবু। কলকাতার বাড়ী আমি রেণু ও দিবাকরকে দানপত্র লিখে দিচ্ছি। নগদ টাকা যা আছে, আমার ও মালির বাকী জীবন বেশ চলে যাবে।

অশোক একটু চিন্তা করে বলল,—রায়মশায়কে একবার জানান দরকার।

—হ্যাঁ, জানাব বৈকি, তবে সে একটা ফর্ম্যাল ব্যাপার। আজ বিকেলেই তাঁকে খবর পাঠাব আমি। ওঁদের সঙ্গে ইচ্ছে করেই দেখা করব না, কারণ মালির প্রত্যাবর্ত্তন ও প্রসন্নমনে গ্রহণ করবেন না।

মালিনী বলল,—এত অল্পে আপনি সন্তুষ্ট থাকেন কি করে, সেই রহস্যটা আমাদের শিখিয়ে দেবেন, অশোকবাবু।

অশোক হেসে বলল,—অল্প কোথায় দেখলেন আপনারা। একজন লোকের উপযুক্ত সমস্ত জিনিষই যে আছে।

—কিন্তু শরীর আপনার খুবই ভাল। এই সামান্য ভাবে থেকে শরীর ভাল রাখা বেশ কঠিন। আর শহরে বাহুল্যের মধ্যে বাস করেও আমরা শরীর ভাল রাখতে পারি না।

—যাক্, এখানে থাকলে আপনাদের শরীরও ভাল হবে। এদিকে আবহাওয়া অনেকটা পশ্চিমের মত, কলিয়ারী পার হলেই পাহাড় চোখে পড়ে।

শিবেনবাবু বললেন,—কাল চলুন কলিয়ারীটা দেখে আসি। এখানকার দ্রষ্টব্যের মধ্যে ঐটাই বাকী আছে। মালি অবশ্য এখানে এসে প্রথমেই দেখল এ অঞ্চলের সেরা জিনিষ, অশোকবাবুর পল্লী প্রতিষ্ঠান। আপনার সঙ্গে ওদের জানাশোনা নিশ্চয় আছে, অশোকবাবু।

প্রত্যুত্তরে অশোক বুকপোষ্টে পাওয়া কাগজখানা শিবেনবাবুর চোখের সামনে ধরল। আগাগোড়া পড়ে শিবেনবাবু বললেন,—ব্যাপার কি, অশোকবাবু! শিবানী কে? আপনার আশ্রমের সে মেয়েটি তো আত্মহত্যা করেছে।

অশোক সমস্ত ঘটনা খুলে বলল, এমন কি বিরাজবাবুর বাংলোয় তার নৈশ অভিযানের কাহিনী পর্য্যন্ত।

—উঃ, কি সাংঘাতিক লোক এরা! মেয়েটাই বা কি রকম! উপকারকের প্রতিদান ভালভাবেই দিয়েছে। আপনি বড় শান্ত লোক অশোকবাবু, তাই ওরা আপনার উপর এরকম অত্যাচার করতে সাহস পায়। এই বিরাজকে আমি চিনি। দিগ্‌নগর কলিয়ারী ওর আমি জানতাম না। এমন কুকর্ম্ম নেই লোকটা জীবনে করেনি। তোমাদের দেশে মারকৃসিজমের পাণ্ডা কটি মন্দ হয় নি দেখছি।

হঠাৎ শিবেনবাবু কথা বন্ধ করলেন। লক্ষ্য করলেন মালিনীর চোখ দিয়ে জল পড়ছে। একটু বিস্মিত হয়ে তিনি বললেন,—তুই কাঁদছিস্ মালি!

জল মুছে ফেলে মালিনী বলল,—দেশের এক শ্রেণীর লোক মেয়েদের নিয়ে কি জঘন্য খেলা খেলছে বাবা। আমরা লেখাপড়া শিখি আর যাই শিখি সাধারণ বুদ্ধি পুরুষের চেয়ে আমাদের কম। ভাবপ্রবণতা আমাদের মধ্যে এত বেশী যে, বিচার ক্ষমতা আমরা প্রায়ই হারিয়ে ফেলি। শিবানী গ্রামের মেয়ে, লেখাপড়াও বিশেষ শেখে নি; আর আমি শহরে বাস করেছি ও কলেজে লেখাপড়া শিখেছি। কিন্তু আমাদের মধ্যে তফাত কোথায়? আমার জন্য তোমাকে কলকাতা ছাড়তে হয়েছে, শিবানীর জন্য অশোকবাবুকে হয়ত হাতীগাঁ ছাড়তে হবে।

অশোক বলল,—হাতীগাঁ আসার পর অনেক বিপদের সম্মুখীন আমাকে হতে হয়েছে, কিন্তু এরকম বিপদ আমার জীবনে এই প্রথম। নারী-আশ্রমে প্রায় কুড়ি জন মহিলা আজ কয়েকবৎসর ধরে বাস করছেন, তাঁদের দিক থেকে কোন গোলমালে আমাকে এ পর্য্যন্ত পড়তে হয় নি। লক্ষ্য করবার বিষয়, এঁরা সকলেই তথাকথিত নিম্নশ্রেণীভুক্ত মহিলা।

মালিনী বলল,—এ কথায় আমার একটু আপত্তি আছে, অশোকবাবু। খারাপ যে হবে, সে হবেই। এ ব্যাপারে উচ্চশ্রেণী নিম্নশ্রেণী নেই।

শিবেনবাবু ঈষৎ চিন্তিতভাবে বললেন,—কিন্তু সংবাদটা এতই মিথ্যা যে এর একটা প্রতিবাদ অন্য কাগজে পাঠান দরকার।

অশোক বলল,—মিথ্যাভাষণ বলেই এর প্রতিবাদ করতেও ঘৃণা বোধ হচ্ছে শিবেনবাবু। ওদের পার্টির কাগজে সত্যঘটনা প্রকাশিত হতে এ পর্য্যন্ত দেখি নি। সত্যকে বিকৃত করে জনসাধারণকে ক্ষেপিয়ে তোলাই ওদের স্বভাব। আর আমাদের দেশটিও এরকম মজার যে, লোকে এই সব সংবাদে গুরুত্ব দেয় অত্যন্ত বেশী। ওদের কাগজে আমাদের এই প্রতিষ্ঠান সম্বন্ধে অনেক খবরই বেরিয়েছে, যার মূলে বাস্তবের লেশমাত্র নাই। সে সব কোন দিন গ্রাহ্য করি নি। কিন্তু

আজকের এই খবর দেখে ভাবছি, স্বার্থসিদ্ধির জন্য ওরা যে কোন ঘৃণ্য পন্থার আশ্রয় নিতে পারে।

উত্তেজিতভাবে মালিনী বলল,—ওদের আমি চিনি অশোকবাবু, ঘনিষ্ঠ ভাবেই চিনি। মানুষকে ওরা ইকনমিক জীব ছাড়া আর কিছুই ভাবতে পারে না। আমার সম্বন্ধে ওদের কাগজে যা লেখা হয়েছিল, আমি তা দেখেছি। মজঃফরপুরে এক কপি আমাকে পাঠিয়ে দেয়। সেটা থেকে আমার মোহ কেটে গেছে!

আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠল অশোকের মুখ। সে বলল,—সস্তা জিনিষের মোহ থেকে ফিরে আশা বড় শক্ত। আপনাকে আমি আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি।

শিবেনবাবু পথের দিকে তাকিয়েছিলেন। বললেন,—রায় মশায় আসছেন।

মুকুন্দরায়ের চেহারার পরিবর্ত্তন দেখে সকলে বিস্মিত হল। মুখ ছাইএর মত সাদা, মাথার চুলে কালোর লেশমাত্র নেই। উদ্বেগ ও লজ্জা চোখ দিয়ে যেন ঝরে পড়চে। মুকুন্দ রায় অশোককে উদ্দেশ করে বললেন, আর পারলাম না, তোমার কাছে ছুটে এলাম, কাল থেকে নরকযন্ত্রণা ভোগ করছি। এই নাও। মুকুন্দ রায় পকেট থেকে একখানি চিঠি বের করে অশোকের হাতে দিলেন। বেশ চেঁচিয়ে পড়, শিবেনও শুনবে। এ কে! মালিনী? ফিরে এসেছিস! সে আর আসবে না মালি! মুকুন্দরায়ের চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগল। চেঁচিয়ে পড় অশোক, এরা শুনুক।

বিস্ময়ে বিমূঢ় অশোক চিঠি পড়তে আরম্ভ করল।

—আমার এই চিঠি আপনি যখন পাবেন, আমি তখন সমুদ্রবক্ষে জাহাজে। ইংল্যাণ্ডে ফিরে চললাম। রেণুর সঙ্গে বিবাহের পূর্ব্বে একটা খবর আমি চেপে গিছলাম। বিলাতে থাকাকালীন ও দেশের

একটী মেয়ের সঙ্গে আমার জানাশোনা হয়, ফলে একটি সন্তান জন্মে। আইনতঃ সে ছেলের ভরণপোষণের ভার গ্রহণ করতে আমি বাধ্য। ব্যাপার যে কোন উপায়ে হোক, রেণুর অজ্ঞাত থাকে না। তখন আমার সঙ্গে সে একটা এগ্রিমেণ্ট করে। আমার জীবনে এই কলঙ্ক সে গোপন রাখবে, যদি আমি তাকে সব ব্যাপারে স্বাধীনতা দিই। শেষ পর্য্যন্ত এই সর্ত্তে আমি রাজী হই।

কিন্তু রেণুকে বুঝতে আমার ভুল হয়েছিল। স্বাধীনতাকে সে উচ্ছৃঙ্খলতার পর্যায়ে নামিয়ে আনে। তার বন্ধু-বান্ধবের সংখ্যা অকস্মাৎ বৃদ্ধি পেল। তাদের পার্টির খরচ যোগাতে আমার ব্যাঙ্ক ব্যালান্সের অর্দ্ধেক খালি হয়ে গেল। আর তার বন্ধুদের (ছেলে ও মেয়ে) মত এত নির্লজ্জ নরনারী ইতিপূর্ব্বে আমার সংস্পর্শে আসেনি। বিলেতেও এ রকম দেখিনি। রেণুকে এর জন্য সাবধান করতেও আমার সাহস হয় নি ! এজন্য আমার দুর্ব্বলতা স্বীকার করছি।

কিছুদিন পরে রেণু বেশী রাত্রে বাড়ী আসতে লাগল। জিজ্ঞাসা করলে বলল, জাগরণী ক্লাবের থিয়েটারে রিহার্সালের জন্য দেরী হয়। তারপর কয়েকদিন রাতে ফিরল না। আমার সহ্যের সীমা অতিক্রম হওয়াতে রেণুর কাছে তার এই অদ্ভুত আচরণের কারণ জিজ্ঞাসা করি। উত্তরে কিছু কড়া কথা আমাকে শুনতে হল, অর্থাৎ তার কাজের কৈফিয়ৎ তলব করবার অধিকার আমার নেই। তার বক্তব্য হল, এ যুগের মেয়েরা স্বামীদের অত্যাচার নির্ব্বিবাদে সহ্য করতে আর রাজী নয়। তার মুখ দেখে মনে হল, কি যেন একটা দ্বন্দ্ব তার মনের মধ্যে চলেছে।

—তারপর ক্রমান্বয়ে দুদিন সে বাড়ী এল না। গেলাম জাগরণী ক্লাবে খোঁজ করতে। সেখানে কেউ তার খবর বলতে পারল না। বাড়ী ফিরে দেখি একখানা চিঠি আমার নামে এসেছে। চিঠি পড়লাম, রেণু

লিখেছে। চিঠির মর্ম্ম জানাচ্ছি। 'আমার সঙ্গে বাস করে জীবনকে সে উপভোগ করতে পারছে না। তার তরুণ মন চায় যৌবনসুরা আকণ্ঠ পান করতে! তাই সে সমাজ সংসার ত্যাগ করে সুন্দরলালের সঙ্গে চলল সুইজারল্যাণ্ড এরোপ্লেনে।

—আপনাকে সত্য কথা লিখছি, রেণুর চিঠি আমাকে বিশেষ বিচলিত করে নি। কিন্তু চিন্তা করে দেখলাম, এর পরে এখানে থাকা আমার পক্ষে বিশেষ কষ্টকর হবে। তাই আমিও চললাম দেশ ছেড়ে।

—আর একটা কথা আপনাকে জানিয়ে যাই, যার জন্য আমি জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত অনুতপ্ত থাকব। শক্তিপুরের ষ্টেশনমাষ্টার পরেশবাবুকে আপনি নিশ্চয় চেনেন। তাঁর মেয়ে শিবানী, তার প্রতিও আমি ঘোর অন্যায় করেছি; সে অন্তঃসত্ত্বা, তাকে বিবাহ করা আমার উচিত ছিল। কিন্তু পারিনি। পাঁচ হাজার টাকার একখানা চেক এই চিঠির সঙ্গে পাঠালাম, পরেশবাবুকে দেবেন শিবানীর বিবাহের জন্য।

অশোক চুপ করল। মুকুন্দ রায় তার হাত ধরে করুণস্বরে বললেন, —তোমার উপর অন্যায় অবিচার অনেক করেছি অশোক। শিবানীর ব্যাপারে আমার সন্দেহ ছিল তোমার উপর, তোমার সঙ্গে সামাজিক সংস্রব পর্য্যন্ত আমি ত্যাগ করেছিলাম। শক্তিপুরে তোমার পক্ষ নিয়ে কথা বলে, এরকম লোক আজ একটা নেই, সকলের আদর্শ হয়েছে সন্তোষ মাষ্টার। এর জন্য আমি অনেকটা দায়ী। আজ আমার চোখের পরদা সরে গেছে। এদেশে নীরব কর্ম্মীর প্রশংসা নেই। খাতির পায় তারাই, যারা মোড়লী করে ও বাজে হৈচৈ করে সারা জীবন কাটিয়ে দেয়। এই চিঠি আমি দুদিন আগে পেয়েছি, শেষে তোমার কাছে ছুটে এসেছি। আমাকে বাঁচাও অশোক।

শিবেনবাবু বললেন,—এ আমাদের কৃতকর্ম্মের ফল রায় মশায়।

এদেশের আবহাওয়ায় পুষ্ট মেয়েদের গড়ে তুললাম বিদেশী ভাবধারায়। হজম করা বড় শক্ত। বিদেশীর সঙ্গে বহুকাল বাস করেও তাদের সদ্‌গুণ আমরা কিছু পাইনি। পাশ্চাত্যের আবর্জ্জনা এসে জমেছে আমাদের দেশে, আমরা মূর্খের মত তাই গ্রহণ করেছি সাগ্রহে। আর নয় রায় মশায়, আপনি, দিদি চলে আসুন এখানে, অশোকবাবু সযত্নে আপনাদের স্থান দেবেন। শহরের চাকচিক্যময় বিলাসপূর্ণ জীবন পড়ে থাক অন্তরালে, আসুন এখানে আমরা সমবেতভাবে নূতন জীবনের গোড়াপত্তন করি।

—এত বড় রায়বংশের এই কলঙ্ক আমার জীবনে হল, শিবেন। এরা বাপ মা আর যারা পরমাত্মীয় তাদের দিকে তাকায় না, চলে যায় আপন খেয়ালে সর্ব্বনাশের পথে। শক্তিপুরে থাকা আর সম্ভব হবে না, তোমার এখানে একটু আশ্রয় দাও, অশোক।

—আমার পরম সৌভাগ্য রায় মশায় যে, আপনারা সকলে এখানে থাকবেন। শিবেনবাবু যা বললেন, আমি তাঁর সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত। হাতীগাঁর প্রতিষ্ঠান আমার একার নয়, আপনারাও এর অংশীদার ও কর্ম্মী।

বেলা তখন দ্বিপ্রহর, প্রখর রৌদ্রালোকে দীঘির জল ঝলমল করছে। কাঁচা সড়কের পথে গরুর গাড়ীর শব্দ, মালবোঝাই চলেছে ষ্টেশনের দিকে।

কয়েকদিন পরের কথা। সন্ধ্যার কিছু আগে অশোক শক্তিপুর থেকে ফিরছে রেললাইন ধরে। কয়েকদিন ধরে তার মানসিক অবস্থা অত্যন্ত বিক্ষিপ্ত। নাইট স্কুল একরকম বন্ধ, ছাত্রদের দেখা নাই। কানাঘুসায় সে জানতে পেরেছে, রুকন ও তার অনুগতের দল কলিয়ারীতে সন্তোষকে চ্যালেঞ্জ করেছে, এবং সন্তোষের দলের সঙ্গে তাদের সংঘর্ষ

আসন্ন। রুকনকে প্রতিনিবৃত্ত করবার জন্য সে কদিন থেকে তার খোঁজ করছে, কিন্তু তার হদিশ মেলেনি। তারপর রেণুর এই পরিণামে সে বিশেষ বিচলিত হয়েছে। তার মনে হল, রেণু, শিবানী, সকলেই তার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। আর এই দিবাকর লোকটা, হৃদয় বলে কোন জিনিষ তার যেন নেই। নৈতিক ব্যাপারে লোকটা এখনও মানুষের পর্য্যায়ে উঠতে পারেনি। সম্ভবতঃ অতি দুর্ব্বলচিত্ত লোক এই দিবাকর সেন, সবল নার্ভ হলে লোকে এরকম করতে পারে না। রায়মশায় সপরিবারে এসে গেছেন। নতুন একখানা আটচালায় তাঁরা বাস করছেন,—রায়মশায়, বড়গিন্নী, শিবেনবাবু, মালিনী, কাত্যায়নী ও ছেলেমেয়েরা। রায়মশায় ও কাত্যায়নী প্রায় সব সময়ই চুপচাপ বসে থাকেন। কোন কাজে তাঁদের উৎসাহ নেই। কাজ করছেন শিবেনবাবু ও মালিনী। মালিনী প্রাণপণে কাত্যায়নীর সেবা করছে, তাছাড়া নারী-আশ্রমের কাজে গৌরের মাকেও সাহায্য করছে। অদ্ভুত পরিবর্ত্তন হয়েছে মালিনীর।

অতি মন্থরগতিতে পথ চলছিল অশোক। ষ্টেশনের সিগন্যালের কাছে এসে থমকে দাঁড়াল। ষ্টেশনমাষ্টারের কোয়ার্টারে আলো জ্বলছে, সামনের খোলা বারান্দায় বসে একটা ছেলে পড়া মুখস্থ করছে, ঝাঁকাল গাছটা সেইরকম দাঁড়িয়ে। অশোক আবার চলতে আরম্ভ করল।

আকাশের কালো ছায়া পৃথিবীর উপর ছড়িয়ে পড়ছে। গোধূলি-গগনের ললাটে সন্ধ্যাতারার টিপ। অশোক একবার তাকাল আকাশের দিকে। সিঁদুরের টিপ চমৎকার মানাত রেণুকে। রেণু হয়ত এখন আল্পস্ পাহাড়ের চূড়ায় সূর্য্যাস্ত দেখছে। সেখানে পাহাড়ের ভাঁজে ভাঁজে নেমে আসছে অন্ধকার। পাইন গাছের শাখা সন্ধ্যার কোমল হাওয়ায় কেঁপে কেঁপে উঠছে। রেণুর চুলে লেগেছে বাতাসের দোলা। অশোক

থরথর করে কাঁপতে কাঁপতে রেললাইনের উপর বসে রইল। এ কী দুর্ব্বলতা তার! বিপথগামিনী এক নারীর প্রতি এই আকর্ষণ কেন?

পথচলার শক্তি অশোকের যেন অন্তর্হিত হয়েছে। তার শুধু ইচ্ছা করছে উন্মুক্ত আকাশের নীচে হাতপা মেলে শুয়ে থাকা। অশোক স্লিপারের উপর শুয়ে পড়ল। কী ঠাণ্ডা কাঠের স্লিপার! ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত প্রস্তরখণ্ডও যেন অতি মোলায়েম বোধ হচ্ছে। রেণু হয়ত ভেলভেটের গদিআঁটা কোচে হেলান দিয়ে বসে আছে হোটেলের বারান্দায়। পাশে তার সুন্দরলাল। দৃষ্টি তাদের নিবদ্ধ চন্দ্রকিরণে উদ্ভাসিত আলপাইন রেঞ্জের তুষারশৃঙ্গের দিকে। অশোকের মনের মধ্যে আগুন জ্বলতে লাগল।

আবার পথচলা সুরু করল সে। ঘন অন্ধকার ভেদ করে রেললাইনের পথ সম্মুখে বিস্তৃত, অশোকের মনে হল অন্ধকার যেন সে সারা দেহ দিয়ে অনুভব করছে। এই অন্ধকারের মধ্যে কলিয়ারীতে বিরাজবাবুর আলোকোদ্ভাসিত বাঙ্গলো তার চোখের সম্মুখে যেন ভেসে উঠল। উজ্জ্বল বিজলীবাতির নীচে টেবিলে বসে লিখছে ও কে! পরেশবাবুর দুঃখিনী মেয়ে শিবানী! আসন্ন মাতৃত্বের ছায়া তার চোখে মুখে নেমে এসেছে, অঙ্গে অঙ্গে শিথিল অবসাদ। শিবানীর মুখে হাসি, কার পায়ের শব্দ সে শুনতে পেয়েছে। ঘরে ঢুকল বিরাজবাবু, শিবানীর পাশে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে তার চোখ টিপে ধরল। শিবানীর মুখে স্মিত হাসি, বিরক্তির লেশমাত্র নাই। অশোকের নারী আশ্রমের বিষাদক্লিষ্ট শিবানীর মৃত্যু ঘটেছে, বিরাজবাবুর বাঙ্গলোয় এই শিবানী নূতন রূপ পরিগ্রহ করেছে।

এক মুহূর্ত্ত নীরবে দাঁড়িয়ে অশোক স্লিপারের উপর পা চালিয়ে দিল। বাজে চিন্তা আর নয়, হাতীগাঁ ফিরে যেতে হবে। পথ এখনও ঢের বাকী, অশোক চলার গতি বাড়িয়ে দিল। কিন্তু অন্ধকার ভেদ করে

আর একখানি মুখ বারবার তার চোখের সামনে ভেসে বেড়াতে লাগল। এ মুখ কার? বিস্মিত অশোক আরও জোরে চলতে লাগল। এখনও চার মাইল চলতে হবে, রেললাইন থেকে নেমে ছ মাইল হাঁটতে হবে লাল কাঁকর ভরা একটা মাঠের ভিতর দিয়ে। তারপর পড়বে হাতীগাঁর প্রথম বাড়ী, নতুন আটচালা। সেখানে নতুন সব বাসিন্দা নতুনভাবে জীবন আরম্ভ করেছে,—রায়মশায় সস্ত্রীক, পরেশবাবুর স্ত্রী, শিবেনবাবুও—। অশোকের চোখের সামনে সহসা যবনিকাপাত হয়ে গেল। তার মন মালিনীর প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে। কী অদ্ভুত পরিবর্ত্তন এসেছে মালিনীর জীবনে। পূর্ব্বকার সমস্ত কলঙ্কভার থেকে মুক্ত হতে কী চেষ্টাই না সে করছে! পথচলতি অশোক মালিনীর কথাই শুধু চিন্তা করতে লাগল।

ভয়াবহ একটা চীৎকারে তার চমক ভাঙ্গল। শব্দটা আসছে কলিয়ারীর দিক থেকে। অনেকটা ক্ষিপ্ত জনতার উন্মত্ত চীৎকারের মত শোনাচ্ছে। অশোক কলিয়ারীর দিকে চোখ ফেরাল। লেবার কলোনী দাউ দাউ করে জ্বলছে, আর একদিকে কয়লাখনি থেকে ধোঁয়া উঠছে। অশোক প্রথমটা বোকার মত দাঁড়িয়ে রইল, তারপর ছুটল দিগ্‌নগরের সড়ক ধরে উন্মত্তের মত।

ঘটনাস্থলে পৌঁছে অশোক প্রথম চেষ্টা করল রুকনকে খুঁজে বের করতে। গত কয়েক দিন ধরে রুকনের অনুপস্থিতিতে তার মনে বদ্ধমূল ধারণা জন্মেছিল যে, দিগ্‌নগর কলিয়ারীতে একটা সঙ্কট ঘনিয়ে আসছে। নাইট স্কুলেও রুকনের ভাবান্তর সে লক্ষ্য করত। পড়াশুনা সেরকম আগ্রহের সঙ্গে শুনত না, কি একটা চিন্তায় সব সময় বিভোর হয়ে থাকত। কিন্তু এত সন্তর্পণে সে অগ্রসর হয়েছে যে, অশোক তার মতলব বিন্দুবিসর্গও জানতে পারেনি। তবে অশোক এইটুকু বুঝতে পেরেছিল যে সন্তোষের বিরোধী একটা লেবার ইউনিয়ন রুকন গড়ে তুলবার চেষ্টা করছে।

কিন্তু রুকন কোথায়? চারিদিকে ধোঁয়া আর পেট্রোলের গন্ধ। জনতার আর্ত্ত কোলাহল ও বিকট উল্লাস একটা পৈশাচিক ঐক্যতান সৃষ্টি করেছে। চীৎকার করে ছুটেছে কুলীর দল শাবল ও গাঁইতি হাতে। কুলীরমণীরা অদ্ভুত ভঙ্গীতে নৃত্য করছে। ছেলেমেয়েরা উলঙ্গ অবস্থায় তাড়ির স্রোতে গড়াগড়ি দিচ্ছে। হিংসা ও পাশবিকতা যেন জীবন্ত মূর্ত্তি পরিগ্রহ করেছে। আবার চারিদিকে দৃষ্টিপাত করল অশোক, অন্ধকারের মধ্যে দৃষ্টিগোচর হচ্ছে শুধু আলোকশিখা। হাঁপরের মত কাঁপছে দিগ্‌নগর কলিয়ারী।

অন্ধকারে পথ হাতড়ে কোনরকমে অশোক উপস্থিত হল বিরাজবাবুর বাঙ্গলোর সম্মুখে! বাঙ্গলোর চারিদিকে জনতা, সম্মুখের ঘর কখানা জ্বলছে। আগুনের আলোয় হাঙ্গামাকারীদের মুখশ্রী বীভৎস আকার ধারণ করেছে। শিবানী কোথায়? অশোক ধোঁয়ার মধ্যে এগিয়ে চলল। হঠাৎ একখানি সবল বাহু তাকে সজোরে আকর্ষণ করল।

—ও দিকে যাবেন না মাষ্টারমশায়, ঘরে কেউ নেই।

কণ্ঠস্বরে বক্তাকে চিনতে পারল অশোক,—রুকন। সে বলল,—কেন, শিবানী? সে গেল কোথায়? তোমরা সব এসেছ নরহত্যা করতে, আমার এতদিনের শিক্ষা ব্যর্থ হয়েছে। ছাড় আমাকে, শিবানী বোধহয় বাড়ীর পিছনদিকে। ও দিকটায় আগুন এখনও লাগেনি।

—দোহাই আপনার, ওদিকে যাবেন না মাষ্টারমশায়। শিবানীদিদি এবাড়ীতে নেই। আজ সন্ধ্যায় গোলমাল সুরু হওয়ার আগেই তিনি সন্তোষবাবুর সঙ্গে কোথায় চলে গেছেন।

—বিরাজবাবু কোথায়? তাঁকে তোমরা মেরে ফেলেছ নিশ্চয়!

—আপনার গা ছুঁয়ে দিব্যি করছি, মাষ্টারমশায়, খুনজখম আমরা একটিও করিনি। বিরাজবাবু আজ দুদিন হল কলকাতায়, শিবানীদিদির

ভাই তাঁর সঙ্গে গেছে। আপনি আমার সঙ্গে চলুন একটু আড়ালে, সব খুলে বলছি।

বিস্ময়াহত অশোককে একরকম কোলে তুলে রুকন গিলে বসল একটা টিলার গায়ে! তারপর অশোকের পয়ে হাত দিয়ে বলল,—যা বলব সব সত্য বলে মেনে নেবেন, মাষ্টারমশায়। মিথ্যা বল্লে ত আপনার কাছে শিখিনি। শোনার পর আমার বিচার করবেন, শাস্তি যা দেবেন মাথা পেতে নেব।

অশোককে নীরব দেখে রুকন সুরু করল,—আপনার বোধহয় স্মরণ আছে, আপনাকে একদিন বলেছিলাম সন্তোষবাবুরা আপনাকে খুন করার ষড়যন্ত্র করছে। শুধু আপনাকে খুন নয়, ওদের মতলব ছিল হাতীগাঁর প্রতিষ্ঠানটি একেবারে ধ্বংস করা। সন্তোষবাবু এর মধ্যে সহরে গিয়ে কয়েক টিন পেট্রোল এনে জমা রাখল কলিয়ারীর গুদামে। ঠিক হল, বিরাজবাবু কলকাতায় থাকবেন, আর সন্তোষবাবুর দল পেট্রোলের টিন নিয়ে চড়াও করবে আপনাদের প্রতিষ্ঠান। এ সবই আমরা জানতে পারলাম বিরাজবাবুর সেক্রেটারীর কাছ থেকে। উনি আপনাকে খুব ভক্তি করেন। ব্যাপার শুনে আমার মাথার মধ্যে যেন আগুন জ্বলতে লাগল। আরও শুনলাম আমারই ছেলে হবে এই চড়াওকারীদের পাণ্ডা। কিন্তু ওদের হিসেবে ভুল-হল। রুকনকে তাচ্ছিল্য করে ওরা ঠিক করেনি। ওরা জানে না হাতীগাঁর মাষ্টারমশায়ের জন্য রুকন প্রাণ পর্যন্ত দিতে পারে। ওরা জানে না, মাষ্টারমশায়, কলিয়ারীতে কাজে লাগবার আগে রুকন সাত বচ্ছর জেল খেটেচে ডাকাতি করে। ওদের এই ষড়যন্ত্র শুনে আমার সুপ্ত রক্ত ঝিলিক দিয়ে উঠল মাষ্টারমশায়। আমিও ওদের বিরুদ্ধে দল পাকাতে আরম্ভ করলাম, ডাকাতের দল আমারও ছিল, মাষ্টারমশায়। আপনার সঙ্গে দেখা করা বন্ধ করে দিলাম, নইলে আপনাকে বাঁচাতে পারব না। ক্রমে আমার দল ভারী হয়ে উঠতে

লাগল। পূর্ব্বেকার ব্যবস্থা অনুযায়ী বিরাজবাবু সরে পড়লেন, বাঙ্গলোর ভার দিয়ে গেলেন সন্তোষবাবুর উপর। বলতে লজ্জা হয়, সন্তোষবাবু এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে কসুর করলেন না। বাঙ্গলোয় ছিলেন শুধু তিনি আর পরেশবাবুর মেয়ে। সন্তোষবাবু তাঁকে নিয়ে মত্ত হলেন, আর সব ভার ছেড়ে দিলেন আমার ছেলের উপর। সন্তোষবাবু অবশ্য একটু একটু বুঝতে পেরেছিলেন, কুলীদের উপর তাঁর প্রভাব কমে আসছে। যাহোক্, নির্দ্দিষ্ট দিনে অর্থাৎ যেদিন রাত্রে ওরা হাতীগাঁ চড়াও করবে, আমাদের প্রথম কাজ হল পেট্রোলের টিনগুলো সরিয়ে ফেলা। গুদামঘরের পাহারাদার আমাদের দলের লোক, তার সাহায্যে টিনগুলো একে একে সরান হল আমাদের কলোনীতে। ব্যাপার সুবিধে নয় দেখে সন্তোষবাবু পরেশবাবুর মেয়েকে নিয়ে সরে পড়লেন। অবশ্য কখন কি ভাবে সরে পড়েছেন, কেউ টের পায়নি। আমার ছেলে কিন্তু গোঁ ছাড়ল না, হাজার হোক্, আমারই ছেলে তো! হতভাগা দলবল নিয়ে চুপি চুপি আমাদের কলোনীতে আর এই বাঙ্গলোয় আগুন লাগিয়ে সরে পড়েছে। পিটগুলোও নষ্ট করতে যাচ্ছিল, কিন্তু আমার লোকেরা এসে পড়ায় পালিয়েছে। বিরাজবাবুর বাঙ্গলোয় আগুন লাগাবার কারণ বুঝতে পারি, কিন্তু আমাদের বাড়ীগুলো যে এভাবে পুড়িয়ে দিয়ে গেল, নিজের ছেলে হলেও তাকে আমি ক্ষমা করতে পারব না, মাষ্টারমশায়। পিটের ক্ষতি কিছু হয়নি, বিরাজবাবুর বাঙ্গলো পুড়ে যাবার জন্যও আমরা দায়ী নই। তিনি ফিরে আসুন, তাঁর কলিয়ারী তাঁরই থাকুক। কিন্তু আমরা জানিয়ে দেব তাঁকে, সন্তোষবাবুর মত লোকেদের সঙ্গে মিতালী করে আমাদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির চেষ্টা তিনি আর করতে পারবেন না।

রুকন চুপ করল। অশোক মাথা নীচু করে শুনছিল। এইবার মাথা তুলে বলল,—কাজটা ভাল হয়নি রুকন। আমার শক্তির উপর সন্দেহ ছিল বলেই তুমি এভাবে অগ্রসর হয়েছ। তাছাড়া আমি তোমার

সাহায্য প্রার্থনাও করিনি। তবে বিরাজবাবুর সম্বন্ধে যে সিদ্ধান্ত তোমরা করেছ, তার সঙ্গে আমি সম্পূর্ণ একমত। এর চেয়ে ভাল ব্যবস্থা আর কিছু হতে পারে না। আমি নিজে অমঙ্গলকে ভয় করি না, কারণ এর মধ্য দিয়েই—

অশোক কথা শেষ করবার আর সুযোগ পেল না. প্রচণ্ড এক প্রস্তরাঘাতে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। শব্দ লক্ষ্য করে রুকন ছুটল, কিন্তু অন্ধকারে আঘাতকারী কোথায় মিলিয়ে গেল বুঝতে পারল না। অশোকের কাছে সে ফিরে এল। মাথায় আঘাত লেগেছে, কাণের কাছে অনেকটা জায়গা জুড়ে গর্ত্তের মত দেখাচ্ছে—অশোকের জ্ঞান নেই।

আতঙ্কে রুকন শিউরে উঠল।

শিবেনবাবুর ডাক্তারী বিদ্যা কিছু কিছু জানা ছিল। মেডিক্যাল কলেজে কোর্স শেষ করে পরীক্ষা আর দেননি। সেই বিদ্যা কাজে লাগল এতদিন পরে। রুকনরা অশোককে হাতীগাঁয়ে নিয়ে আসার পর শিবেনবাবু নিপুণহস্তে তার ক্ষতস্থানে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দিলেন, আশ্রমের ক্রন্দনরত মহিলাদের ধমকালেন, তারপর কাত্যায়নী ও মালিনীকে পালাক্রমে নার্স নিযুক্ত করে অশোকের জ্ঞান হওয়ার প্রতীক্ষা করতে লাগলেন। রায়মশায় ও রায়গিন্নী ভগবানের কাছে প্রার্থনা জানালেন।

সকলের চেষ্টা ও যত্নে চার পাঁচ দিনের মধ্যে অশোক সুস্থ হয়ে উঠল। রোগশয্যা থেকে উঠে শিবেনবাবুকে বলল,—এ যাত্রা খুব বেঁচে গেলাম, ভাগ্যিস্ আপনারা কলকাতা ছেড়ে এখানে এসেছিলেন!

কাত্যায়নী বললেন,—তোমার সবচেয়ে বেশী ধন্যবাদ দেওয়া উচিত মালিনীকে। শুশ্রূষার কাজ আমি আর কি জানি। ও না থাকলে শিবেনবাবুর ডাক্তারীতে এত শীগ্‌গীর ফল হত না।

মালিনী লজ্জিত হয়ে বলল—মাসীমা স্নেহ করেন বলে এইরকম বলছেন। বাবাই সব, আমি উপলক্ষ্য মাত্র।

মালিনীর কথায় সকলের মুখে হাসি ফুটে উঠল।

রায়গিন্নী বললেন,—আমরা বুড়োবুড়ী একদিন খালি ভগবানকে ডেকেছি।

রায়গিন্নীর কথায় আবার সকলে হেসে উঠলেন। অশোক লক্ষ্য করল, কাত্যায়নীর বিষণ্ণ ভাব একেবারে কেটে গেছে। সকলে ঘর থেকে চলে গেলে কাত্যায়নী বললেন, আর আমার কোন খেদ নেই অশোক, সে আগুনে পুড়ে মরেছে। ভগবানের কাছে আমি এই প্রার্থনাই করে এসেছি।

কাত্যায়নীর চোখে জল, মুখে হাসি। অশোক বুঝতে পারল, তিনি ভুল শুনেছেন, কিন্তু শিবানীর সম্বন্ধে আসল খবর তাঁর কাছে না ভাঙ্গাই সে সঙ্গত মনে করল। শিবানীর মৃত্যুতে শান্তি যদি তিনি পান, তাঁকে সত্য বলে দুঃখ দেওয়ার অধিকারও অশোকের নেই।

দুপুর বেলা একলা ঘরে বসে অশোক বিগত কয়েকদিনের ঘটনা চিন্তা করছিল। আগের দিন রুকন খবর দিয়ে গেছে, কলিয়ারীর অবস্থা শান্ত। বিরাজবাবু ফিরে এসেছেন ও শেষ পর্য্যন্ত শ্রমিকদের দাবী মেনে নিয়েছেন। কলিয়ারী সম্বন্ধে অশোক অনেকটা নিশ্চিন্ত, কিন্তু রুকনের নাইটস্কুল আবার খোলার প্রস্তাবে সে রাজী হতে পারে নি। সে ঠিক করেছে, এবার হাতীগাঁয়ে একটী বুনিয়াদী স্কুল স্থাপন করবে। শিবেনবাবুর এ বিষয়ে খুব উৎসাহ আছে, মালিনী তো ইতিমধ্যে এসম্বন্ধে পুস্তকাদির অর্ডার দিয়ে বসেছে। কি অসাধারণ পরিশ্রম করতে পারে শিবেনবাবুর এই মেয়ে! তার অসুখের সময় প্রাণপণে সেবা করেছে, তা ছাড়া প্রতিষ্ঠানের সব কাজেই সে আহত থাকাকালীন মালিনী চালিয়ে গেছে।তার অবর্ত্তমানে হাতীগাঁর প্রতিষ্ঠান ধ্বংস হবে না। অশোক

ঠিক করল, শিবেনবাবুর কাছে সে মালিনীর পাণি গ্রহণের প্রস্তাব করবে।

তার ইচ্ছার সঙ্গে যেন সামঞ্জস্য রেখে ঘরে প্রবেশ করলেন শিবেনবাবু। শিবেনবাবুর হাতে সেদিনকার চিঠিপত্র। একখানা চিঠি অশোকের সামনে ফেলে দিয়ে বললেন, পড়ুন। অশোক পড়ল,—'শিবেনদা, আমাদের কি একেবারে ত্যাগ করলেন? ক্লাবের আর সেরকম জৌলুষ নেই! ভাল আর্টিষ্ট সব ক্লাবের সংস্রব ত্যাগ করেছে! আমার মনে হয় রেণুর অন্তর্ধানই এর কারণ। সম্প্রতি একটি ভাল আর্টিষ্ট আমরা সংগ্রহ করেছি। সন্তোষকে আপনি চেনেন, সেই একে সংগ্রহ করে এনেছে! মেয়েটির নাম শিবানী, পল্লীগীতিতে অসাধারণ দখল! মেয়েটি সন্তোষের আত্মীয়, এবং সেই বর্ত্তমানে তার অভিভাবক! তার কথাবার্ত্তা ও চালচলন আমাদের মুগ্ধ করেছে। আপনি শীগ্‌গীর ফিরে আসুন। মন খারাপ করে গ্রামে বসে জীবনটা নষ্ট করবেন না। সুশান্ত।'

চিঠিখানা শেষ করে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে অশোক বলল, শিবানীর পরিণতি কোথায় কে জানে! এ চিঠি আর কেউ দেখে নি তো?

—না, এ শুধু আমার আপনার মধ্যে। আর একখানা চিঠি পড়ুন। আমার ভাগ্নে লিখেছে, প্যারিস থেকে। শুধু নীচে দাগ দেওয়া অংশটুকু পড়লেই চলবে।

অশোক পড়তে লাগল—'একটা মজার খবর আপনাকে দিচ্ছি। সেদিন ইণ্ডিয়ান ক্লাবে নতুন একজোড়া প্রাণীর আবির্ভাব হল। খবর নিয়ে জানলাম স্বামী-স্ত্রী, ধনী বাঙ্গালী দম্পতী দেশ ভ্রমণে বেরিয়েছে। নাম শুনলাম, মিঃ সুন্দরলাল ও মিসেস রেণু চৌধুরী। আমি আড়াল থেকে ওদের দেখলাম ও রেণুকে চিনতে পারলাম। ওদের সামনে গিয়ে দাঁড়াতেই, রেণুর মুখ ছাইএর মত সাদা হয়ে গেল।'

শিবেন বাবু বললেন,—এ চিঠি রায় মশায়দেরও দেখাই নি। সুশান্ত এককালে ছিল একনিষ্ঠ দেশ সেবক, এখন হয়ে দাঁড়িয়েছে নম্বর রোগ। সব ছেড়ে ছুড়ে নেতা সেজে বসে আছে। আত্মসংযমের দোহাই দিয়ে মনুষ্যত্বের শ্রাদ্ধ করছে। আর এই সন্তোষ! ...র প্রস্থানের সঙ্গে সঙ্গে ওদের টাইপের লোক রাতারাতি রাজনীতি-... হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু মেয়েগুলো কি কাণ্ড করছে! ওদের ...ান জ্ঞান কি কটুও নেই? আমার মেয়ে মালিনী, কি একটা ...র ঘোরে সারা জীবনই নষ্ট করে দিল।

—উনি কিন্তু এ জন্য প্রায়শ্চিত্তও যথেষ্ট করছেন। হাতীগাঁর ...ানের আজ উনি অপরিহার্য্য অঙ্গ। ওঁকে বাদ দিয়ে এ প্রতিষ্ঠান ...না। আপনার কাছে আমার একটি অনুরোধ আছে, মালিনীকে ...হাতে সম্প্রদান করুন।

...কের এই অতর্কিত প্রস্তাবে শিবেন বাবু চমকে উঠলেন।

—তুমি! তুমি মালিকে বিয়ে করবে!

... বাবুকে প্রণাম করে অশোক বলল,—আমার এই ... শ্রদ্ধ... অনুরোধ আপনার কাছে।

... বাবুর চোখ দিয়ে দু'ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ল। মুছে বললেন, ... চেয়ে বেশী আনন্দ আর পাই নি, অশোক।

... এ আনন্দ থেকে বঞ্চিত হব না, শিবেন বাবু। বলতে ...ত্যায়নী প্রবেশ করলেন। তাঁর পিছনে রায়মশায়, রায়গিন্নী ও

...রজার আড়ালে দাঁড়িয়ে সব শুনেছি আমরা। অবশ্য বিয়ের ...শুনেছি, তার আগে শ্বশুর জামাই কি পরামর্শ করেছে তা আর ... নি।

...ন বাবু হেসে বললেন,—মিষ্টান্ন মিতরে জনা বৌদি। আপনারা

ইতর জন শুধু খেয়ে আনন্দ করবেন। মালিনী স্মিতমুখে হাসি
শিবেন বাবু বললেন,—অশোকের প্রস্তাবে তোর মত আছে নাকি ?

মালিনী উত্তর দিল না। সে মাথা নীচু করে গেই চলল।
কাণে তখনও গানের মত সুরে বাজছিল—'মালিকে আমার
সম্প্রদান করুন।'

সমাপ্ত